মন্মথ রায়ের নাটক

ধর্মঘট

পথে বিপথে

চাষীর প্রেম

আজব দেশ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম মুদ্রণ :
মহালয়া ১৩৬৩

প্রচ্ছদপট অঙ্কন :
শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর দত্ত

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :
রিপ্রোডাক্সন সিণ্ডিকেট
৭-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

ব্লক নির্মাণ :
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং,
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

গ্রন্থ-বন্ধন :
প্রভাবতী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১২৬, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর :
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র দত্ত
রূপশ্রী প্রেস
৩৬, সুকিয়া ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৯

মূল্য : চার টাকা

লেখকের কথা

'ধর্মঘট', 'পথেবিপথে', 'চাষীর প্রেম' এবং পরিবর্ধিত 'আজবদেশ'—আমার এই চারখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক ১৯৫২-৫৩ সনে রচিত হইয়া বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; এক্ষণে একত্রে একখণ্ড গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। শ্রমিক জীবনের পটভূমিতে 'ধর্মঘট', মধ্যবিত্ত জীবনের পটভূমিতে 'পথে বিপথে', কৃষক জীবনের পটভূমিতে 'চাষীর প্রেম' এবং গণ-জীবনের পটভূমিতে ব্যঙ্গাত্মক নাটক 'আজব দেশ' পরিকল্পিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য প্রতিটি নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্র কল্পনা প্রসূত—বাস্তব জীবনের কোনও ব্যক্তি বিশেষকে অথবা কোনও প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্য করা হয় নাই।

বাংলা সাহিত্যের পরশুরাম পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু 'হবু চন্দ্র—গবু চন্দ্র' নামীয় তাঁহার স্বহস্তলিখিত একটি গাথা আমার 'আজবদেশ' নাটকে উদ্বোধন রূপ ব্যবহারের অনুমতি দিয়া আমাকে অপরিসীম কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

আমার এই নাট্য-সঙ্কলন গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে গিয়া যাহাদের অকুণ্ঠ শ্রম, সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছি তাহারা—শ্রীমান কানুরঞ্জন ঘোষ, শ্রীমান সুহাস চন্দ্র ভৌমিক এবং শ্রীমান সুভাষ চন্দ্র ভৌমিক। শেষোক্ত দুইজন আমার পরম বন্ধু 'স্বদেশ' পত্রিকার শ্রীকৃষ্ণেন্দু নারায়ণ ভৌমিকের পুত্র। ইহাদের সকলকেই আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি জানাই। নিবেদন ইতি।

মন্মথ রায়

মহালয়া : ১৩৬৩

২২৭ সি, বিবেকানন্দ রোড।

কলিকাতা—৬

মন্মথ রায়ের অন্যান্য নাটক

মীরকাশিম—মমতাময়ী হাসপাতাল—রঘু ডাকাত ॥ লাঙ্গল ॥

শ্রীবৎস ॥ সতী ॥ বিদ্যুৎপর্ণা ॥ রাজনটী ॥ রূপকথা ॥

কৃষাণ ॥ সাবিত্রী ॥ অশোক ॥ খনা ॥ কাজলরেখা ॥

উর্বশী নিরুদ্দেশ ॥ মহাভারতী ॥ জীবনটাই

নাটক ॥ কারাগার—মুক্তির ডাক—মহুয়া ॥

দেবাসুর ॥ চাঁদসদাগর ॥ ভাঙ্গাগড়া ॥

জটাগঙ্গার বাঁধ ॥ জীবনমরণ ॥

গুপ্তধন ॥ একাঙ্কিকা ॥

ছোটদের একাঙ্কিকা ॥

হবুচন্দ্র — গবুচন্দ্র

পরশুরাম

হবুচন্দ্রকে বললে রাজ্যের যত লোক —
হে মহারাজ ধর্মাবতার,
আমাদের আরজিটা শুনুন একবার,
গবু মন্ত্রীকে শূলে চড়াতে আজ্ঞা হ'ক।
ব্যাটা অকর্মণ্য ঘুষখোর,
পয়লা নম্বর চোর,
ওর জন্য আমরা খেতে পরতে পাই না।
যদি না পারেন রাজার কাজ
তবে কি করতে আছেন মহারাজ ?
চলে যান, আপনাকে আমরা চাই না ॥

হাই তুলে বললেন হবুচন্দ্র,
এরা বলে কি হে গবুচন্দ্র ?
গবু বললেন, আঃ কি জ্বালাতন,
দোষ ধরাই ওদের স্বভাব।
শিখেছেন তো তার জবাব,
আউড়ে দিন তোতা পাখির মতন ॥

হেঁকে বললেন হবুচন্দ্র নরপতি, —
ওহে প্রজাবৃন্দ, শান্ত হও, ধৈর্য ধর,
না বুঝেই কেন চিৎকার কর,
তোমরা অবোধ ছেলেমানুষ অতি।

তোমাদের নালিশ নিয়ে আদ্যন্ত,
স্বয়ং গবুচন্দ্র করেছেন তদন্ত।
তোমাদের কিঞ্চিৎ টানাটানি,
কিঞ্চিৎ এটা ওটা সেটা দরকার
আছে তা অবশ্যই মানি।
শীঘ্রই হবে তার প্রতিকার।
স্বর্গ থেকে আসছে মালী এক দল,
সঙ্গে নিয়ে কল্পতরুর বীজ,
আট বছরে ফলবে তার ফসল,
পাবে তখন হরেক রকম চীজ।
ততদিন বাপু সয়ে থাক চক্ষু বুজে,
বাজে খরচ কমাও,
দেদার টাকা জমাও,
আমার কাছে রাখ আড়াই পার সেন্ট সুদে।

৮/২/৪৬
১/১০/৫৮.

"আজব দেশ"

মন্মথ রায়

ধর্মঘট

রচনাকাল :
৭-৮-৫৩ হইতে ২১-৮-৫৩
প্রথম প্রকাশ :
বঙ্গশ্রী
(মাসিকপত্র)
মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র
১৩৬০

ধর্মঘট

বাঙলার নাট্যজগতের
"মহর্ষি"
৺মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের
পুণ্যস্মৃতির বেদীমূলে
শ্রদ্ধার্ঘ
মন্মথ রায়

মহালয়া :
১৩৬৩
২২৭সি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতার উপকণ্ঠে সোদপুরের প্রান্তভাগে 'রাজছত্র লিমিটেড' নামক ছাতা ও ওয়াটার প্রুফের কারখানা অঞ্চলে রাজছত্র লিমিটেডের ক্লাব-ভবন—"মিলন-মন্দির"স্থ সভা কক্ষ। কক্ষটি প্রশস্ত। মধ্যভাগে একটি মঞ্চ রহিয়াছে। মঞ্চের উপর খানকয়েক চেয়ার রহিয়াছে এবং নীচে দুই পাশে বহু ফোল্‌ডিং চেয়ার সাজানো রহিয়াছে। কক্ষের বড় বড় জানালাগুলি উন্মুক্ত। প্রাচীর-গাত্রে ছাতা ও ওয়াটারপ্রুফের রঙ-বেরঙের নানা পোষ্টার শোভা পাইতেছে। কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান দীনবন্ধু চৌধুরীর তৈলচিত্র এবং গান্ধী, জহরলাল, সুভাষচন্দ্রের সুদৃশ্য ছবি টানানো রহিয়াছে। একটি প্ল্যাকার্ডে "সত্যমেব জয়তে"—নীতিবাক্য দেওয়াল-গাত্রে শোভা পাইতেছে। একটি বড় দেওয়াল-ঘড়ি সময় নির্দেশ করিতেছে।

১৯৫৩ সালের জুলাই মাসের এক সন্ধ্যারাত্রে এই সভাকক্ষে কোম্পানীর শ্রমিক সংঘের কার্য্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণ এবং কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ একটি গুরুতর বিষয়ে আলোচনা-রত।

মঞ্চের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছেন—কোম্পানীর চেয়ারম্যান—দীনবন্ধু চৌধুরী, ফ্যাক্টরীম্যানেজার—লোহারাম দাস, লেবার ওয়েলফেয়ার

অফিসার—সুমঙ্গল সেন এবং আরো দুই একজন প্রধান কর্মচারী। মঞ্চের নিম্নে শ্রমিক সংঘের কার্য্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ওয়াটারপ্রুফ বিভাগের হেডমেকানিক্—জনার্দন দত্ত, ছাতা বিভাগের হেডমেকানিক্—মহম্মদ ইব্রাহিম, ইব্রাহিমের পুত্র—লাল মিঞা, শ্রমিক সর্দার—হারাণ দাস, আকবর মিঞা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মিলন-মন্দির ক্লাব-ভবনের তত্বাবধায়ক (care-taker) মহম্মদ উইলিয়াম নটবর গোস্বামী মঞ্চের নিম্নে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ একটু অদ্ভুত ধরণের, হিন্দু-মুসলমান ও খৃষ্টান—এই তিন ধর্মেরই ছাপ তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদে প্রতিভাত।

শ্রমিক সদস্যগণ ॥ (একযোগে)

"এ সব কথা আমরা জানি, কিন্তু ছাঁটাই করা চলবে না।"

"কাজকর্মের অবস্থা ভালো নয়, এতো' চিরকালের বুলি—চিরকালই শুনছি।"

"যুদ্ধের বাজারে যখন লাখ-লাখ টাকা লাভ করেছেন, সেই অনুপাতে কি আমাদের মাইনে বেড়েছিল ? তবে ?"

"আমাদের এক কথা,—ছাঁটাই করা চলবে না, চলবে না।"

দীনবন্ধু চৌধুরী (চেয়ারম্যান)॥ অর্ডার! অর্ডার!! চেঁচামেচি করলে কোনো আলোচনা চলে না। (গোলমাল থামিল।) তোমরা যাঁর তত্বাবধানে কাজ কর, যিনি কোম্পানীর অবস্থা এবং তোমাদের অবস্থা সবই জানেন,— ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার শ্রীলোহারাম দাস, তিনি কি বলেন—তোমরা স্থির হ'য়ে শোনো। মিষ্টার দাস—

লোহারাম দাস॥ মাননীয় সভাপতি মহাশয় এবং আমার প্রিয় সহ-কর্মিগণ! আমাদের এই কোম্পানীর নামটা কি? রাজছত্র লিমিটেড। বিবেচনা করুন, ছাতা আর ওয়াটারপ্রুফ তৈরীর ব্যবসায়ে একদিন আমাদের একচ্ছত্র আধিপত্যই ছিল। বিবেচনা করুন, এ ব্যবসায়ে রাজছত্র আমরাই

এককালে ধারণ করেছি। কিন্তু গেল বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ব্যাঙের ছাতার মতোই অলি-গলিতেও গজিয়ে গেল সব ছাতার কোম্পানী। বিবেচনা করুন, তখন থেকেই সুরু হয়েছে আমাদের দুর্দশা। বিবেচনা করুন, যুদ্ধের পর অর্থ-নৈতিক সংকটও এসে গেছে এদেশে। বিবেচনা করুন, দেশের লোকের ক্রয় ক্ষমতা কী সাংঘাতিক ভাবে কমে গেছে!

ইব্রাহিম॥ জানি স্যার, এসব কথা বলবেন জানি। কিন্তু যুদ্ধের সময় যে লাখ লাখ টাকা মুনাফা হয়েছে, সেটাও বিবেচনা করুন।

জনার্দন॥ সে অনুপাতে আমাদের বেতন আর ভাতা কোম্পানী বাড়াবার কথা বিবেচনা করেন নি।

লালমিঞা॥ হিয়ার, হিয়ার।

লোহারাম॥ কিন্তু কোম্পানী বলেন, যুদ্ধের পর থেকে এ কয়েক বছর ক্রমাগত যে লোকসান হয়েছে, সে লোকসান কোম্পানী মুখ বুজে ঘাড় পেতে সয়ে গেছেন। বিবেচনা করুন, আপনাদের বেতন বা ভাতা সে জন্য কিছু কমাননি।

ইব্রাহিম॥ সে কথা মানছি। কিন্তু লড়াইএর বাজারে লাভ এতো করেছেন যে, দুধ তো দূরের কথা, এখনো জলেই হাত পড়েনি। না, না, ছাঁটাই-টাটাই চলবে না।

শ্রমিকগণ॥ (ঘন ঘন করতালি) ঠিক, ঠিক। হিয়ার! হিয়ার!

সুমঙ্গল সেন (লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার)॥ (চেয়ারম্যানের প্রতি) স্যার, আমি দু' একটা কথা বলতে পারি?

শ্রমিকগণ॥ না, না, আর বলবার কী আছে? ছাঁটাই-টাটাই চলবে না স্যার।

দীনবন্ধু॥ অর্ডার! অর্ডার!! (গোলমাল থামিল) তোমাদের শ্রমিক-কল্যাণ কর্তা শ্রীসুমঙ্গল সেন কিছু বলতে চান,—শোনো। বলুন মিষ্টার সেন—

সুমঙ্গল। লোকসানের বছরেও কোম্পানী বেতন আর ভাতা কমাননি। বরং আমি বলবো, একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সেটা বেড়েছে।

শ্রমিকগণ ॥ (ব্যঙ্গহাস্য করিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ !

কোন কোন শ্রমিক ॥ (ব্যঙ্গ সহকারে) বলুন, বলুন। প্রাণ যা চায় বলুন।

লালমিঞা ॥ হ্যাঁ, মুখের ওপর তো আর ট্যাক্সো নেই। বলুন—

সুমঙ্গল ॥ হ্যাঁ বলবো। কেন বলবো না? এই যে "মিলন-মন্দির"—যে ক্লাবঘরে বসে আপনারা সভা করছেন,—এতোবড় এই বিল্ডিংটা—একটা কলোনী করে দিয়ে তাতে আপনাদের বসবাসের জন্যে কোয়াটার্স ক'রে দেওয়া হ'য়েছে—সেটা—

লালমিঞা ॥ হ্যাঁ, কতকগুলো পায়রার খোপ।

সুমঙ্গল ॥ শুধু মাথা গোঁজবার ঠাঁই,—আজকাল লোকে যা পায় না—তাছাড়া ধর্মকর্মের জন্যে কলোনীতে একটা মন্দির, একটা মসজিদ—ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে একটা ফ্রী প্রাইমারী স্কুল—নিরক্ষর বয়স্কদের জন্যে একটা Adult Education Centre—একটা দাতব্য ডাক্তারখানা—

লালমিঞা ॥ হোমিওপ্যাথিক! (সকলে হাসিয়া ওঠে)

সুমঙ্গল ॥ এ সব কোম্পানী নিজের খরচায় গড়ে দেন নি?—যার সুখ-সুবিধা আপনারা ষোলআনা ভোগ করছেন।

হারাণ ॥ তা' অবিশ্যি দিয়েছেন। কিন্তু প্রসূতিসদনটা? কদ্দিন থেকে আমরা চাইছি। কোম্পানী স্পষ্ট 'না' বলে দিয়েছে। কোম্পানী চান না যে, আমাদের ছেলে-মেয়ে ভালোভাবে হোক্। কোম্পানীর মতলব শ্রমিকের বাচ্চাগুলো আঁতুড়েই শেষ হয়ে যাক।

লালমিঞা ॥ সেম্! সেম্!!

হারাণ ॥ কিন্তু শকুনের শাপে গরু মরে না। আমাদের বাচ্ছারাও মরবে না। আমরা নিজেরাই প্রসূতিসদন গড়ে তুলবো। আমাদের ইব্রাহিম সর্দারের সোণার চাঁদ ছেলে—এই লালমিঞা, সেজন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে "মহুয়া" পালা গানের টিকিট বিক্রী করে টাকা তুলছে। শ্রমিকের বংশবৃদ্ধি ধনিক রোধ করতে পারবে না—পারবে না।

জনার্দন ॥ আঃ থামো হারাণ। এ সব বাজে কথা রাখো। আমাদের

দাবী—কোন ক্রমেই ছাঁটাই করা চলবে না। একজন শ্রমিকও যদি ছাঁটাই হয়, তাহলে আমরা ধর্মঘট করবো।

সকলে॥ আমরা ধর্মঘট করবো—আমরা ধর্মঘট করবো।

[দীনবন্ধু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।]

দীনবন্ধু॥ অর্ডার! অর্ডার!! (গোলমাল থামিল) এবার আমি কিছু বলতে চাই,—তোমরা স্থির হয়ে শোন। আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে সামান্য মূলধন নিয়ে আমি দীনবন্ধু চৌধুরী একা ছাতা তৈরী ব্যবসাতে নেমেছিলাম। সেদিন যে সব শ্রমিকরা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, আমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, আনন্দের কথা—আজও তাদের প্রায় সকলেই আমার সঙ্গেই আছে। শুধু আছে বলবো না, কোম্পানীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। যে ছিল সামান্য শ্রমিক, সে হয়েছে আজ এক এক বিভাগের মাথা। যেমন—ওয়াটারপ্রুফ বিভাগের হেড মেকানিক্ ওই জনার্দন দত্ত, ছাতা তৈরী বিভাগের হেড মেকানিক্ ওই মহম্মদ ইব্রাহিম। এ কথা খুবই সত্য, এতোকাল আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ সহযোগিতা ছিল বলেই এতো ঝড়-ঝাপটা সয়েও আজও আমরা টিঁকে আছি। একথা আমি ভুলবো না,—ভুলতে পারি না। কিন্তু কোম্পানীর সামনে আজ চরম সংকট এসে দাঁড়িয়েছে। আয়-ব্যয়ের ছাপানো হিসাব তোমরা দেখেছো। বছরের পর বছর লোকসান সয়েও আমরা আজ পর্য্যন্ত একজন শ্রমিকও ছাঁটাই করিনি, যখন্ কারখানায় কারখানায় ছাঁটাই হচ্ছে অথবা হবে ঠিক হয়েছে।

আকবর॥ চেয়ারম্যান সাহেবের জয় হোক্। দোহাই আপনার, আপনি ছাঁটাই করবেন না। বাল বাচ্চা নিয়ে আমরা তবে কী খাবো? কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো?

দীনবন্ধু॥ আমি জানি, আমি বুঝি। আমারও বালবাচ্চা আছে। কিন্তু উপায় কী? যে ছাতা, যে বর্ষাতি গুদামে এখনো মজুত রয়েছে,—বাজারে আজ যা' চাহিদা তা' দুবছরেও কাটবে কিনা সন্দেহ। নতুন অর্ডার পাচ্ছি না।

কোম্পানীর অস্তিত্ব রক্ষা করাই আজ দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু ছাঁটাই করে কোম্পানীটাকে ধরে রাখা যায় কিনা আমরা সেই কথাই ভাবছিলাম। কোম্পানী উঠে গেলে সবই গেল।

(ক্ষণিক নিস্তব্ধতা। সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল ইব্রাহিম।)

ইব্রাহিম॥ কোম্পানী যদি উঠে যায়, আমরাও যাবো। একসঙ্গে সুরু করেছিলাম, এক সঙ্গেই শেষ হবো।

জনার্দন॥ যদি যাই, সব একসঙ্গেই যাবো। ছাঁটাই চলবে না।

সকলেই॥ হ্যাঁ, ছাঁটাই চলবে না।

দীনবন্ধু॥ বেশ, আরো বছরখানেক হয়তো আমরা লড়তে পারি যদি তোমরা সকলে আর একটু বেশী মেহনৎ কর, ছাতা তৈরী, ওয়াটার প্রুফ তৈরী ছাড়াও যদি আর একটা কাজ হাতে নাও।

আকবর ও হারাণ॥ আমরা নেবো, আমরা নেবো।

জনার্দন॥ কী কাজ?

দীনবন্ধু॥ দশহাজার লাঠি—বাঁশের লাঠি!

শ্রমিকগণ॥ (সবিস্ময়ে) লাঠি!

দীনবন্ধু॥ হ্যাঁ, ছাতার বাঁট তৈরী করার জন্যে বাঁশের কারবার তো আমাদের আছেই। কাজেই দশহাজার লাঠির অর্ডার সাপ্লাই কর আমাদের পক্ষে খুব দুঃসাধ্য নয়।

ইব্রাহিম॥ দশহাজার লাঠির অর্ডার! কার?

দীনবন্ধু॥ চুক্তি আছে—সেটা গোপন থাকবে।

ইব্রাহিম॥ পুলিশের লাঠি,—কী বলুন স্যার?

লালমিঞা॥ শ্রমিক ঠ্যাঙাবার দাওয়াই নয় তো?

দীনবন্ধু॥ এ সব কথা উঠছে না, ওঠা উচিতও নয়। কার অর্ডার তা' নিয়ে তোমাদের এতো মাথাব্যথা কেন?

জনৈক শ্রমিক॥ মাথাটা ফাটবার ভয় আছে কিনা স্যার।

[সকলে হাসিয়া উঠিল।]

দীনবন্ধু ॥ অর্ডার ! অর্ডার !!

লোহারাম ॥ বিবেচনা করুন, যখন জীবন-মরণের কথা হচ্ছে, তখন আমাদের এ হাসাহাসিটা শোভা পায় না।

সুমঙ্গল ॥ এই অর্ডার সাপ্লাই করার ওপরেই ছাঁটাইএর প্রশ্ন নির্ভর করছে। এটা হাস্য-পরিহাসের বিষয় নয়। শ্রমিক-মঙ্গল এর সঙ্গে জড়িত।

জনার্দন ॥ (শ্রমিকদের প্রতি) তোমরা থামো। (চেয়ারম্যানের প্রতি) আপনি বলুন।

দীনবন্ধু ॥ এই দশহাজার বাঁশের লাঠি এক মাসের মধ্যে সাপ্লাই দিতে হবে। এতো অল্প সময়ের মধ্যে এতো মাল তৈরী করতে গেলে তোমাদের হপ্তায় ৪৫ ঘণ্টার বদলে ৪৮ ঘণ্টা কাজ করতে হবে।

জনার্দন ॥ ৪৫ ঘণ্টার জায়গায় ৪৮ ঘণ্টা ?

দীনবন্ধু ॥ হ্যাঁ, তা না হলে কণ্ট্রাক্ট বাতিল হয়ে যাবে। ভুলো না, তোমাদেব নিয়ে আমাদের টিঁকে থাকতে হলে এই অর্ডার সাপ্লাই কোম্পানীর অপরিহার্য্য। ছাঁটাই করা না করা এখন তোমাদের ওপরেই নির্ভর করছে।

ইব্রাহিম ॥ এই বাড়তি ঘণ্টার জন্যে আমরা বাড়তি মজুরী পাবোতো ?

দীনবন্ধু ॥ না, কোম্পানীর বর্তমান অবস্থায় বাড়তি মজুরী দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।

জনার্দন ॥ বাড়তি কাজ করবো, অথচ বাড়তি মজুরী পাবো না ?

দীনবন্ধু ॥ অবশ্য ছাঁটাই করে সেটা দেওয়া যেতে পারে।

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা।]

দীনবন্ধু ॥ এখন তোমাদের সামনে এই দুটো পথ খোলা রয়েছে,—হয় ছাঁটাই, না হয় বাড়তি মজুরী ছাড়া বাড়তি কাজ। এর যে-কোনো একটা তোমরা বেছে নাও।

হারাণ ॥ ছাঁটাই এর চেয়ে বাড়তি কাজটাই ভালো। নাইবা পেলুম বাড়তি মজুরী। চাকরীটাতো থাকবে।

আকবর ॥ তা বটে ! তা বটে !!

ইব্রাহিম ॥ না, তা' হ'বে না। ওই দুটোর কোনটাই চলবে না। ছাঁটাই-এর ভয় দেখিয়ে বাড়তি কাজ করিয়ে নিয়ে বাড়তি মজুরী না দেবার মালিকদের এটা একটা ফিকির—এ আমরা বুঝি।

লালমিঞা ॥ সেম্! সেম্!!

দীনবন্ধু ॥ অর্ডার! অর্ডার!! আমার যা বলবার—বলেছি। এবার তোমাদের যা' বলবার আছে, তোমাদের ইউনিয়নের তরফ থেকে আমাকে লিখিতভাবে আজই জানিয়ে দাও। কাল কলকাতায় আমাদের বোর্ডের মিটিং-এ সেটা আলোচনা করা হবে।

জনার্দন ॥ বেশ, তাই আমরা জানাবো। খেলার মাঠে আমাদেরও শ্রমিক জমায়েৎ হয়েছে আজ। আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে তারা। আপনাদের বক্তব্য আমরা সেখানে গিয়ে পেশ করছি। আমাদের সাধারণ সভায় যা সিদ্ধান্ত হয়, আপনাকে লিখিতভাবেই তা' জানাচ্ছি। কোথায় জানাবো?

দীনবন্ধু ॥ (লোহারামের প্রতি) মিলন-মন্দিরে আজ আর কী কী প্রোগ্রাম আছে? কেয়ার-টেকার কোথায়?

(মহম্মদ উইলিয়াম নটবর গোস্বামী ছুটিয়া আসিল। দেহটিকে Right angle-এ সন্নিবেশ করিয়া হাত দুইখানি সন্মুখে সমান্তরালে প্রসারিত করিয়া চেয়ারম্যানকে অভিবাদন জানাইয়া স্প্রীংয়ের পুতুলের মতো চট্ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।)

নটবর ॥ ইয়েস্ স্যার!

দীনবন্ধু ॥ (লোহারামের প্রতি) ইনি কে?

লোহারাম ॥ আমাদের নতুন কেয়ার-টেকার—নটবর গোস্বামী।

দীনবন্ধু ॥ গোস্বামীর এই চেহারা?

নটবর ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, ও গোস্বামীও বলতে পারেন—উইলিয়ামও বলতে পারেন—আবার মহম্মদও বলতে পারেন।

লালমিঞা ॥ যাকে বলে সর্বধর্ম-সমন্বয় স্যার।

লোহারাম ॥ বিবেচনা করুন, নামে কী আসে যায়? লোকটি কাজে খুব

ভালো। এই অল্পসময়ের মধ্যে—বিবেচনা করুন, এই মিলন-মন্দিরের অনেক উন্নতি করে দিয়েছেন—বলুন মিষ্টার গোস্বামী, মিলন-মন্দিরে আজ আর কী কী প্রোগ্রাম আছে। সায়েব জানতে চাইছেন।

নটবর ॥ এই সভা ভাঙলেই এখানে হবে "মহুয়া" পালা-গানের ড্রেস্ রিহার্সাল।

দীনবন্ধু ॥ সেটা আবার কী? কারা করছে?

লালমিঞা ॥ পালাগানটা করছি আমরা—শ্রমিকদেরই ছেলে-মেয়েরা। যে প্রসূতি-সদন আপনাদেরই তৈরী করে দেওয়া উচিত ছিল স্যার,—অথচ দিলেন না, সেই প্রসূতি-সদন গড়ে তোলবার জন্যে আমরা এই অভিনয়ের আয়োজন করেছি। সহরের ভদ্রলোকদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য জানিয়ে আমরা টিকেট বিক্রী করেছি সকলে একবাক্যে আমাদের সাধুবাদ করেছেন আর আপনাদের দিয়েছেন ধিক্কার।

দীনবন্ধু ॥ তা দিন। তবুও আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, তাঁরা এমন একটা সৎকার্যের জন্যে টিকেট কিনে অর্থ সাহায্য করেছেন। কোম্পানীর তরফ থেকে আমরা এ বিষয়ে কিছু করতে পারিনি বলে আমি বিশেষ দুঃখিত। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে একশো টাকার একখানা টিকিট কিনছি।

লালমিঞা ॥ সেতো আমরা আপনাকে দিতে পারবো না স্যার।

দীনবন্ধু ॥ কেন?

লালমিঞা ॥ পাঁচটাকার বেশী আমাদের টিকিট নেই।

দীনবন্ধু ॥ ও—তা একশো টাকায় যে ক'খানা হয় তাই দিও।

লোহারাম ॥ Donation আর কি—সায়েব Donation দিচ্ছেন।

দীনবন্ধু ॥ হ্যাঁ। (নটবরের প্রতি) তারপর—মিষ্টার মহম্মদ উইলিয়াম নটবর গোস্বামী? এই রিহার্সালের পর এখানে আর কী প্রোগ্রাম?

নটবর ॥ আজ আর কিছু নেই স্যার।

দীনবন্ধু ॥ (লোহারামের প্রতি) বেশ ততক্ষণে তোমাদের ডিনার-পার্টিও বোধ হয় শেষ হয়ে যাবে—কী বল দাস?

লোহারাম ॥ হ্যাঁ স্যার, তা হবে।

দীনবন্ধু ॥ (শ্রমিকদের প্রতি) পালাগানের রিহার্সালের পর আবার আমরা এই "মিলন-মন্দিরে"ই সমবেত হবো এবং আশা করি তোমাদের কাছ থেকে যে উত্তর পাবো, তাতে আমাদের মিলনের ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হবে। এখনকার মতো সভা ভঙ্গ।

(সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। কর্তৃপক্ষ মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন। শ্রমিকগণ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া আলাপ করিতে করিতে চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে হারাণ লালমিঞাকে বলিল—)

হারাণ ॥ কী হে লালমিঞা, দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাবে না? এসো।

লালমিঞা ॥ (চেয়ারম্যানকে দেখাইয়া) একশো টাকা দেবেন বলেছেন।

হারাণ ॥ তা যখন বলেছেন ও তো পেয়েই গেছো।

লালমিঞা ॥ না, ওরকম অনেকেই বলেন—কিন্তু দেন না, তাই দাঁড়িয়ে আছি। আপনারা যান না—মিটিং করুন। আমরা হচ্ছি গিয়ে সব soldiers—যা হুকুম হবে, তামিল করবো।

হারাণ ॥ ও—আচ্ছা।

(হারাণ চলিয়া গেল। কর্তৃপক্ষ ততক্ষণে নীচে অবতরণ করিয়াছেন। দীনবন্ধু ও লোহারাম ব্যতীত তাহারাও চলিয়া গেলেন। লালমিঞা দীনবন্ধুর সামনে গিয়া টিকেটের খাতা পকেট হইতে বাহির করিল।)

লালমিঞা ॥ একশো টাকার একখানা টিকিট নেবেন বলেছিলেন স্যার।

দীনবন্ধু ॥ (লোহারামকে) মিষ্টার দাস, আমার একাউন্ট থেকে টাকাটা দিয়ে দেবেন। (লালমিঞার নিকট হইতে টিকেটটি লইয়া) মহুয়া! ব্যাপারটি কী বল তো? কার লেখা—বঙ্কিম বাবুর?

লালমিঞা ॥ আজ্ঞে না বঙ্কিমবাবু তখনও জন্মান নি। সাড়ে তিন শো বছর আগে পূর্ব্ববঙ্গের দ্বিজ কানাই নামে এক পল্লী-কবি এই "মহুয়া" পালাটা লেখেন। হুমড়া নামে এক বেদে দল-বল নিয়ে নদেরচাঁদ নামে এক ব্রাহ্মণ

জমিদারের বাড়ী খেলা দেখাতে আসে। হুমড়ার পালিত কন্যা মহুয়ার খেলা দেখে নদেরচাঁদ মহুয়াকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে যায়।

দীনবন্ধু ॥ Very interesting! বিয়ে হলো?

লালমিঞা ॥ না স্যার। মহুয়া রাজী হলো, কিন্তু হুমড়া বেঁকে বসলো। বললে,—বেদে—বেদে, ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ। তেলে-জলে কখনো মিশ খায় না।

দীনবন্ধু ॥ That's right!

লোহারাম ॥ বিবেচনা করুন, হিন্দু-মুসলমান আর কি। কিন্তু স্যার, পার্টিতে যাবার সময় হয়ে এলো।

দীনবন্ধু ॥ আচ্ছা যদি কখনও সময় করতে পারি, তোমাদের পালাগান শুনতে আসবো। হ্যাঁ, তোমাদের পালাগানটা কবে?

লালমিঞা ॥ পরশু, রবিবার।

দীনবন্ধু ॥ আচ্ছা, আসবো আসবো—

লালমিঞা ॥ ভুলবেন না স্যার। আচ্ছা—আদাব! কেয়ারটেকার স্যার—

নটবর ॥ (কাছে ছুটিয়া আসিয়া) বলুন স্যার, বলুন।

লালমিঞা ॥ আজ আমাদের পোষাক পরে রিহার্সাল হবে। লাইটগুলো সব ঠিক আছে তো?

নটবর ॥ সে আর বলতে হবে না স্যার। সে যা করেছি, তাক্ লাগিয়ে দোব।

লালমিঞা ॥ তাক্ দুভাবেই লাগাতে পারেন—কিছু করে অথবা কিছু না করে। দেখা যাক্।

(লালমিঞা মঞ্চের পার্শ্বে অবস্থিত কক্ষের অভিমুখে চলিয়া গেল। দীনবন্ধু দেওয়ালের ছবি ও পোষ্টারগুলি দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন। নটবর ইহাতে খুব উৎসাহী ও তৎপর হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি দীনবন্ধুর নিকটে গেল।)

দীনবন্ধু ॥ (নটবরের প্রতি) এই সব ছবি-টবি আগে ছিল না। কিন্তু এ বেশ হয়েছে।

নটবর॥ আমার এরকম অনেক পরিকল্পনা আছে স্যার। একটা পোষ্টার করাচ্ছি যে, ছাতা যে কেবল রোদ আর বৃষ্টি থেকে বাঁচায়, তা নয়—পাওয়ানাদারও ঠেকায়। হ্যাঁ, এক সময় আমাকেও ঠেকিয়েছে।

দীনবন্ধু॥ বেশ, বেশ। এতো নতুন idea হে, নতুন angle থেকে।

নটবর॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, এ সব আপনাকে দেখতে হবে না। দেখবেন, রাজছত্র কোম্পানীর গৌরবময় গোটা ইতিহাসটাই আমি ছবিতে আর চার্টে ঝুলিয়ে দেবো স্যার।

দীনবন্ধু॥ বেশ, বেশ! কিন্তু আপনার এই গৌরবময় নামটির ইতিহাসটা কী বলুন দেখি, শুনি।

নটবর॥ মানে স্যার, সাত ঘাটের জল খেয়েছি। দস্তুরমতো একট করুণ কাহিনী।

দীনবন্ধু॥ বটে?

নটবর॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

দীনবন্ধু॥ শুনতে পাই?

নটবর॥ নিশ্চয় স্যার। বৈরাগীর ঘরে জন্মেছিলাম। বড় গরীব ছিলাম, কিন্তু খুব ভালো কীর্তন গাইতে পারতাম। একদিন এক মিশনারী সাহেব আমার গান শুনে মোহিত হয়ে আমায় ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর চার্চে।

দীনবন্ধু॥ ছিলেন বৈরাগী,—হলেন খৃষ্টান?

নটবর॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। ছিলুম নটবর বৈরাগী,—হয়ে গেলাম উইলিয়াম। ভাত-কাপড়ের দুঃখ ঘুচলো। বেশ ভালোই ছিলাম। কিন্তু তারপর—(মাথা নিচু করিল)

দীনবন্ধু॥ হ্যাঁ, তারপর? থামলেন যে?

নটবর॥ তারপর—মানে—বয়স যখন একটু বাড়লো—তখন—মানে—(লোহারামের প্রতি) আপনি তো জানেন, আপনিই বলুন স্যার।

লোহারাম॥ তারপর একটু কেলেঙ্কারী ব্যাপার—মানে, বিবেচনা করুন

স্যার, একটি মুসলমান বিধবার প্রণয়াসক্ত হয়ে,—বিবেচনা করুন, মুসলমান হ'তেই হলো।

দীনবন্ধু ॥ বিধবার প্রণয়াসক্ত !

নটবর ॥ না, না, বিয়ে হলো স্যার।

দীনবন্ধু ॥ (হাসিয়া উঠিয়া) ও-আচ্ছা, আচ্ছা, তা' হলেন মহম্মদ। তা' মহম্মদ হলো—উইলিয়াম হলো—এখন বাকী থাকলো গোস্বামী ! তা—তারপর ?

নটবর ॥ তারপর স্যার, এলো ছে'চল্লিশের হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা। আমাদেরই এক হিন্দু চাকর,—যাকে আমরা ছেলের মত মানুষ করেছিলাম, ছেলের মতই দেখতাম, সে কিনা আমার চোখের সামনে আমার বিবিকে কচুকাটা করলে দলবল ডেকে এনে ! ধন-সম্পত্তি যা ছিল, সব লুট হলো। আমি শুদ্ধি হ'য়ে কোনমতে প্রাণে বেঁচে গেলাম,—হয়ে গেলাম গোস্বামী। হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়া একবার বাঁধলে,—আমি দেখেছি, কারুর কোন জ্ঞান থাকে না স্যার। দয়া, মায়া, ভালবাসা সব চলে যায়। সবাই পশু হ'য়ে যায়।

দীনবন্ধু ॥ (একটি নূতন আলোকের সন্ধান পাইয়া) ঠিক, ঠিক ! তুমি ঠিক বলেছো। ইংরেজ এই ঝগড়াটা চালু রেখেই এতোকাল রাজত্ব করতে পেরেছিল।

(ইতিমধ্যে মহুয়ার সাজে সজ্জিতা মায়া এবং নদেরচাঁদের সাজে সজ্জিত লালমিঞা পার্শ্বকক্ষ হইতে বাহির হইয়া দীনবন্ধুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। উহাদের দেখিয়া দীনবন্ধু বলিলেন)—

দীনবন্ধু ॥ ও বাবা ! এরা আবার কারা ?

লোহারাম ॥ বিবেচনা করুন, চিনতে পারছেন না স্যার ? লালমিঞা—নদেরচাঁদ সেজেছে। আর এ হলো গিয়ে মায়া, আমাদের ওয়াটারপ্রুফ ডিপার্টমেন্টের হেড মেকানিক জনার্দন দত্তের মেয়ে—মহুয়া সেজেছে।

দীনবন্ধু ॥ বাঃ ! বেশ তো !

[মায়া নমস্কার করিল]

লালমিঞা ॥ আমাদের পালাগান শুনতে সময় করে আসবেন—এ ভরসা আমরা রাখি না। পোষাক পরেই এখনি আমরা রিহার্সাল দোব। দলের সবাই তাই বলছে, যদি সময় করে আজই দেখে যেতেন, একশো টাকার টিকিটটার অন্ততঃ কিছু উশুল হতো।

দীনবন্ধু ॥ অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আজ কিছুতেই পারছি না। আসবো—প্লের দিন আমি নিশ্চয়ই আসবো।

লালমিঞা ॥ সেই ভালো স্যার। এসো মায়া—

(মায়াকে লইয়া লালমিঞা পুনরায় পার্শ্বপক্ষে চলিয়া গেলে দীনবন্ধু লোহারামকে বলিল—)

দীনবন্ধু ॥ এখানকার মেয়েরা দেখছি বেশ ফরওয়ার্ড!

লোহারাম ॥ বিবেচনা করুন, সবাই নয়। তবে হ্যাঁ, ওই মেয়েটি একটু বেশীরকম ফরওয়ার্ড। মানে, বাপের শাসন নেই। বিবেচনা করুন, এ জন্যে অনেক কেলেঙ্কারীও হচ্ছে—মানে, ঐ লালমিঞার সঙ্গে।

দীনবন্ধু ॥ বিয়ে-টিয়ে হবে নাকি ?

লোহারাম ॥ বিবেচনা করুন, ওদের দুজনের যেরকম মেলা-মেশা,—আর কানাঘুষো যা' শুনি, বিয়ে বোধ হয় হয়েই গেছে,—তবে গোপনে।

দীনবন্ধু ॥ কেন, গোপনে কেন ?

লোহারাম ॥ জনার্দন লোকটা ভারী গোঁড়া—সইবে না। বিবেচনা করুন, প্রকাশ হলে শেষ পর্য্যন্ত হিন্দু-মুসলমানে একটা দাঙ্গা বেধে যেতে পারে।

দীনবন্ধু ॥ দাঙ্গা ? বটে ! মারামারি ! কাটাকাটি ! রক্তারক্তি !

[দীনবন্ধুর মুখে ভাবান্তর দেখা গেল]

নটবর ॥ হ্যাঁ সার। আপনাকে তো বলছিলাম, তখন আর কোন জ্ঞান থাকে না,—সব পশু হয়ে যায় !

দীনবন্ধু ॥ আমি জানি—আমি জানি। সবাই জানে কিন্তু মজা এই,—কথাটা আবার সব সময়ে মনে থাকে না। চল দাস—ও হ্যাঁ, আমার ব্যাগ আর ওয়াটারপ্রুফটা ?

নটবর ॥ আমি নিচ্ছি স্তার।

[মঞ্চের উপর টেবিলে জিনিষ দুইটি ছিল। নটবর সেই দিকে ছুটিল।]

দীনবন্ধু ॥ নাঃ, লোকটা বেশ জ্ঞানী। বেশ একটা দামী কথা মনে করিয়ে দিয়েছে হে। তোমার সেই দালাল দুটি ঠিক আছে তো?

লোহারাম ॥ রীতিমত টাকা খাচ্ছে,—বিবেচনা করুন, কেন ঠিক থাকবে না? তাদের তো দেখলেন, শ্রমিকদের পক্ষে কেমন গরম গরম বক্তৃতা দিলে। বিবেচনা করুন, ওই আকবর মিঞা আর হারাণ বিশ্বেস।

দীনবন্ধু ॥ কিন্তু বাড়াবাড়িটা ভাল নয়। ওই করেই সব ধরা পড়ে।

(ইতিমধ্যে নটবর উক্ত জিনিষ দুইটি লইয়া আসিয়াছে। তাহার হাত হইতে ওই দুইটি লইয়া দীনবন্ধু বলিলেন—)

দীনবন্ধু ॥ Thanks! তোমার সঙ্গে আলাপ করে বেশ খুসী হলুম।

নটবর ॥ নিজের জীবনের অনেক বাজে কথা বলে আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করেছি। ক্ষমা করবেন স্তার।

দীনবন্ধু ॥ না, না, এ তোমার একার জীবনের কথা নয়। হিন্দু-মুসলমান—এ দুটো জাতের মধ্যে বিরোধ লাগাতে পেরেছিল বলেই তো ইংরেজ রাজত্ব করে গেল এতকাল—এত বড় দেশটায়! ওদের নীতিই ছিল—Divide and Rule! অথচ ইতিহাসের এই শিক্ষা আমরা ভুলে যাই। এসো দাস—আমার খাসকামরায় এসো।

[দীনবন্ধু ও লোহারাম চলিয়া গেলেন। নটবর ষ্টেজে লাইটিং-এর নির্দ্দেশ দিতে লাগিল।]

নটবর ॥ লণ্ঠন—। এই ন্যাড়া-বাবা আলোটা ফ্যাল—আর একটু—আর একটু…। ওহে গবু তুমিও আলোটা দাও। হ্যাঁ, হ্যাঁ,—আর একটু বড় করে দাও। হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে।

[লালমিঞার প্রবেশ]

নটবর ॥ নাঃ! তোমরা সব দেরী করে ফেললে। (ঘড়ি দেখিয়া) আর দশ মিনিটের মধ্যে ড্রপ তুলতে হবে—খেয়াল থাকে যেন।

লালমিঞা ॥ আপনিতো এখানে। ওদিকে গ্রীণরুমে হাতের কাছে কেউ কোন জিনিষ পাচ্ছে না বলে হৈ চৈ হচ্ছে।

নটবর ॥ হৈ চৈ করা ওদের স্বভাব! নৈলে সবইতো রয়েছে। আমি দেখছি।

[মায়ার প্রবেশ]

নটবর ॥ (মায়াকে দেখিয়া) এই তো—এই তো সাজগোজ সব হয়ে গেছে। দেখি—(মায়াকে নিরীক্ষণ করিয়া) ঠিক আছে। তবে—পাউডারটা আর একটু—আচ্ছা থাক। (লালমিঞাকে) লালমিঞা, তুমি ফার্ষ্ট সীনের জিনিষপত্রগুলো সাজিয়ে ফ্যালো। (মায়াকে) মায়া, এখানেও ওর পাশে তোমার দাঁড়ানো উচিত; মানে—এসব কাজে সব কিছুই সবাইকে দেখতে হয়। মানে—'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'—মনে রেখো।

[নটবর গ্রীণরুমের দিকে চলিয়া গেল। লালমিঞা কাজে লাগিয়া গিয়াছে। মায়াও তাহার সহিত যোগ দিতে গেল।]

মায়া ॥ (লালমিঞাকে একা পাইয়া—হঠাৎ—) শোনো, এ আর আমি সইতে পারছিনা।

লালমিঞা ॥ (বিস্ময়ে) কি—কি সইতে পারছো না মায়া ?

মায়া ॥ তোমার আমার বিয়ে নিয়ে এই যে সবাই কানাঘুষো করছে। বিয়ে করাই যদি আমাদের ইচ্ছা—তবে আর দেরী নয়।

লালমিঞা ॥ আমরা ধর্মঘট করবো বলেই দেরী হচ্ছে।

মায়া ॥ কী আশ্চর্য্য! ধর্মঘটের সঙ্গে বিয়ের কি সম্বন্ধ ?

লালমিঞা ॥ গুরুতর সম্বন্ধ।

মায়া ॥ কী গুরুতর সম্বন্ধ ?

লালমিঞা ॥ বলবো—সে তোমাকে বলবো। সেটা বলবার সময় এখন নয়। নাও—নাও—ওটা নিয়ে চল দেখি।

মায়া ॥ বলবে! তুমি কখন বলবে? কখন তোমাকে আমি একলা পাই? না, না, তুমি আমাকে বল।

লালমিঞা ॥ তোমাকে আমি বিয়ে করলে তোমার বাবা ক্ষেপে যাবেন। হিন্দুরা ক্ষেপে যাবে। হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাধবে। শ্রমিকের একতা নষ্ট হবে। ধর্মঘট ফেল করবে।...বিয়ে আমি তোমাকে করবোই। কিন্তু ধর্মঘটটা আগে ভালোয় ভালোয় চুকে যাক্।...কে?

[লণ্ঠনের প্রবেশ]

লণ্ঠন ॥ আজ্ঞে আমি লণ্ঠন। কেয়ারটেকারবাবু কইলেন, এখানে আলো কম হইছে।

লালমিঞা ॥ আলো কম হয়েছে! আলো কম হয়েছো তো তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকো। লণ্ঠন জ্বলুক। এসো মায়া—

লণ্ঠন ॥ তা যদি হতো দাঁড়াতাম। সেদিন কি আর আছে! লণ্ঠনের আলোতে এখন আর কারোর মনে ওঠেনা। যাই—আমি কই কেয়ার-টেকার বাবুরে—

[লণ্ঠনের প্রস্থান]

মায়া ॥ ধর্মঘট যদি ধর্ম হয়, আমাদের বিয়েটাও অধর্ম নয় লালুদা। আমি এটা কিছুতেই বুঝতে পারছিনা—পারছিনা আমি—একটা সত্য—একটা ধর্ম—আমরা যদি পালন করি, আর একটা সত্যে—আর একটা ধর্মে কেন আঘাত লাগবে। বুঝিনা—বুঝিনা আমি লালুদা।

লালমিঞা ॥ তা ঠিক, কিন্তু তবু—

[নটবরের প্রবেশ]

নটবর ॥ এই কম লাইটে তোমরা ছুটিতে এখানে কি করছো বল দেখি। এদিকে যে সব—

লালমিঞা ॥ এই একটু—

নটবর ॥ বুঝেছি—বুঝেছি—লাভ্ সিনটা ঝালিয়ে নিচ্ছিলে। কিন্তু আর কতো রিহার্সাল দেবে? এখন আসল কাজটা সেরে ফ্যালো দেখি। টাইম হয়ে গেছে। (ঘড়ি দেখিয়া) আমি কিন্তু এক্ষুনি সীন্ তুলছি। আলো নিভিয়ে দাও।

[আলো নিভিয়া গেল। নটবর বাঁশী বাজাইল। দ্বিতীয় দৃশ্যে মহুয়া পালা নাটক সুরু হইল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গিয়া যখন পুনরায় আলোকিত হইল, তখন দেখা গেল, হুমড়া বেদের দল পালাগান বর্ণিত সাজ-সজ্জা লইয়া খেলা দেখাইতে যাইতেছে লোক-সঙ্গীত ও লোক-নৃত্যের মাধ্যমে। পালাগানের সঙ্গে মূক অভিনয়।

—পালাগান—

হুমড়া বাইদ্যা ডাক দিয়া বলে মাইন্‌কিয়া ওরে ভাই।
ধনু কাঠি লইয়া চল তাম্‌সা করতে যাই ॥
যখন নাকি হুমড়া বাইদ্যা তুলে মাইলো বাড়ী।
নদ্যাপুরের যত মানুষ লাগলো দৌড়াদৌড়ি॥
একজনে ডাক দিয়া কয়রে আর এক জনের ঠাই।
ঠাকুর বাড়ী বাইদ্যার তাম্‌সা চল দেইখ্যা আই ॥

*　　*　　*

যখন নাকি বাইদ্যার ছেরি বাশে মাইলো লাড়া।
বইস্যা আছিল নদ্যার ঠাকুর উঠ্যা ঐল খাড়া ॥
দড়ি বাইয়া উঠ্যা যখন বাশে বাজী করে।
নইদ্যার ঠাকুর উঠ্যা কয় পইর‍্যা নাকি মরে ॥

কর্‌তালের ঝুনুঝুনু ভুলে যাইলো তালি।
গান করতে আইলাম আমরা নন্দ্যা ঠাকুরের বাড়ী ॥

[নৃত্য-গীত শেষ হইল। মহুয়া যাদুকরী মূর্ত্তিতে নদেরচাঁদের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার পশ্চাতে করযোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল হুমড়া বেদে।]

বাজী কর্‌লাম তাম্‌সা কর্‌লাম ইনাম বক্সিস চাই।
মনে বলে নন্দ্যার ঠাকুর মন যেন তার পাই ॥
হাজার টেকার শাল দিল আরো টেকা কড়ি।
বসত করতে হুমড়া বাইন্দ্যা চাইল একখান বাড়ী ॥
ডাইল দিল চাইল দিল রসুই কইর‍্যা খাইও।
নতুন বাড়ীতে যাইয়া তোমরা সুখে নিদ্রা যাইও ॥

[বেদের দল আনন্দচিত্তে নৃত্য-গীত সহকারে চলিয়া গেল। মহুয়া ছিল সর্বপশ্চাতে। নদেরচাঁদ ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ডাকিল। মহুয়া দাঁড়াইল।]

নদেরচাঁদ ॥

শুন শুন কইন্যা ওরে আমার কথা রাখ।
মনের কথা কইবা আমি একটু কাছে থাক ॥
সন্ধ্যা বেলায় চান্নি উঠে সুরয বইসে পাটে।
হেন কালেতে একলা তুমি যাইও জলের ঘাটে ॥
সইন্ধ্যা বেলা জলের ঘাটে একলা যাইও তুমি।
ভরা কলসী কাঙ্কে তোমার তুল্যা দিয়াম আমি ॥

মহুয়া ॥ সাপ খেলা দেইখবে গো—আইসো—আইসো—

[মহুয়া রহস্যময় ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইয়া ছুটিয়া পালাইল। নদেরচাঁদ মুগ্ধ বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল। মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।]

—পালাগান—

কলসী করিয়া কাঙ্কে মহুয়া যায় জলে।
নন্দ্যার চান ঘাটে গেল সেইনা সন্ধ্যাকালে।

[মঞ্চ পুনরায় আলোকিত হইলে দেখা গেল, জলভরা কলসী কাঁখে মহুয়া ও তাহার সম্মুখে নদেরচাঁদ দাঁড়াইয়া আছে।]

নদেরচাঁদ ॥ জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ ঢেউ।
হাসি মুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ ॥
কেবা তোমার মাতা কইন্যা কেবা তোমার পিতা
এই দেশে আসিবার আগে পূর্ব্বে ছিলি কোথা ॥

মহুয়া ॥ নাহি আমার মাতা পিতা গর্ভ সুদর ভাই।
সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই ॥
কপালে আছিল লিখন বাইদ্যার সঙ্গে ঘুরি।
নিজের আগুনে আমি নিজে পুইর‍্যা মরি ॥
এই দেশে দরদী নাইরে কারে কইবাম কথা।
কোন জন বুঝিবে আমার পুরা মনের বেথা ॥
মনের সুখে তুমি ঠাকুর সুন্দর নারী লইয়া।
আপন হালে করছ ঘর সুখেতে বান্ধিয়া ॥

নদেরচাঁদ ॥ কইন্যা তোমার শানে বান্ধা হিয়া।
মিছা কথা কইছ তুমি না কইরাছি বিয়া ॥

মহুয়া ॥ কঠিন তোমার মাতা পিতা কঠিন তোমার প্রাণ।
এমন যইবন তোমার যায় অকারণ ॥
কঠিন তোমার মাতা পিতা কঠিন তোমার হিয়া।
এমন যইবন কালে নাহি দিছে বিয়া।

নদেরচাঁদ ॥ কঠিন আমার মাতা পিতা কঠিন আমার হিয়া।
তোমার মত নারী পাইলে করি আমি বিয়া ॥

মহুয়া ॥ লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর ॥

নদেরচাঁদ ॥ কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি ॥

[মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।]

—পালাগান—

একজন হয় গহীন্ গাঙ্—আর একজন তাতে ডুইব্যা মরে! এইসব কথা কি কখনও ছিপা থাকে? এককান থাইকা পাঁচ কান হয়। শ্যাষে হুমড়া বাইগ্যাও খ'বরটা পায়। পাইয়া ভীষণ বিপদগ্রস্ত হইয়া তার দোস্ত মাইন্‌কিয়ারে ডাইক্যা কয়—

শুন শুন মাণিক ভাইরে বলি যে তোমাই।
এই না দেশ ছাইড়া চল অন্য দেশে যাই ॥
কি করবো ভাই বাড়ী ঘরে খাইবাম ভিক্ষা মাগে।
আমার কন্যা পাগল হইছে নথ্যার ঠাকুরের লাগে ॥

তখন সেই বাইগ্যার দল—

বাঁশ লইল দড়ী লইল সকল লইয়া সাথে।
পলাইল বাইগ্যার দল আইন্ধ্যারিয়া রাতে ॥
যখন নাকি নথ্যার ঠাকুর এই কথা শুনিল।
বাইগ্যার নারীর লাগ্যা ঠাকুর বৈদেশী হইল ॥
কিসের গয়া কিসের কাশী কিসের বৃন্দাবন।
বাগ্যার কন্যা খুজতে ঠাকুর ভরমে তিরভুবন ॥

খুঁজতে খুজতে গহন বনে মহুয়ার সন্ধান পেল নদের ঠাকুর। প্রেমের হলো জয়। মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে মহুয়া তার প্রাণপতি নদেরচাঁদের হাত ধরে বেদের দল থেকে পালিয়ে গেল দূরে…দূরে……বহুদূরে! কতো আপদ, কতো বিপদ—সব কিছু কাটিয়ে তারা বন-দম্পতি হয়ে যখন স্বর্গ-সুখে বাস করছিল, তখন অকস্মাৎ একদিন—

[মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।]

—পালাগান—

চৌদিকে চাইয়া দেখে শিকারী কুকুর!
সন্ধান করিয়া বাগ্যা আইল এত দূর ॥
সামনেতে হুমরা বাগ্যা যম যেন খারা।
হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছে বিষলক্ষের ছুরা ॥

[মঞ্চ আলোকিত হইলে দেখা গেল, নদেরচাঁদ ও মহুয়ার সামনে সদলবলে হুমড়া দাঁড়াইয়া আছে। হুমড়ার হাতে শাণিত ছুরিকা।]

হুমড়া ॥ প্রাণে যদি বাঁচ কন্যা আমার কথা ধর।
বিষলক্ষের ছুরি দিয়া দুস্মনেরে মার ॥
আমার পালক পুত্র সুজন খেলোয়ার।
বিয়া তারে কর কন্যা চল মোদের সাথ ॥

মহুয়া ॥ কেমনে মারিব আমি পতির গলায় ছুরি।
খারা থাক বাপ তুমি আমি আগে মরি ॥
কেমন করি যাইবাম দেশে বন্ধুরে মারিয়া।
তোমার সুজনে আমি না করবাম বিয়া ॥
আমার বন্ধু চান্দ সুরজ কাঞ্চা সোনা জ্বলে।
তাহার কাছে সুজন বাগ্যা জোনাকি যেন জ্বলে ॥
সোনার তরুয়া বন্ধু একবার পেখ।
আমার চক্ষু তুমি নিয়া নয়ান ভইরা দেখ ॥

হুমড়া গর্জিয়া উঠিয়া বিষলক্ষের ছুরি মহুয়ার হাতে দেয়। মহুয়া সেই ছুরি লইয়া একবার সখী পালংএর দিকে চাহিল, পরে নদেরচাঁদের দিকে চাহিয়া বলিল—

মহুয়া ॥ শুন শুন প্রাণপতি বলি যে তোমারে।
জন্মের মতন বিদায় দেও এই মহুয়ারে ॥
শুন শুন পালং সই শুন বলি কথা।
কিঞ্চিৎ বুঝিবে তুমি আমার মনের বেথা ॥

শুন শুন মাও বাপ বলি হে তোমায়।
কার বুকের ধন তোমরা আইনাছিলা হায়॥
ছুট কালে মা বাপের কুল শুন্য করি।
কার কুলের ধন তোমরা কইরেছিলে চুরি॥
জন্মিয়া না দেখলাম কভু বাপ আর মায়।
কর্ম দোষে এতদিনে প্রাণ মোর যায়॥

মহুয়ার নিজের বক্ষে ছুরিকা আঘাত ও পতন। হুমড়ার আদেশে বেদের দল কর্তৃক নদেরচাঁদের প্রাণবধ।

[মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে লালমিঞার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—]

লালমিঞা॥ আলো—আলো—শীগ্‌গীর আলো—আমার কপালে লেগেছে।

[মঞ্চ পুনরায় আলোকিত হইলে দেখা গেল, লালমিঞা হুমড়ার দলের অস্ত্রাঘাতে সত্য সত্যই আহত হইয়াছে এবং তাহার কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। সে হাত দিয়া ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিল।]

লালমিঞা॥ কনক, এ তোমাদের কি কাণ্ড? আমার কপালটা কেটে ফেলেছো?

[সকলে ছুটিয়া আসিল]

১ম জন॥ তাই তো!

২য় জন॥ উঃ, কী ভীষণ রক্ত পড়ছে!

মায়া॥ আপনাদের কী কাণ্ড বলুন তো! প্লে করতে এসে মানুষ খুন করে ফেললেন!

[এমন সময়ে দীনবন্ধু, লোহারাম ও নটবর উইংস্‌-পথে সেখানে ছুটিয়া আসিল। দীনবন্ধুর হাতে পোর্টফলিও ও ওয়াটারপ্রুফ।]

দীনবন্ধু॥ কপাল কেটে গেছে দেখছি—**First Aid! First Aid!**

লোহারাম॥ গোস্বামী—**First Aid**—

নটবর॥ **Yes Sir!** আসুন লালমিঞা।

লালমিঞা ॥ কিন্তু আপনারা—এখন—এখানে !

দীনবন্ধু ॥ প্লের পর আমাদের তো এখানে একটা সভা হবে কথা ছিল। এসে দেখি, তোমাদের শেষ দৃশ্য প্লে হচ্ছে। চমৎকার লাগছিলো। কিন্তু তোমাদের প্লেটা যে এতো মারাত্মক রকম ভালো হ'বে—এতো ভাবতে পারিনি। থাক, তুমি আর দেরী করো না। গোস্বামী, তুমি একে এখনি ডিস্‌পেন্সারীতে নিয়ে যাও।

নটবর ॥ হ্যাঁ স্যার। (লালমিঞাকে) আপনি আসুন। ডাক্তারের আবার বাড়ী চলে যাওয়ার সময় হয়েছে।

লালমিঞা ॥ না না, এতো ঘাবড়াবার কিছু হয়নি !

লোহারাম ॥ বিলক্ষণ ! ঘাবড়াবার ব্যাপার নয় ? বিবেচনা কর, সেপ্‌টিক্ হয়ে যেতে পারেতো !

মায়া ॥ তুমি একা যাবে লালু দা ?

লালমিঞা ॥ (হাসিয়া) আরে না না, তোমাদের ব্যস্ত হবার মতো কিছুই হয় নি। আমি একাই যাচ্ছি। তোমরা এখনি ষ্টেজটা খালি করে দাও, মিটিং হবে। দেখছো না, ওঁরা সব এসে পড়েছেন। (নটবরকে) না, না, আপনাকেও আসতে হবে না। আপনি পোষাক-টোষাকগুলো kindly বুঝে নিয়ে তুলে রাখুন। [লালমিঞার প্রস্থান।]

দীনবন্ধু ॥ (মায়ার প্রতি) তুমি এতো ভালো অভিনয় করতে শিখলে কোত্থেকে ?

মায়া ॥ (নমস্কার করিয়া) যদি ভালো করে থাকি, সে প্রশংসা লালুদার প্রাপ্য। আর যদি খারাপ হয়ে থাকে সে দোষটা আমার।

দীনবন্ধু ॥ আমি যেটুকু দেখেছি, খুবই ভালো লাগলো। নাঃ, সবাই সত্যি খুবই ভালো করেছে।

[নটবর ইতিমধ্যে পার্শ্বকক্ষ হইতে দুইখানি চেয়ার আনিয়া হাজির করিয়াছে।]

নটবর ॥ বসুন স্যার। আমি মিটিং-এর এখনি সব ঠিক করে দিচ্ছি !

(অভিনেতা ও অভিনেত্রীবৃন্দকে) আস্থন, আস্থন, আপনারা সব ষ্টেজ থেকে সরে আস্থন। এটাকে এখনি মিটিংএর জায়গা করতে হবে। লণ্ঠন, লণ্ঠন—আঃ, কোথায় যে সব থাকে! সব কাজ একা আমাকে করতে হবে!

[নটবর পার্শ্বকক্ষে চলিয়া গেল। অভিনেতা ও অভিনেত্রীবৃন্দ তাহাকে অনুগমন করিল। মায়াও চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে দীনবন্ধু তাহাকে ডাকিলেন।]

দীনবন্ধু ॥ (মায়াকে) শোন, শোন,—তুমি এত ভাল অভিনয় করতে শিখলে কোত্থেকে?

মায়া ॥ লালুদা শিখিয়েছে।

[লণ্ঠনের প্রবেশ]

লণ্ঠন ॥ মায়াদি—কে?

মায়া ॥ আমি। কেন?

লণ্ঠন ॥ আপনার মার শূল-বেদনা হয়েছে। আপনাকে এখনি বাড়ী যেতে বলেছেন।

মায়া ॥ শূল-বেদনা হয়েছে? কে বললে?

লণ্ঠন ॥ পাড়ার কেউ হবে! আমি নতুন লোক,—চিনি না। নাম বললো আবদুল!

মায়া ॥ আবদুল! ইব্রাহিম কাকার শালা। কোথায় সে?

লণ্ঠন ॥ যখন এসেছিল, তখন প্লে হচ্ছিল। বলে গেল প্লে ভাঙলেই আপনাকে চলে যেতে। বললো, ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি।

মায়া ॥ সে কি! আমি যাচ্ছি।

(মায়া যাইতে গিয়া পোষাকের কথা মনে পড়ায় পার্শ্বকক্ষের দিকে ফিরিল।)

দীনবন্ধু ॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও (লণ্ঠনকে) ওহে ছোকরা, কোথায় থাক? গোস্বামীবাবু একা একা খেটে মরছেন। যাও, ভেতরে তাঁর কাছে যাও।

[লণ্ঠন এই তাড়াতে ভিতরে পালাইল।]

দীনবন্ধু ॥ কলিক্‌পেন উঠেছে তোমার মার। তা এক কাজ কর। আমার গাড়ী রয়েছে,—তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবে ? ...

মায়া ॥ তাহ'লে খুব ভাল হয়। সাজ-সজ্জা ছাড়তে, রঙ তুল্‌তে অনেক সময় লাগবে। গাড়ীটা পেলে আমি এসব নিয়েই বাড়ী ছুটতে পারি।

দীনবন্ধু ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়—এখনি। (লোহরামকে ইঙ্গিত) দাস, তুমিই ড্রাইভারকে বলে দিয়ে এসো।

মায়া ॥ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

[লোহারামের সহিত মায়ার প্রস্থান।]

(দীনবন্ধু চেয়ারে বসিলেন এবং পকেট হইতে সিগারেট কেস বাহির করিয়া তাহা হইতে একটি সিগারেট লইয়া তাহা ধরাইলেন। অদূরে সমবেত কণ্ঠে "ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ" ধ্বনি শোনা গেল। ছুটিয়া লোহারামের প্রবেশ।)

লোহারাম ॥ স্যার, মিটিং ভেঙেছে—ওরা সব আসছে। বিবেচনা করুন,—আমাদের আর একটু দেরী হলেই সব ভেস্তে যেতো !

দীনবন্ধু ॥ গাড়ীটা আশা করি ওদের পথে পড়বে না।

লোহারাম ॥ না স্যার।

(নেপথ্যে "ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ" ধ্বনি শোনা গেল। জনার্দন ও ইব্রাহিমের প্রবেশ।)

জনার্দন ॥ মিটিংটা শেষ হতে আমাদের একটু দেরী হয়ে গেল। আপনি হয়তো অপেক্ষা করছেন।

দীনবন্ধু ॥ (হাতঘড়ি দেখিয়া) তা' করছি বটে, কিন্তু তাতে আমার ক্ষতি হয়নি। ছেলে-মেয়েদের পালাগানের শেষ দৃশ্য দেখছিলাম। সত্যি, ওরা বেশ করে। কিন্তু তোমরা মাত্র দু'জন এলে ? আর সব।

ইব্রাহিম ॥ আমাদের দু'জনকেই তারা প্রতিনিধি পাঠিয়েছে।

দীনবন্ধু ॥ বেশ, বেশ। (জনার্দনকে) হিন্দুদের প্রতিনিধি বুঝি তুমি ? (ইব্রাহিমকে) আর মুসলমানের প্রতিনিধি বুঝি তুমি ?

জনার্দন ॥ না, না, হিন্দু মুসলমান হিসেবে আমরা আসিনি। খেটে-খাওয়া মজুরের কি আর কোন জাত আছে? ও মজুর—মজুর।

ইব্রাহিম। দুনিয়ায় দুটো মাত্র জাত আছে স্যার। শ্রমিক—আমরা, আর ধনিক—আপনারা। এ ছাড়া আর কোন জাত নেই।

দীনবন্ধু ॥ (হাসিয়া) ওহে আমরাও শ্রমিক—খেটেই খেতে হয়। বেশ, বেশ কিন্তু জাতিতত্ত্বের কথা ছেড়ে এখন মিটিং-এ কী সিদ্ধান্ত হলো, সেইটেই আমি জানবার জন্যে উৎসুক।

জনার্দন ॥ বাড়তি মজুরী না পেলে বাড়তি কাজ আমরা করবো না।

দীনবন্ধু ॥ তাহ'লে ছাঁটাই অনিবার্য্য।

ইব্রাহিম ॥ না, তাও চলবে না। তা আমরা সইবো না।

জনার্দন ॥ একজন লোকও যদি ছাঁটাই হয়, তাহ'লে আমরা ধর্মঘট করবো।

দীনবন্ধু ॥ (হাসিয়া) বেশ! এ সব সিদ্ধান্ত তোমরা সব দিক ভেবে-চিন্তেই করেছ, আশা করি।

জনার্দন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা ভেবে দেখেছি যে, গুদামে যখন ছাতা অনেক জমেই রয়েছে, তখন তো আর পুরো কাজ করার কোম্পানীর দরকার নেই। কাজেই হপ্তায় ৪৫ ঘণ্টার মধ্যেই কোম্পানী অর্ডারী লাঠি তৈরী করে নিতে পারবে।

দীনবন্ধু ॥ পারে কি না পারে, সেটা বোধ হয় আমরাই বেশী বুঝি। বেশ, তোমাদের সিদ্ধান্ত আমাদের বোর্ডের মিটিং-এ কালই পেশ করবো এবং আমাদের সিদ্ধান্ত তোমাদের জানতে কিছুমাত্র বিলম্ব হবে না। আচ্ছা, অনেক রাত হয়েছে,—আমি উঠি। আমাকে আবার এই রাত্রেই কলকাতায় ছুটতে হবে।

ইব্রাহিম ॥ আপনার মোটরটা চলে গেল দেখে আমরা ভাবছিলাম, আমাদের দেরী দেখে আপনি বোধ হয় চলেই গেলেন।

দীনবন্ধু ॥ (হাসিয়া) সিদ্ধান্তটা না জেনে কী করে যাই? মোটরটা পেট্রোল আনতে গেছে।

ইব্রাহিম ॥ আপনাদের সিদ্ধান্তটা আমরা কবে জানতে পারবো ?

দীনবন্ধু ॥ পরশু। আজ একটু রিহার্সাল দেখে আমি এতো খুসী হয়েছি যে, পরশু ছেলে-মেয়েদের পালাগান শুনতে আমি নিজেই আসছি। এরা করলো বেশ, কিন্তু বিষয়টা বড় সেকেলে। বেদের মেয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণের ছেলের বিয়ে হলো না,—অথচ উভয়েই পরস্পরকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আজকালকার দিনে এটা অচল—নয় কি ? রিহার্সাল দেখতে দেখতে দাশসাহেবই বলছিলেন, তোমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে হবে কিম্বা হয়েই গেছে।

জনার্দন ॥ কই, না তো।

লোহারাম ॥ বিবেচনা করুন, আমি কানাঘুষা যা শুনেছি, তাই বলছি স্যার।

জনার্দন ॥ আমি প্রতিবাদ করছি। এ রকম কোন কথা হয়নি, হতে পারে না। ইব্রাহিম তুমিই বল।

ইব্রাহিম ॥ না, এ সব কথা মিথ্যা। একসঙ্গে ওরা খেলাধুলা করেছে, মানুষ হয়েছে। মেলামেশাতে তাই ওদের কোনো বাধা নেই।

দীনবন্ধু ॥ তাই বল। আমিও ভাবছিলুম, এ কী হতে পারে !

[এমন সময়ে মোটর পৌছিবার শব্দ শোনা গেল।]

লোহারাম ॥ ওই গাড়ী এসে গেছে।

[গাড়ীর শব্দ শুনিয়া লণ্ঠন ও নটবর ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।]

লোহারাম ॥ (লণ্ঠনকে) সাহেবের জিনিষগুলো গাড়ীতে তুলে দে।

[লণ্ঠন চেয়ারে রক্ষিত ওয়াটারপ্রুফ ও পোর্টফোলিও তুলিয়া লইল।]

দীনবন্ধু ॥ (জনার্দনকে) তোমার স্ত্রীর খুব অসুখ শুনে গেলাম। কলিক্-পেন্ হলেও অবহেলা করা ভাল নয়। ডাক্তার দেখিও। আচ্ছা চলি।

জনার্দন ॥ আমার স্ত্রীর কলিক্ পেন্ ? কই না। কে বললো ?

দীনবন্ধু ॥ এই ছেলেটা এসে তোমার মেয়েকে খবর দিতেই তোমার মেয়ে ছুটে বাড়ী চলে গেল।

জনার্দন ॥ (লণ্ঠনকে) তোকে কে বললে?

লণ্ঠন ॥ প্লের সময় একটা লোক এসে মায়াদিকে নিজে বলতে না পেরে আমাকে বলে গেল। নাম বললো আবদুল।

ইব্রাহিম ॥ আমার শালা?

জনার্দন ॥ আমার স্ত্রীর কলিক্ পেন্! কোনোকালে তো ছিল না।

দীনবন্ধু ॥ হয়নি—হ'তে কতক্ষণ। কলিক্ পেনের কথা বলা যায় না। কলিকের সময় অসময় নেই। না, আজ দিনটাই খারাপ। তোমার মেয়ে তো ওই খবরে পাগল হয়ে বাড়ী ছুটলো। তুমিও যাও—আর দেরী করো না—দ্যাখ গিয়ে কি হলো।

জনার্দন ॥ কলিক্ পেন্! ইব্রাহিম, আমি যাই তাহ'লে—তুমি থাকো—কথাবার্তা শেষ করে নাও।

ইব্রাহিম ॥ না-না আমিও যাই।

জনার্দন ॥ না। তুমি এখানকার কাজ শেষ করেই এসো।

[জনার্দনের প্রস্থান।]

দীনবন্ধু ॥ নাঃ! আজকের দিনটাই খারাপ। তোমার ছেলেও তো আবার কপাল কেটে গেছে বলে দৌড়োলো ডাক্তারের কাছে।

ইব্রাহিম ॥ আমার ছেলে—লাল? কপাল কেটে গেছে তার?

দীনবন্ধু ॥ হ্যাঁ, এইতো রিহার্সাল দিতে দিতে কি করে কাটলো—রক্তারক্তি ব্যাপার! তুমিই বা আর থেকে কি করবে? যাও দেখ—

ইব্রাহিম ॥ কপাল কাটলো—আচ্ছা, তবে আমি যাই। দেখি আবার।

[ইব্রাহিমের প্রস্থান]

দীনবন্ধু ॥ (লোহারামের দিকে তাকাইয়া ও ইউনিয়নের চিঠি পড়িতে পড়িতে) কী দাস ওরা ধর্মঘট করবেই? আচ্ছা করুক। (পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইয়া টানিতে লাগিলেন)।

তৃতীয় দৃশ্য

কোম্পানী কর্তৃকনির্মিত শ্রমিক-কলোনীর মধ্যে একটি উন্মুক্ত স্থানে অবস্থিত গোলঘর। গোলঘরের উপরে চালা ও চারিধারে কেন্দ্রাকারে বাঁধানো বেদী। এখানে কথকতা, লোক-সঙ্গীত, ছোটখাটো সভাসমিতি, গল্প-গুজব প্রভৃতি হয়। এক কথায়, সর্ব শ্রেণীর শ্রমিকরা এখানে আসিয়া মেলামেশা করে।

রবিবার বৈকালে জনার্দন বেদীতে বসিয়া চিন্তিত মনে মাঝে মাঝে হুঁকা টানিতেছে ও মাঝে মাঝে কী যেন ভাবিয়া লইতেছে। পার্বতী তাহার বাসা হইতে এখানে আসিল, কিন্তু জনার্দন তাহার উপস্থিতি লক্ষ্য করিলনা। তখন পার্বতী বিরক্ত হইয়া জনার্দনের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

পার্বতী ॥ বেহুঁস হয়ে এখানে বসে বসে হুঁকো টানলেই চলবে? মেয়ে হারিয়েছে শুক্রবার রাত্রে। আজ রোববারের রাত এসে গেল—মেয়ের কোনো পাত্তা নেই। কোন্ আক্কেলে তুমি এখনও বসে আছো! মজা দেখছো—না?

জনার্দন ॥ খুঁজতে কেউ বাকী রাখেনি। ইব্রাহিম দল-বল নিয়ে—শুধু আমাদের কলোনী নয়, আশে পাশে সব জায়গায় খুঁজেছে। না পাওয়া গেলে কপালের দোষ বল।

পার্বতী ॥ রাখো তোমার ইব্রাহিম। আবদুলকে বেত-মারো—জুতো মারো—ওর টুটি চেপে ধরো। ওর মুখ থেকেই বেরুবে কোথায় আমার মেয়ে। কতো বড়ো শয়তান! আমার হয়েছে শূলবেদনা! ওকে ধর—ওকেই শূলে দাও।

জনার্দন ॥ আবদুল এর মধ্যে থাকতেই পারে না। একেবারে বাজে কথা। কতোবার তোমাদের বলবো যে, আবদুল তখন আমার পাশেই বসে ছিল আমাদের মাঠের মিটিং-এ। তাছাড়া আবদুলকে আমরা এতোকাল দেখে আসছি,—তার স্বভাব-চরিত্তির আমরা না জানি তা' নয়। ও সব কথা রাখো। আমার এখন মনে হচ্ছে মেয়েটা নিজেই পালিয়েছে। কিন্তু কেন

পালালো বুঝছি না। এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে আমার—এ নির্বুদ্ধির কাজ কেন করলো!

পার্বতী ॥ তা যদি পালিয়ে থাকে, তাহ'লে বলবো সে জন্যে দায়ী তুমি। মেয়েকে আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলেছিলে। দুপাতা লেখাপড়া শিখেছে বলে মেয়ে ঘর-গেরস্থালীর কাজ ছেড়ে পাড়ায় পাড়ায় নেক্‌চার দিয়ে বেড়ায় কার আস্কারায়? তোমার। ধাড়ী ধাড়ী ছেলেদের সঙ্গে মেলা-মেশা করে গান বাজনা করে, থ্যাটার করে: বাধা তো দাওনিই,—বরং তারিফ করেছো। মেয়েছেলের মাথা এতে ঠিক থাকে—ওই সোমত্ত মেয়ের? এখন হ'লো তো! মুখে চূণকালী পড়লো তো!

জনার্দন ॥ বুঝছি না কোত্থেকে কী হয়ে গেলো। আমাদের ছেলে নেই—সে জন্যে দুঃখ করিনি কোনোদিন। মেয়েটাই ছিল আমার ছেলে—ছিল আমার হাতের লাঠি। কেন যে হঠাৎ তার এ দুর্বুদ্ধি হল!

পার্বতী ॥ যতো দুর্বুদ্ধিই থাক, আমি বলবো মেয়ে আমার পালায়নি। দোষ তার ছিল অনেক কিন্তু বাপ মা বলতে সে ছিল অজ্ঞান। আমার মন বলছে, মেয়েকে কেউ চুরি করেছে—জোর করে তাকে ধরে নিয়ে গেছে। তুমি ওঠো। বসে থাকলে আর চলবে না। থানায় যাও, পুলিশে খবর দাও। আবদুলের পিঠে চাবুক পড়ুক। ঘরে ঘরে খানাতল্লাসী হোক্। মেয়ে আমার যাবে কোথায়!

(ইব্রাহিমের প্রবেশ)

ইব্রাহিম ॥ এই যে বৌদি! তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম। আচ্ছা, আবদুল কি পরশুদিন কোনো সময়ে তোমাদের বাড়ীতে এসেছিল?

(পার্বতী ইব্রাহিমের দিকে ঘৃণায় তাকাইল না, তাহার কথার উত্তরও দিল না। সে সোজা জনার্দনকে বলিল,)—

পার্বতী ॥ আমার যা বলার তোমায় বলেছি। তে-রাত্রির মধ্যে আমি আমার মেয়ে চাই। নইলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।

[পার্বতীর প্রস্থান]

ইব্রাহিম ॥ এ কথা বললে বৌদিকে আমরা দোষ দিতে পারি না দাদা। দোষ আমাদেরই। একশোবার বলবো দোষ আমাদের। আমাদের মেয়ে—আমাদের চোখের ওপর থেকে হারিয়ে যাবে? এমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের সমাজ! তুমি আবার ভেবে বল দাদা, আবদুলকে কি তুমি সেদিন ওই মিটিং-এ আগাগোড়া দেখতে পেয়েছিলে? আমি যতদূর মনে করতে পারছি, আমি তাকে গোড়ায় দেখেছিলাম, কিন্তু শেষে দেখিনি!

জনার্দন ॥ শেষে? (একটু চিন্তা করিয়া) শেষের কথা আমার ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। কিন্তু প্রথমটায়—হ্যাঁ, আমার স্পষ্ট মনে হচ্ছে, আবদুল আমার কাছাকাছিই দাঁড়িয়েছিল। মিটিং-এ যখন একটা গোলমাল সুরু হলো, তখন তা' থামাতে আমি এগিয়ে গেলাম, তুমিও আমার সঙ্গে গেলে—হ্যাঁ,—না, তারপর তো আর দেখিনি।

ইব্রাহিম ॥ আরো কয়েকজনকে জেরা করে আমি এটা বের করেছি, শেষের দিকে মিটিং-এ ওকে কেউ দেখেনি। ওকে আমি এখানে ধরে আনতে বলেছি। ওই এসেছে—

(হারাণ, আকবর, আশু, বিশু প্রভৃতি কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান শ্রমিক আবদুলকে ধরিয়া লইয়া আসিল)

আকবর ॥ কিছুতেই আসতে চায় না, ধরে এনেছি।

ইব্রাহিম ॥ বটে!

আবদুল ॥ খোদার কশম নিয়ে বলছি, আমি কিছু জানি না। লণ্ঠন হলফ করে তোমাদের কাছে বলেছে, যে লোক সেদিন তার কাছে গিয়ে কলিকের কথা বলেছিল, সে লোক আমি নই। তবু বারবার আমার ওপর এ জুলুম কেন বলতে পারো?

ইব্রাহিম ॥ রেখে দে তোর লণ্ঠন। তাকে তুই ঘুষ দিয়েছিস, তাই সে মিথ্যে কথা বলেছে।

আব্দুল ॥ এতো বড়ো কথা তুমি বলছো মিঞা?

ইব্রাহিম॥ হ্যাঁ, বলছি এইজন্যে যে, আমি প্রমাণ পেয়েছি, সেদিনকার মিটিং-এ তুই গোড়ায় ছিলি, শেষটায় ছিলি না।

হারাণ॥ না, না, একথা সত্যি নয়। আমরা ওকে মিটিং-এ বরাবরই দেখেছি, ভাঙবার সময়েও দেখেছি। কীহে, তোমরা দ্যাখোনি?

আকবর॥ না সর্দার, তোমার একথা সত্যি নয়। মিটিং-এ আব্দুল আগাগোড়াই ছিল।

জনার্দন॥ না বাবা আব্দুল, এরা অনর্থক তোমাকে হয়রানী করেছে। তোমাকে তো আমি জানি বাবা। তোমরা সকলে আমার মেয়েকে বোনের মতো দেখতে। কিছু মনে ক'রো না বাবা। মায়াকে হারিয়ে আমাদের কারুর মাথার ঠিক নেই। যাও বাবা, যাও—কাজে যাও।

আব্দুল॥ কাজ আর কী করবো সর্দার। কে যে কেন আমার নামে এই কেচ্ছা রটালো, আমি তো ভেবে পাই না। তুমি বলছো, মায়া আমার বোন। আমি বলছি মায়া আমার মা। সেবার যখন আমার বসন্ত হয়েছিল, তখন কে আমার সেবাশুশ্রূষা করেছিল? তোমারই ওই একরত্তি মেয়ে আজও আমি তা ভুলতে পারি না।

(অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আব্দুল চলিয়া গেল। সমবেদনায় কয়েকজন তাহার সহিত গেল। ইব্রাহিম ও কয়েকজন রহিল)

ইব্রাহিম॥ তোমরা এখানে বসলে কেন? যাও খুঁজে দ্যাখ।

আশু॥ আর কোথায় দেখবো? খুঁজে দেখার কি বাকী আছে?

ইব্রাহিম॥ একটা কিছু করো। মেয়েটাকে তো খুঁজে বার করতেই হবে।

আশু॥ বলছো যখন—দেখি আবার।

[অন্যান্য সকলেই চলিয়া গেল। রহিল শুধু জনার্দন, ইব্রাহিম ও হারাণ]

ইব্রাহিম ॥ সত্যিই আজ আমাদের মাথার ঠিক নেই। কী যে করবো, কিছুই বুঝছি না।

জনার্দ্দন ॥ আমি ভেবে দেখছি, পুলিশে খবর দেওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই।

ইব্রাহিম ॥ সে কথা তো আমি আগেই বলেছিলাম দাদা, তখন তুমি শুনলে না।

জনার্দ্দন ॥ মায়াকে আব্দুল সরিয়েছে, একথা আমার কোন সময়েই বিশ্বাস হয়নি। আমি তাই বাধা দিয়েছিলাম। আজ বুঝছি, মায়াকে কেউ সরায় নি। মায়া পালিয়েছে। আমাদের সবার মুখে এমন করে চুণকালি দিয়ে সে পালিয়ে যাবে? চল ইব্রাহিম, থানায় চল।

ইব্রাহিম ॥ না দাদা, তা' হবে না। পুলিশে খবর দেওয়া চলবে না। যদি সে পালিয়েই থাকে, কোথায় যাবে? দুদিনেই আমাদের কাছে ধরা পড়বে। পুলিশে খবর দিয়ে মিছে কেলেঙ্কারী করে লাভ নেই। মনে রেখো দাদা, মায়াকে তোমার বিয়ে দিতে হবে। লালমিঞা বলে গেছে, যেখান থেকেই হোক্ সে মায়াকে খুঁজে বের করবে। আমিও তোমায় বলে যাচ্ছি, মায়াকে বের না করা পর্যন্ত দানা-পানি আমি মুখে নেবো না। মায়া শুধু তোমার নয়,—আমাদেরও।

(ইব্রাহিম চলিয়া গেল)।

হারাণ ॥ তোমাদের তো বটেই, সেই জন্তেই তো পুলিশে খবর দিতে এতো আপত্তি!

জনার্দন ॥ কী বললে হারাণ?

হারাণ ॥ বলছিলাম—মানে—অনেকেই বলছে ব্যাপারটা নিয়ে একটা ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় খেলা চলছে। মানে—অনেক কিছু ঘটছে, যা' আমাদের মতো সোজা লোকেরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। আর তাতেই ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

জনার্দন ॥ তোমার ওই বাঁকা বাঁকা কথা ছেড়ে দাও হারাণ। কী বলতে চাইছো, সোজা কথায় বলো।

হারাণ ॥ আমি কিছুই বলতে চাই না। তবে যারা এই সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, তাদের অনেকেই বলছে,—হ্যাঁ, সে একটা বেশ গল্পের মতো।

জনার্দন ॥ কী বলছে ?

হারাণ ॥ লালমিঞা নাকি মায়াকে সাদি করতে চেয়েছিল—

জনার্দন ॥ কথাটা আজ এই তিনদিন ধরে শুনছি বটে, কিন্তু আমিতো বলেছি, আমি বা মায়ার মা এ বিষয়ে কিছু জানি না।

হারাণ ॥ তোমরা জানলে তো আর সাদিটা হয় না, তাই তোমাদের জানবার কথাও নয়।

জনার্দন ॥ জানলেই যে সাদি হতো না, তারও কোনো মানে নেই হারাণ। মেয়ে যদি নাবালিকা হতো, তবে অবশ্য এ বিয়েতে আমরা কখনো রাজী হতাম না। কিন্তু মেয়ে এখন সাবালিকা। তার মত হলে—এ বিয়েতে অন্ততঃ আমি কোন বাধা দিতাম না।

হারাণ ॥ গল্পটা হচ্ছে এই,—মায়ারও এতে মত ছিল না। কাজেই নাকি মায়াকে সরানো হয়েছে।

জনার্দন ॥ কে সরিয়েছে ? লালমিঞা ?

হারাণ ॥ গল্পটা এখন সেই রকমই দাঁড়িয়েছে। লালমিঞা যে শুধু মায়াকে সরিয়েছে তা নয়, নিজেও এখন সরে পড়েছে।

জনার্দন ॥ তুমি বলছো কী !

হারাণ ॥ এ যা' বলছি, এ কিন্তু গল্প নয়। খোঁজ নিয়ে দ্যাখো, কাল সন্ধ্যে থেকে লালমিঞা হাওয়া। আর লালমিঞা হাওয়া হয়েছে বলেই পুলিশে খবর দিতে আমাদের এতো আপত্তি,—বুঝলে সর্দার ?

জনার্দন ॥ (ক্রুদ্ধস্বরে) হারাণ !

হারাণ ॥ চোখ রাঙালে আমি না হয় চুপ করে থাকবো সর্দার, কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে অনেকে এ-ব্যাপারে এতো ক্ষেপে উঠেছে যে, তারা থামবে না। আমরা

শ্রমিক—আমরা সব একজোট, কিন্তু তাই বলে মুসলমানের ছেলের সঙ্গেতো আর হিন্দুর মেয়ের গাঁটছড়া বাঁধা যায় না। এই কথাই তারা বলছে!

জনার্দন॥ লালমিঞা কলোনীতে নেই?

হারাণ॥ আশ্চর্য যে, সে কথা ইব্রাহিম সর্দার তোমার কাছে চেপে গেছে। না চাপলে তুমিও একথা এতক্ষণ জানতে। কিন্তু একী! স্বয়ং মালিক আসছেন এখানে।

(দু'জনে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দীনবন্ধু, লোহারাম আরও কয়েকজন আসিয়া উপস্থিত।

জনার্দন ও হারাণ তাঁহাদিগকে নীরব অভ্যর্থনা জানাইল)

হারাণ॥ কেউ নেইও এখানে। খানকয়েক চেয়ার—আচ্ছা, আমি—

দীনবন্ধু॥ না না, ও সব থাক্। জনার্দন, তোমার মেয়ে নাকি চুরি হয়েছে?

(জনার্দন নীরব রহিল)

দীনবন্ধু॥ আমি আজ এসেছিলাম পালাগান শুনতে, ওরা সব এতো করে বলেছিল। এসেই শুনি পালা-টালা সব বন্ধ। হিরোইন নেই, হিরোও নেই। পালাগান চুলোয় যাক্। কিন্তু আমাদের কলোনীতে এ সব কী কাণ্ড!

লোহারাম॥ বিবেচনা করুন, কী সাংঘাতিক ব্যাপার!

সুমঙ্গল॥ এই জন্যেই আমি কলোনীতে একটা ছোটখাটো মন্দির আর মস্‌জিদ তৈরী করার স্কীম্ দিয়েছিলাম স্যার। মানে,—ধর্মাধর্ম জ্ঞানটা এ যুগে একেবারে চলে গেছে।

নটবর॥ না স্যার, আমি নিবেদন করবো, ওই মন্দির-মস্‌জিদ নিয়ে মাতামাতি করলেই রক্তারক্তির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

হারাণ॥ মন্দির-মসজিদ না গ'ড়েই যা দাঁড়িয়েছে, সেও বড়ো কম ব্যাপার নয়। মেয়েছেলে নিয়ে টানাটানি এসব কী ব্যাপার মশাই?

দীনবন্ধু ॥ পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে ?

হারাণ ॥ না স্যার। ইব্রাহিম মিঞা সে পথ বন্ধ করে গেছে। সর্দারকে বুঝিয়েছে, ব্যাপারটা পুলিশে গেলে যে কেচ্ছা বেরুবে—ওর মেয়ের আর বিয়ে হবে না।

লোহারাম ॥ বিবেচনা করুন, ব্যাপারটা পুলিশে না দিলেই বুঝি সব কেচ্ছা চাপা পড়বে।

সুমঙ্গল ॥ শ্রমিক-মঙ্গলের দিক থেকে আমি বলছি, মালিকেরই এ ব্যাপারটা হাতে নেওয়া উচিত—এখনই।

নটবর ॥ নিশ্চয় স্যার। দেখছি তো মেয়েছেলের গায়ে হাত দিতেই riot বেধে গেছে। এ তো গায়ে-হাতের বাবা! একেবারেই লোপাট। riot যে এখনো বাধেনি, এই আশ্চর্য।

লোহারাম ॥ বিবেচনা করুন, সে হবে খুব সাংঘাতিক স্যার। ব্যাপারটা আপনি এখনই হাতে নিন্।

সুমঙ্গল ॥ শ্রমিক-কল্যাণের দিক থেকে আমি বলছি, বিষাক্ত অঙ্গটা এখনি ছেঁটে না ফেললে শ্রমিক-সমাজের গোটা দেহটাই বিষাক্ত হয়ে যাবে।

দীনবন্ধু ॥ কিন্তু আশ্চর্য, যার মেয়ে এ ব্যাপারে সে কোন কথা কইছে না। তবে কি বুঝবো এ ব্যাপারে তার কোন অভিযোগ নেই ?

জনার্দন ॥ প্রতিকার পাবো জানলে অভিযোগ আমার আছে বৈকি !

দীনবন্ধু ॥ প্রতিকার নেই মানে ? তুমি কি ভাবছো, এই দুর্নীতি আমি সইবো ? আমার ফ্যাক্টরী, আমার কলোনী—প্রতিকার করতে আমি বাধ্য এবং আমি তা করবো। ভেবেছিলাম, আগামীকাল আমাদের বোর্ডের সিদ্ধান্ত শ্রমিকদের জানানো হবে। কিন্তু দাস, এ যা ব্যাপার, তাতে আর আমি অপেক্ষা করতে পারছি না। শোনো জনার্দন, তোমাদের কোনো প্রস্তাবেই বোর্ড সম্মত হয়নি। বাড়তি কাজের জন্যে বাড়্তি মজুরী বোর্ড দেবে না। কাজেই ছাঁটাই অনিবার্য। কাদের ছাঁটাই করতে হবে, সেইটেই ছিল আমার সমস্যা! আমি—আমি বিষাক্ত অঙ্গটাই ছাঁটাই করবো।

হারাণ ॥ তবেই আমরা বাঁচি—তবেই আমরা বাঁচি।

দীনবন্ধু ॥ তোমরাই বাঁচবে না আমরা সবাই বাঁচবো। বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করবো। কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমি Home Ministerএর সঙ্গে দেখা করবো। স্পষ্ট বলবো, এই মেয়ে-চুরির বিহিত না হ'লে এখানে শান্তিভঙ্গ হ'তে বাধ্য।

জনার্দন ॥ হ্যাঁ, শান্তিভঙ্গ হ'তে বাধ্য। আমি আমার মেয়ে ফিরে চাই।

দীনবন্ধু ॥ মেয়েকে যখন চুরি করেছে, তখন তার জীবন সম্পর্কে আমি কোন আশংকা করি না। আশংকা শুধু বেইজ্জতের।

জনার্দন ॥ মৃত্যুর চেয়েও সেটা বেশী। ওই ইব্রাহিম,—তারই ছেলে—ওদের জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারতাম। কিন্তু এখন যদি ওদের আমি পাই, আমি ওদের প্রাণ নেবো।

দীনবন্ধু ॥ না না, কোনো Violence নয়।…দাঙ্গা হাঙ্গামা নয়। আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী। তিনি বলেছেন, হিংসার পথ—পথ নয়। অহিংসা পরম ধর্ম—এটা তোমরা ভুলো না। এসো দাস, ছাঁটাইয়ের অর্ডারটা এখনি বের করতে হবে। কিন্তু তার আগে—জনার্দন, আমি জানতে চাই, তোমাদের মঙ্গলের জন্যেই যদি বিষাক্ত অঙ্গ ছেঁটে ফেলে দিই, তোমরা কোনো আপত্তি করবে না—তোমরা ধর্মঘট করবে না।

জনার্দন ॥ না, করবো না। যাদের নিয়ে ধর্মঘট করতাম, তারা আজ আমাদের সঙ্গে অধর্ম করেছে। ধর্মঘট আমরা করবো না।

নটবর ॥ আমি জানি, আমি দেখেছি,—তেলে জলে কখনো মিশ খায় না।

॥ এসো দাস—

(দীনবন্ধু তাহার দলবল লইয়া চলিয়া গেলেন)

হারাণ ॥ লোকটা ঠিকই বলেছে। সব রকমই দেখেছে কিনা। আমরাও তো দেখলাম, এতো করেও মিশ খেলো না। নইলে ওই লালমিঞা—মুসলমানের ছেলে বলে তফাৎ ভাবিনি কোনদিন। সেই কিনা শেষে কালসাপ

হ'য়ে এমন করে ছোবল মারলে! তোমার সোণার ঘরে আগুন জ্বেলে দিলে সর্দার।

জনার্দন ॥ তা দিয়েছে—তা দিয়েছে।

হারাণ ॥ তবে আমরাই বা ছেড়ে দেব কেন? আমাদের ছেলেরা তো সব রুখে রয়েছে। কী কষ্টে যে আমি তাদের ঠেকিয়ে রেখে এসেছি, সে শুধু হরিই জানেন। আমি শুধু তোমাকে একবার বলতে এসেছি। আগুন জ্বালতে আমরাও জানি—আমরাও জানি।

জনার্দন ॥ না, না, শোনো, শোনো।

হারাণ ॥ কী আবার শুনবো? তোমার মেয়ে ওদের ঘরেই আছে। ইব্রাহিমের ঘরে না থাকে আর কারুর ঘরে আছে।

জনার্দন ॥ এদ্দূর সাহস হবে ওদের? এদ্দূর?

হারাণ ॥ তাইতো দেখছি। মেয়ে উধাও হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা' জান গেছে। সঙ্গে সঙ্গে যাকে বলে গরু খোঁজা খুঁজেছি! কোন হদিশ মেলেনি। খুঁজে দেখা হয়নি শুধু ওই ইব্রাহিমের বাড়ী, তল্লাসী হয়নি শুধু ওদের পাড়া। আবার বলছি, মেয়েটাকে ওদের ঘরেই গুম করে রেখেছে। ছোঁড়াটা দুদিন ভাল মানুষ সেজে লোক-দেখানো খোঁজাখুঁজি করেছে। আর ওই খোঁজাখুঁজির অছিলাতেই এখন গা-ঢাকা দিয়ে মেয়ের সঙ্গে গিয়ে জুটেছে।

জনার্দন ॥ আর ইব্রাহিম তা; জেনেও আমার কাছে গোপন করে গেল।

হারাণ ॥ এ ব্রতের এই নিয়ম সর্দার,—এ ব্যাপারে এই হয়ে থাকে।

(ইব্রাহিম ও-আকবরের প্রবেশ)

ইব্রাহিম ॥ লোহারাম ম্যানেজারের মুখে শুনলাম, আমরা নাকি ছাঁটাই, হয়েছি, আর তোমরা নাকি তবু কাজ করবে বলেছো?

জনার্দন ॥ কোনো কথার আগে আমি জানতে চাই, তোমার ছেলে কোথায়? লালমিঞা?

ইব্রাহিম ॥ লালমিঞার খোঁজ আমিও পাচ্ছি না।

জনার্দন ॥ লালমিঞা কোথায় তুমি জানো ?

হারাণ ॥ শুধু লালমিঞা কেন, মায়া কোথায় তা-ও তুমি জান।

ইব্রাহিম ॥ চোপরও কুত্তা।

আকবর ॥ (ইব্রাহিমকে) সর্দার হুকুম দাও,—আমি ওর জিভ টেনে ছিঁড়ে

জনার্দন ॥ খবরদার! চোরের মার বড় গলা!

ইব্রাহিম ॥ চোর!

জনার্দন ॥ হ্যাঁ, চোর। তোমরাই আমার মেয়ে চুরি করেছো। বেইমান্।

ইব্রাহিম ॥ চোর! বেইমান! আমরা!

আকবর ॥ ষ্ট্রাইকের হলফ নিয়ে তলে তলে আমাদের ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা করে বেইমানী করেছিস তোরা!

হারাণ ॥ বয়ে থাকি, বেশ করেছি।

ইব্রাহিম ॥ বেশ করেছো! জান্ কবুল, কী করে তোমরা কাজে যাও, আমরা দেখে নেবো।

(আকবরকে লইয়া ইব্রাহিম প্রস্থানোদ্যত)।

জনার্দন ॥ ইব্রাহিম—ইব্রাহিম—(ইব্রাহিম ফিরিল) আকবর, তুমি চলে যাও। হারাণ তুইও চলে যা।

(আকবর ও হারাণ পরস্পর ইঙ্গিত করিয়া চলিয়া গেল)

ইব্রাহিম, আমরা ভুল করছিনাতো ? নিজের অজান্তে অন্য কারুর হাতে পুতুল হয়ে নাচছিনা তো ?

ইব্রাহিম ॥ নাটবতো ভালই করো দেখা যায়। চোর-বেইমান বলে গাল দিয়ে এ আবার কী সুর ধরলে ?

জনার্দন ॥ কি করি, কি বলি—কিছুই ঠিক নেই। আমার মুখের কথা ধরিসনে ভাই। আমি ভাবছি, তোর আর আমার এতো দিনের এই যে—বলতে গেলে আত্মীয়তা—এ অমনি আজ একটা তুচ্ছ কারণে ভেঙে যাবে ?

ইব্রাহিম ॥ কেন যাবে? তুমি রাখলেই থাকবো। আর তুমি যদি পরের কথায় নাচো, তাহ'লে—তুমি জেনে রেখো—তোমার ওই হারাণ লোক সুবিধের নয়।

জনার্দন ॥ না, না, হারাণ—অবিশ্যি হারাণ যে লোক ভালো নয়, তা আমি জানি! কিন্তু এ ব্যাপারে আমিতে' তাঁর কোন দোষ দেখি না। বরং আমি বলছি, তোমার ওই অকবর—ও আকবরও খুব—

(ছুটিয়া আকবরের প্রবেশ)।

আকবর ॥ (ইব্রাহিমকে) সর্দার, তুমি এখনো এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছো? ওরা যে তোমার ঘরে আগুন দিলে।

ইব্রাহিম ॥ আগুন! আমার ঘরে আগুন! কে দিলে?

আকবর ॥ ওই ওরা—ওরা ॥ আগুন—আগুন—

(ছুটিয়া আকবরের প্রস্থান)।

ইব্রাহিম ॥ (জনার্দনের প্রতি) বাঃ—!

(ইব্রাহিমের প্রস্থান)।

জনার্দন ॥ আগুন—ইব্রাহিমের ঘরে—

(দৌড়াইয়া হারাণের প্রবেশ)।

হারাণ ॥ সর্দার, তুমি এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছো? ওরা যে সব আগুন দিয়ে দিলে!

জনার্দন ॥ ইব্রাহিমের ঘরে আগুন কে দিলে?

হারাণ ॥ ইব্রাহিমের ঘরে? ইব্রাহিম না—ইব্রাহিম না—ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথের ঘরে আগুন দিলে:

জনার্দন ॥ তবে যে আকবর বললে—

হারাণ ॥ আকবর বললে আর তুমি বিশ্বাস করলে সর্দার। আমি স্বচক্ষে

দেখে এলাম,—ইন্দ্রনাথের ঘরে আগুন দিলে আকবরের ভাই তাহের মিঞা ··· দাউ দাউ জ্বলছে আগুন···হায়, হায়, সর্দার সব পুড়ে গেল—ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সব সর্দার—সব সাফ হয়ে গেল। পাড়াকে পাড়া সব এতোক্ষণে সাফ হয়ে গেল।

জনার্দন ॥ সাফ হয়ে গেল—সাফ হয়ে গেল। তবে সাফই করে ফ্যাল্—সব—সব জঞ্জাল আজ সাফ করে ফ্যাল্।

হারাণ ॥ (সোল্লাসে) হঁ্যা, হঁ্যা এই তো আমি চাইছিলাম।

জনার্দন ॥ য়ঁ্যা ?

হারাণ ॥ ঐ তোমার হুকুমটাইতো চাইছিলাম। সব সাফ করে ফেলবো আজ। হিন্দু ভাই সব—

(হারাণের প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে একটি বোমা ফাটিল)

জনার্দন ॥ য়ঁ্যা ! এ আমি কি করলাম ! হারাণ—হারাণ—পার্বতী—

চতুর্থ দৃশ্য

কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত শ্রমিক কলোনীর মধ্যে পূর্বোক্ত গোলাঘর। নেপথ্য হইতে "মার-মার কাট-কাট" শব্দ, "আগুন—আগুন" চীৎকার, "গেলাম-গেলাম" আর্তনাদ ও মাঝে মাঝে বোমা ফাটার শব্দ শোনা যাইতেছে। জনার্দন দাঁড়াইয়া হুঁকা টানিতেছে ও উত্তেজিত হারাণ তাহার নিকট দাঙ্গার বর্ণনা দিতেছে।

হারাণ ॥ কেষ্টদাসের ছেলে নীলু—ওই অতোটুকু ছেলে,—দোকানে যাচ্ছিল। একা পেয়ে তাকে ছোরা মেরেছে। ছেলেটাকে ডাক্তারখানায় দিয়ে এলাম। দিয়ে এলাম বটে, কিন্তু এতোক্ষণে বোধ হয় হয়ে গেছে।

জনার্দন ॥ ওরা সব পারে—সব পারে।

হারাণ ॥ আমাদের ছেলের দল ক্ষেপে গিয়ে কসাইয়ের দোকানটায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দোকানটা বোধ হয় এতোক্ষণ শেষ। জোর লড়াই চলছে। ভয়ের কথা এই, আমাদের বোমাগুলোর চেয়ে ওসের বোমাগুলো ফাটছে বেশী জোরে আর আওয়াজও বেশী।

জনার্দন ॥ কিন্তু দলে ভারী আমরা। কতোক্ষণ দাঁড়াবে ?

হারাণ ॥ আজ তাহ'লে সর্দার আমরা কাজে যাবো না ?

জনার্দন ॥ না। ওরা ছাঁটাই হয়েছে। আমরা সব কাজে গেলে সেই ফাঁকে ওরা আমাদের ঘর লুঠ করবে,...মেয়ে-ছেলেগুলো যাবে।

হারাণ ॥ শুনলাম, চেয়ারম্যান সাহেব এই জন্যেই পুলিশে খবর পাঠিয়েছেন আজ সকালে-,—যাতে পুলিশ এসে ওদের শায়েস্তা করে, ফ্যাক্টরীর কাজ চলে।

জনার্দন ॥ চুলোয় যাক্ ফ্যাক্টরী। সব চেয়ে বড়ো কথা,—আমি আমার মেয়ে ফিরে চাই। আমার ইজ্জৎ গেছে হারাণ,—আমার ইজ্জৎ গেছে।

হারাণ ॥ পুলিশ এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ওদের ঘর খানা-তল্লাস হলেই আমাদের মেয়ে আমরা ফিরে পাবো। ওদের হাতে দড়ি পড়লেই আমাদের ফ্যাক্টরীর কাজ চলবে—লাঠিগুলো এমাসেই ডেলিভারী হ'বে—কোম্পানী বাঁচবে, আমরাও বাঁচবো।

জনার্দন ॥ ফ্যাক্টরীর কথা ভুলে যাও হারাণ। এখন ইজ্জতের কথা ভাবো। ওই শোনো গোলমাল বাড়চে।

হারাণ ॥ আমি যাচ্ছি। চেয়ারম্যান তোমাকে একটা কথা বলতে বলেছিলেন সর্দার। বলেছিলেন, ফ্যাক্টরীর কাজ বন্ধ করো না, যতো বেশী লাঠি যতো তাড়াতাড়ি তৈরী হবে, ততোই মঙ্গল! বলেছেন, কণ্ট্রাক্টের বাড়্‌তি লাঠি আমাদেরই হাতে তুলে দেবেন—দুষমন্‌দের শায়েস্তা করতে। আর তোমাকে গোপনে বলে যাচ্ছি সর্দার, অর্ডারটা পুলিশের। কাজেই পুলিশ আসবে, আর নিশ্চয়ই দেখবে যাতে ফ্যাক্টরীর কাজ চালু থাকে। মানে—ওরা গেছে।

(ছুটিয়া পার্বতীর প্রবেশ)

পার্বতী ॥ ওগো কী সর্বনাশ! ওরা মেথর পাড়ায় আগুন দিয়েছে।

জনার্দন ॥ কী! শেষে মেথরদের ওপর অত্যাচার? ওরাতো শুধু আমাদের নয়, ওদেরও। ইব্রাহিম এতো নীচে নেমে গেছে। হারাণ, আগুন লাগাও ইব্রাহিমের বাড়ী।

হারাণ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ! সর্দার, এই আমি চেয়েছিলাম—এই আমি চেয়েছিলাম।

(হারাণের প্রস্থান)

পার্বতী ॥ না, না, না, এ আমরা চাই না। আর আগুন জ্বালাতে চাই না। এ আগুনে সব যাবে,—ওদেরও, আমাদেরও। এ আগুন নিভিয়ে দাও সর্দার, এ আগুন নিভিয়ে দাও।

জনার্দন ॥ আমার মেয়ে যখন ফিরে পেলাম না, আর তা' হয় না। এ আগুন নিভবে না।

পার্বতী ॥ চাইনা আমার মেয়ে। আমার এক মেয়ের জন্যে আর দশজনের ছেলে মেয়ে মরবে, এ আমি চাই না।

জনার্দন ॥ তেরাত্রির মধ্যে তুমি তোমার মেয়ে ফিরে চেয়েছিলে—আমি তা হয়নি বলেই জ্বেলেছি এই আগুন। যাক—সব যাক্।

পার্বতী ॥ বুঝিনি—আমি তখন বুঝিনি। এখন বুঝছি,—মারামারিতে মারামারিটাই বেড়ে যায়। হারান ধন ঘরে আসে না। মাঝ থেকে ঘরের ধন হারিয়ে যায়।

(নেপথ্যে রাইফেলের শব্দ। মুহূর্তে নেপথ্যের সকল গোলমাল স্তব্ধ হইয়া যায়।)

জনার্দন ॥ বন্দুকের গুলি—তবে পুলিশ এসেছে।

(এমন সময়ে রুদ্ধশ্বাসে কনকের প্রবেশ)

কনক ॥ সর্দার, সর্দার, তোমার এখানে পুলিশ আসছে। আর একদল ওদিকে গুলি চালাচ্ছে। সামনে যাকে পাচ্ছে, তাকেই ধরছে। জ্যাঠাইমা, তুমি ঘরে যাও।

জনার্দন ॥ (উভয়কে লক্ষ্য করিয়া) আমাদের কলোনীতে যারা বাইরে আছে, ছুটে গিয়ে তাদের ঘরে যেতে বল। কখন কী হয় বলা যায় না।

(কনক ও পার্বতীর প্রস্থান। জনার্দন বসিয়া হুঁকা টানিতে লাগিল। এমন সময়ে জনৈক পুলিশ-ইন্‌স্‌পেক্টার, ইব্রাহিম ও কয়েকজন কনেষ্টবলসহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিল হিন্দু-মুসলমানের কতিপয় মাতব্বর। তাহাদের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া হারাণও আছে। ইহাদের আসিতে দেখিয়া জনার্দন হুঁকাটি রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল)

ইন্‌স্‌পেক্টর ॥ চারিদিকে দাঙ্গা হাঙ্গামা! মাঝখানে নির্বিকার হয়ে হুঁকো টানছেন—এ মহাত্মাটি কে?

ইব্রাহিম ॥ এই সেই জনার্দন সর্দার হুজুর—পালের গোদা।

ইন্‌স্‌পেক্টর ॥ থামো। (জনার্দনকে) তুমি জনার্দন সর্দার?

জনার্দন ॥ হ্যাঁ হুজুর।

ইন্‌স্‌পেক্টর ॥ তোমারই মেয়ে চুরি গেছে?

জনার্দন ॥ হ্যাঁ হুজুর (ইব্রাহিমকে দেখাইয়া) ওই ইব্রাহিমের ছেলে—লালমিঞা চুরি করেছে। আর তাদের দুজনকেই লুকিয়ে রেখেছে ওই ইব্রাহিম। ওর বাড়ী খানতল্লাসী করুন হুজুর, এখনই বেরিয়ে পড়বে সব।

ইন্‌স্‌পেক্টর ॥ তোমাদের মালিকের অভিযোগ—মেয়ে চুরির জন্যেই এই দাঙ্গা। আমি এসে শুধু দাঙ্গা থামাইনি। ইব্রাহিমের এলাকা তন্ন তন্ন করে খানাতল্লাসী করেছি। কিন্তু কই, পেলামনাতো। তোমাদের মালিক মিষ্টার চৌধুরী সদল বলে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। মেয়ে ওদের কাছে নেই।

ইব্রাহিম ॥ নেই,—তাও আমার ছেলেকে ওই জনার্দন সর্দার ধরে আটকে রেখেছে। আজ তিনদিন আমি তাকে খুঁজে পাচ্ছি না হুজুর।

জনার্দন ॥ মিথ্যে কথা—ডাহা মিথ্যে কথা। হুজুর, আসুন, আমার ঘর-বাড়ী, আমার এলাকা খানাতল্লাসী করুন।

ইন্‌স্‌পেক্টর ॥ (হাসিয়া) ইব্রাহিম যতোটা চালাক, তুমি তার চেয়েও বেশী, এ তোমার চেহারা দেখেই বোঝা যায় সর্দার সাহেব। তোমরা কেউ কম নও; এতবড় দাঙ্গা হলো, হাতে নাতে কাউকেই ধরা গেল না। অনর্থক খানাতল্লাসী করে আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করে লাভ নেই। ওর ঘরে তোমার ছেলেও যে পাওয়া যাবে না সে আমি ভালই জানি। কিন্তু তোমাদের দুজনকেই একটা কথা বলবো,—মন দিয়ে শোনো।

কয়েকজন ॥ বলুন স্যার, বলুন।

ইন্‌স্‌পেক্টর ॥ ব্যাপারটা যা শুনলাম, তাতে দেখছি—ওই "মহুয়া" পালাগানটাই সত্য আর সব মিথ্যে।

কয়েকজন ॥ সে কী স্যার?

ইন্‌স্‌পেক্টর ॥ মানে,—বিয়েতে বাধা ছিল দেখে, মহুয়া আর নদেরচাঁদ পালিয়ে গিয়েছিল জঙ্গলে। এ যুগের জঙ্গল হচ্ছে কলকাতা। খোঁজ করো তাদের সেখানে—কোনো হোটেলে। তোমরা না, আমরা করবো এবং এও জানি, যখন তাদের ধরবো, তখন দেখবো, তারা গলাগলি ধরে সিনেমার গান গাইছে, আর তোমরা কিনা এখানে এ ওর গলা কাটবার জন্যে ছুরি শাণ দিচ্ছো। পুলিশের চাকরী করে চুল পাকিয়েছি। আমার কথাটা মিথ্যে নয়। ঝগড়াঝাঁটি ছেড়ে দাও। ফের ঝগড়াঝাঁটি করছো খবর পেয়েছি কি তোমরা গেছো। লাঠিপেটা করবো সব।

ইব্রাহিম ॥ জানি হুজুর। সে লাঠি ওরাই তৈরী করে দিচ্ছে।

ইন্‌স্‌পেক্টর ॥ সে জন্যে তোমার আফশোষ করার কিছু নেই। যদি দরকার হয়, সে লাঠি ওদের পিঠেও পড়বে।

(জনার্দন ও হারাণ ব্যতীত সকলে চলিয়া গেলেন।)

হারাণ ॥ সর্দার বুঝছো না—ডানহাত বাঁহাতের ব্যাপার হয়ে গেছে। নাঃ, ওই দুষমণটাকে কিছুতেই শায়েস্তা করা যাচ্ছে না। তোমার হুকুম পেয়ে মরিয়া হয়ে আমরা দল বল নিয়ে যখন ইব্রাহিমের ঘরে আগুন ধরাতে যাবো, ঠিক সেই সময় পুলিশ এসে গেল—পালাতে পথ পাইনা সর্দার। (এমন সময় পুলিশভ্যান চলিয়া যাওয়ার শব্দ শোনা গেল) কিন্তু এই তো পুলিশ চলে গেল, এখন ওদের কে বাঁচায় দেখি?

জনার্দন ॥ না, না, দাঁড়াও। শোনো।

হারাণ ॥ কী বলবে বল।

জনার্দন ॥ আচ্ছা, পুলিশ সাহেব যা বলে গেল,—মানে, মায়া আর লাল মিঞা আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে কলকাতায় চলে গেছে—তোমার কী মনে হয়, এ সত্যি?

হারাণ ॥ তা' হতে পারে। কিন্তু মায়া ইচ্ছা করে গেছে, এ কখনও সত্যি নয়। মায়াকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে লালমিঞা। দস্তুরমতো নারীহরণ সর্দার, দস্তুরমতো নারীহরণ।

(কনকের প্রবেশ)

কনক ॥ হারাণখুড়ো, তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। পুলিশ যেতে না যেতেই তোমার ঘরে ওরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে—খোলা জানালা দিয়ে পেট্রোল ছড়িয়ে।

হারাণ ॥ বলিস্ কী কনক! সর্বনাশ!!

(হারাণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল)

কনক ॥ সর্দার, তৈরী হও। আজ এস্পার কি ওস্পার—

(কনকও ছুটিয়া চলিয়া গেল। নেপথ্যে পুনরায় আগের ন্যায় কোলাহল-ধ্বনি উঠিল)

জনার্দন ॥ সত্যিই আজ এস্পার কি ওস্পার। (পার্বতীর উদ্দেশ্যে) পার্বতী—পার্বতী—আমি চল্লাম—

(জনার্দন উত্তেজিতভাবে চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে বিপরীত দিক হইতে ছুটিয়া আসিল লালমিঞা। ব্যাকুলকণ্ঠে সে ডাকিল)।

লালমিঞা ॥ সর্দার! সর্দার !!

(জনার্দন ঘুরিয়া লালমিঞাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে সেখানে পার্বতীও আসিয়া দাঁড়াইল)

লালমিঞা ॥ জ্যাঠাইমা!

জনার্দন ॥ মায়া কোথায়?

পার্বতী ॥ বল, আমার মেয়ে কোথায়?

লালমিঞা ॥ তার খোঁজেই গিয়েছিলাম—মেদিনীপুরে নন্দীগ্রামে।

জনার্দন ॥ (রুদ্রমূর্তিতে লালমিঞার হস্ত চাপিয়া ধরিয়া) কোথায় সে?

লালমিঞা ॥ সেখানেও যায়নি সে।

জনার্দন ॥ কেন সে যাবে সেখানে? সে আছে সেখানে—যেখানে তুমি তাকে ধরে নিয়ে গেছো। যদি বাঁচতে চাও, সত্য বল কোথায় সে?

লালমিঞা ॥ জীবন বিপন্ন করে তোমার কাছে মিথ্য কথা বলতে আসিনি জ্যাঠামশাই। যখন কোথায় তাকে খুঁজে পেলাম না আমারা, তখন আমার মনে হলো, জ্যাঠাইমার বকুনী খেয়ে অভিমান করে মায়া একবার পালিয়ে গিয়েছিল তারই মাসীর বাড়ী মেদিনীপুরে ওই নন্দীগ্রামে। যায়নি জ্যাঠাইমা?

পার্বতী ॥ গিয়েছিল। তোমাকে আর পল্টুকে আমি পাঠিয়েছিলাম তাকে নিয়ে আসতে।

লালমিঞা ॥ তাই এবারও মনে হলো, হয়তো কারুর ওপর কোন অভিমানে এবারও সে পালিয়েছে সেখানে।

জনার্দন ॥ মিথ্যা কথা। আমরা তাকে বকিনি।

পার্বতী ॥ না। আমি বকেছিলাম। ওর এখন বয়েস হয়েছে। তোমার সঙ্গে ওর এতো বেশী মেলামেশা, পাঁচজনে পাঁচকথা বলে। পালাগানের আগের দিন আমি ওকে বকেছিলাম।

জনার্দন ॥ তুমি কোনো অন্যায় করোনি। (লালমিঞাকে) তোমার নন্দীগ্রামে যাওয়ার কারণ না ছিল তা নয়। কিন্তু তুমি সেখানে গেছো, এ আমি বিশ্বাস করি না।

লালমিঞা ॥ শুনুন জ্যাঠামশাই, আমি জানি আপনাদের সকল ক্রোধ আজ আমার ওপর। ফিরে এসে দেখি আমারি জন্য কলোনীতে দাঙ্গা লেগেছে। শুনলাম মায়াকে নিয়ে আমি পালিয়েছি সন্দেহে শ্রমিকদের একতা গেছে ভেঙে— একদল হয়েছে ছাঁটাই, তবু আর একদল যাচ্ছে কাজে। ভাইএ ভাইএ সুরু হয়েছে দাঙ্গা। জীবন যাচ্ছে—ঘরবাড়ী পুড়ছে। আমার মাথা চাইছেন আপনারা—জেনে শুনেও আমি এসেছি—মিথ্যা বলতে নয়।

পার্বতী ॥ আমি বিশ্বাস করছি বাবা, আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি। তুমি শুধু একটিবার বলো,—মায়াকে যে আমরা পাচ্ছি না, তাতে তোমার কোন হাত নেই।

লালমিঞা ॥ শুধু ওই কথাটুকু—ওই কথাটুকু বলতেই আমি এসেছি জ্যাঠাইমা-জ্যাঠামশাই। যদি বিশ্বাস করো, আবার আমি বেরুবো মায়াকে খুঁজতে। এজন্য পৃথিবীর ওপারে—জীবনের ওপারেও যদি যেতে হয়, তাও যাবো। আর যদি বিশ্বাস না করো, আমি এখানে আছি, আমি এখানে থাকবো—থাকবো তোমাদের সামনে—জীবিত অথবা মৃত, শুধু এই আশায় যে, একদিন তোমরা বলতে বাধ্য হবে যে আমি মিথ্যা বলিনি।

(ক্ষণিক নিস্তব্ধতা)

লালমিঞা ॥ জ্যাঠামশাই!—আমি যাবো, না থাকবো?

জনার্দন ॥ থাকবে।

লালমিঞা ॥ আমাকে তবে তুমি বিশ্বাস করলে না জ্যাঠামশাই!

জনার্দন ॥ তোমাকে আমি বিশ্বাস করছি, লাল। কিন্তু আমার দলবলকে আমার বিশ্বাস নেই। (পার্বতীর প্রতি) পার্বতী, ওর চোখ-মুখ দেখে তুমি বুঝছো না, না খেয়ে আছে।

পার্বতী ॥ এসো বাবা এসো—(লালমিঞা যায় না, পার্বতী কাছে আসিয়া সস্নেহে বলে) আয় বাবা লাল।

লালমিঞা ॥ তুমি আমাকে শুধু এক গ্লাস জল দাও।

(নেপথ্যে কনকের উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল—"সর্দার! সর্দার!!" পরক্ষণেই সে ছুটিয়া আসিয়া লালমিঞাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।)

কনক ॥ লাল! তুমি!

লালমিঞা ॥ বলছি।

কনক ॥ কী আর বলবে! বাঘের গুহায় এসেও যখন তুমি বেঁচে আছো, তাতেই সব বলা হয়েছে। (জনার্দনের প্রতি) এইবার আমি যা বলতে এসেছি, শোনো। লালমিঞা তোমার এখানে—ওরা কী করে জানতে পেরেছে। তোমার হাত থেকে ওকে উদ্ধারের জন্যে ইব্রাহিম সর্দার দলবল নিয়ে মরিয়া হয়ে ছুটে আসছে। পথের দুধারের ব্যারাকে পেট্রোল ছড়িয়ে আগুন লাগাচ্ছে। দেখে এলাম, হারাণ খুড়োর বাড়ী দাউ দাউ জ্বলছে।

পার্বতী ॥ হারাণের বাড়ী! দাউ দাউ জ্বলছে!!

জনার্দন ॥ জ্বলুক। হারাণ একা থাকতো; সে নিশ্চয়ই এতোক্ষণ সরে পড়েছে। আগুনের ভয় আমাকে দেখিয়ে লাভ নেই। আমার মেয়েকে না পেলে আমি যে আগুন জ্বালাবো, ইব্রাহিম তা সইতে পারবে না। সে আগুন—ওই লালমিঞা।

(ইব্রাহিমের প্রবেশ। সে একা···হাতেও কোনো অস্ত্র নাই।)

ইব্রাহিম ॥ সর্দার! না, না, চমকাবার কিছু নেই। আমি এসেছি একা—কোন হাতিয়ার নিয়েও আসিনি আমি।

জনার্দন ॥ শয়তানীটা তোমার কোথায়, ঠিক ধরতে পারছি না, ইব্রাহিম।

ইব্রাহিম ॥ আমি আমার ছেলে চাই।

জনার্দন ॥ আমি আমার মেয়ে এখনও ফিরে পাইনি, ইব্রাহিম। শুধু তাই [illegible] ডান হাত হারাণ—তার বাড়ীতে তুমি আগুন দিয়েছো।

ইব্রাহিম ॥ তোমার ডান হাত! য্যাদ্দিন আমি ছিলাম সর্দার। যাক্

সে কথা। আজ তোমার ডান হাত হারাণ—তার বাড়ী আমি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছি···তার বাড়ী আমি লুঠ করে এসেছি। লুঠ করে সেখানে যে ধন পেয়েছি, আমি তা' তোমাকে দিচ্ছি। বিনিময়ে তুমি আমাকে আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও।

জনার্দন ॥ হাসালে ইব্রাহিম।

ইব্রাহিম ॥ হাসো। আমার হাসার সময়ও আসছে। হ্যাঁ ওই এসেছে।

[কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান আগুনে ঝল্‌সানো মায়াকে কোলপাঁজা করিয়া এখানে আনিয়া গোলঘরের বেদীর উপর রাখিল]

জনার্দন ॥ একী !

পার্বতী ॥ মায়া ! তুই !

[পার্বতী ছুটিয়া মায়ার কাছে গেল। লালমিঞাও]

মায়া ॥ মা, একটু জল। আমায় একটু জল দাও মা।

কনক ॥ আনছি—আমি আনছি।

[কনক জল আনিতে ছুটিয়া গেল]

পার্বতী॥ (জনার্দনের প্রতি) ওগো, দ্যাখো এসে। আমার মেয়ের সারা শরীর আগুনে ঝলসে গেছে। (মায়ার প্রতি) এ দশা তোর কে করলো মা ?

[জনার্দন রুদ্রমূর্তিতে চকিতে ইব্রাহিমের নিকট ছুটিয়া গিয়া বজ্রমুষ্টিতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—]

জনার্দন ॥ তুমি।

[লালমিঞা মায়ার নিকট হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার পিতার দিকে রোষকষায়িত নেত্রে তাকাইল]

লালমিঞা ॥ তুমি ?

মায়া ॥ (মরিয়া হইয়া চীৎকার করিয়া) না, না, ও নয়। ওর দলেরও কেউ নয়।

জনার্দন ॥ (ইব্রাহিমের হাত ছাড়িয়া দিয়া) কে ? তবে কে ?

[কনক জল লইয়া আসিয়া মায়াকে জল পান করিতে দিল]

মায়া ॥ বলছি।

[মায়া জল পান করিতে লাগিল। নিস্তব্ধতা]

মায়া ॥ আরো দাও—আরো—

(কনক পুনরায় জল দিল। মায়া তাহা পান করিতে লাগিল। সকলে চঞ্চল কিন্তু নিস্তব্ধ।)

মায়া ॥ জ্বলে গেল! আমার গোটা শরীর জ্বলে গেল!

জনার্দন ॥ তুই আমায় বল, কার জন্যে তোর এই দশা।

মায়া ॥ হারাণ—হারাণ—তোমাদেরই হারাণ।

জনার্দন ॥ হারাণ! কী বলছিস্ তুই মায়া,—হারাণ।

মায়া ॥ হারাণ—শয়তান—কিন্তু আমি আর পারছি না—! মা! আমায় বাঁচাও—আমায় বাঁচাও।

কনক ॥ লাল, তুমি আর জ্যাঠাইমা ওকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে যাও। আমি ডাক্তার নিয়ে আসছি।

(কনক ছুটিয়া চলিয়া গেল। পার্বতীর সাহায্যে লালমিঞা মায়াকে কোলপাঁজা করিয়া তুলিয়া লইয়া ঘরের দিকে চলিয়া গেল। সঙ্গে গেল পার্বতী। সকলের দৃষ্টি যখন সেদিকে নিবদ্ধ, সেই সময়ে দেখা গেল, হারাণকে ধরিয়া লইয়া কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, ইব্রাহিম তাহা দেখিল।)

জনার্দন ॥ (গম্যমানা মায়ার উদ্দেশ্যে চীৎকার করিয়া) হারাণ! হারাণের জন্যে তোর এই দশা! কিন্তু কী করে তা' সম্ভব হয়?

ইব্রাহিম ॥ কী করে তা' হলো, সেটা হারাণ নিজেই বলুক।

[হারাণের সম্মুখে গিয়া ইব্রাহিম দাঁড়াইল। তাহার পার্শ্বস্থ এক যুবকের কটিদেশে রক্ষিত একটি ছোরা চট করিয়া তুলিয়া লইয়া তাহা নাচাইতে নাচাইতে ইব্রাহিম বলিল,—]

ইব্রাহিম ॥ তোমার বাড়ী যখন আমরা আক্রমণ করি, তুমি ঘরের ভেতর ছুটে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দাও। কিন্তু ঘরে তখন আগুন

ধরেছে। আগুনের তাপ সইতে না পেরে বাধ্য হয়ে তুমি দরজা খুলে দাও। আমরা লুঠের জন্যে তোমার ঘরে ঢুকে দেখি, তুমি একা নও, হাত-পা-মুখ বাঁধা একটি মেয়ে—মেঝেতে পড়ে আগুনের তাপে ছট্‌ফট্‌ করছে। মুখের বাঁধন খুলে দিতেই দেখি, সে আমাদের মায়া। তোমার সর্দার জানতে চাইছেন, কী করে তা' সম্ভব হয়। বলো।

হারাণ ॥ তুমি ওই ছুরিটা অমন করে আমার চোখের সামনে নাচিও না। ওটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দাও। আর এক গেলাস জল আমাকেও খেতে দাও—আমি সব বলছি—সব বলবো।

ইব্রাহিম ॥ দাও—এক গ্লাস জল দাও।

[একজন ছুটিয়া গিয়া জল আনিয়া দিল। হারাণ তাহা পান করিল।]

ইব্রাহিম ॥ (ছুরিটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া) বলো। হাত বাঁধা, পা বাঁধা, মুখ বাঁধা মায়া—তোমার ঘরে! কী করে তা' সম্ভব হয়?

হারাণ ॥ টাকায় সবই সম্ভব হয়। আমি টাকা খেয়েছিলাম।

ইব্রাহিম ॥ কার টাকা?

হারাণ ॥ দুনিয়ার বন্ধু দীনবন্ধু চৌধুরীর।

ইব্রাহিম ॥ আশ্চর্য হচ্ছি না। কিন্তু মতলবটা জানতে চাই। মায়াকে সে চেয়েছিল?

হারাণ ॥ না।

ইব্রাহিম ॥ তবে?

হারাণ ॥ কেন, জানো না? একগোছা কঞ্চি—অতো বড়ো জোয়ান তুমি,—একসঙ্গে ভাঙতে পারো? পারো না। গোছাটা দু'ভাগ করে ফ্যালো। আমার মতো কমজোরী মানুষও তা' টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে। ওঁরা বুঝে ছিলেন, তোমাদের ষ্ট্রাইক বন্ধ করতে আর কোন পথ ছিল না। ছিল এই একটি মাত্র পথ। মায়াকে সরিয়ে ফেলে দুই দলে একটা দাঙ্গা বাধানো। তাই আমাদের কয়েকজনকে টাকা খাইয়ে হাত করে—মায়ের কলিক হয়েছে বলে

মেয়েকে থিয়েটার থেকে বাড়ী পাঠিয়ে দেন নিজের মোটরে, যে মোটরে রুমালে ক্লোরোফর্ম মাখিয়ে লুকিয়ে বসেছিলাম আমি।

[এমন সময়ে দূরে ফ্যাক্টরীর ভোঁ বাজিয়া উঠিল]

ইব্রাহিম॥ (জনার্দনকে) সর্দার! কারখানার ভোঁ বাজছে। তোমাদের কাজে যাবার সময় হলো।

[জনার্দন ধীরে ধীরে ইব্রাহিমের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং হঠাৎ তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—]

জনার্দন॥ ইব্রাহিম! ভাই আমার! আমাকে ক্ষমা কর্। চল্—আমরা গিয়ে বলি, দুনিয়ায় শুধু দুটো জাত—হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খৃষ্টান্ নয়, বৌদ্ধ নয়—দুনিয়ায় শুধু দুটো জাত—ধনিক আর শ্রমিক। আমরা সেই শ্রমিক। এ দু'জাতই পাশাপাশি সুখে শান্তিতে বেশ বেঁচে থাকতে পারে,—যদি অন্যায় না হয়,—যদি জুলুম না হয়। বাড়তি কাজের জন্যে মজুরী চাই। না পেলে কাজে আমরা যাবো না।

ইব্রাহিম॥ তুমি আমাদের সর্দার,—যা বলতে হয়, গিয়ে তুমি বল। আমি চললাম—মায়াকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু তারও আগে আর একটা কাজ আছে। (হারাণের উদ্দেশ্যে) তুই দালাল,—তুই কুত্তা—তোর গায়ে হাত দোব না—তোকে ছোঁব না। তোর মুখে থুতু দোব।

[ইব্রাহিম হারাণের মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিল।]

॥ যবনিকা ॥

ধর্মঘট

'বহুরূপী' সম্প্রদায় কর্তৃক প্রথম অভিনয় রজনী

রঙমহল থিয়েটার ঃ কলিকাতা

৯ই ডিসেম্বর ঃ ১৯৫৩

ভূমিকালিপি

দীনবন্ধু চৌধুরী	...	৺মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
লোহারাম দাস	...	শ্রীপুলিন বসু
ইব্রাহিম	...	মহঃ জ্যাকেরিয়া
সুমঙ্গল সেন	...	শ্রীঅশোক মজুমদার
লালমিঞা	...	শ্রীশোভেন মজুমদার
হারাণ	...	শ্রীঅমর গঙ্গোপাধ্যায়
জনার্দন	...	শ্রীগঙ্গাপদ বসু
আকবর	...	শ্রীবেণীমাধব মুখোপাধ্যায়
নটবর	...	শ্রীশম্ভু মিত্র
মায়া	...	শ্রীতৃপ্তি মিত্র
লষ্ঠন	...	শ্রীকুমার রায়
পার্বতী	...	শ্রীআরতি মৈত্র
আবদুল	...	শ্রীপরেশ ঘোষ
ইন্সপেক্টর	...	শ্রীনির্মল চট্টোপাধ্যায়
কনক	...	শ্রীদীপক মিত্র

ধর্মঘট নাটকে মহুয়া পালা নাটিকা

কথক	...	শ্রীকুমার রায়
নদেরচাঁদ	...	শ্রীশোভেন মজুমদার
মহুয়া	...	শ্রীতৃপ্তি মিত্র
হুমড়া	...	শ্রীনির্মল চট্টোপাধ্যায়
সুজন	...	শ্রীদীপক মিত্র

পরিচালনা	...	শ্রীশম্ভু মিত্র
সঙ্গীত	...	শ্রীখালেদ চৌধুরী
আলোক সম্পাত	...	শ্রীতাপস সেন

মন্মথ রায়

পথে বিপথে

রচনা-কাল :

১২-৮-৫২ হইতে ১৭-৮-৫২

প্রথম-প্রকাশ :

প্রবাসী

(মাসিক পত্র)

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়

১৩৬০

পথে বিপথে

অগ্রজপ্রতিম

নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

শ্রীকরকমলেষু

প্রীতিধন্য

মন্মথ রায়

মহালয়া :

১৩৬৩

২২৭সি, বিবেকানন্দ রোড

কলিকাতা-৬

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে 'স্বাগতা রেস্তোরাঁ'। রেস্তোরাঁটি মাঝারি ধরণের। দৃশ্যের এক পার্শ্বে প্রবেশদ্বার, মধ্যস্থলে ম্যানেজারের কাউণ্টার এবং অপর পার্শ্বে কেবিন অবস্থিত। লোকজন আসিতেছে, খাইতেছে, যাইতেছে। প্রবেশপথে পরিচারক লোকজনদের সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত কেবিনে লইয়া যাইতেছে। খাওয়া শেষ হইলে কেহ কেহ কাউণ্টারে আসিয়া ম্যানেজারের নিকট নিজেই বিলের টাকা দিয়া যাইতেছে। রেস্তোরাঁ-বিলাসীরা সাময়িক ঘটনা সম্পর্কে নানা প্রকার মন্তব্য করিতেছে। কখনও উত্তেজনাপূর্ণ, কখনও বা মুখরোচক রহস্যালাপে কাউণ্টারের সম্মুখবর্তী গমনাগমনের পথটি মুখরিত।

হেড বয় ॥ (ম্যানেজারকে) সাত নম্বর খিল চাইছে। চা দুটো, টোষ্ট চারটে।

[ম্যানেজার বিল করিয়া হেড বয়ের হাতে দিল।]

ম্যানেজার ॥ এক ঘণ্টা বসে দু'জনে মাত্র ন' আনা! কলেজের ছোকরা তো?

হেড বয় ॥ হ্যাঁ, মোহনবাগান আর ইষ্টবেঙ্গল···চায়ের টেবিলেই এক রাউণ্ড হয়ে গেল।

[হেড বয় বিল লইয়া চলিয়া গেল। দুই জন খদ্দেরের প্রবেশ।]

বয় ॥ আসুন স্যার, আসুন।

প্রথম ব্যক্তি ॥ কেবিন খালি আছে?

ম্যানেজার ॥ তিন নম্বরে নিয়ে যাও।

প্রথম ব্যক্তি ॥ (বয়ের সহিত যাইতে যাইতে দ্বিতীয় খদ্দেরের প্রতি) ওদিকে কোরিয়া এদিকে কাশ্মীর—বাজারের অবস্থা হয়েছে 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা?'

দ্বিতীয় ব্যক্তি ॥ আমি বলছিলাম কি—লোহাটাই ভাল করে ধরা যাক।

[উভয়ে ভিতরে চলিয়া গেল। হেড বয় আসিয়া দাঁড়াইল।]

ম্যানেজার ॥ (হেড বয়কে) শেয়ার মার্কেট। একটু ভাল করে দেখাশোনা করো।

হেড বয় ॥ যাচ্ছি। তা আজকাল শেয়ার মার্কেটেও ঐ দু-কাপ চা। বড় জোর দুটো ডেভিল।

[হেড বয় চলিয়া গেল। কলেজের ছেলে দুটি ভোজন শেষে চলিয়া যাইতেছে।]

প্রথম ছাত্র ॥ তবু বললাম, দেখে নিও—ঐ ইষ্টবেঙ্গল ওস্তাদের মার মারবে শেষ রাত্রে।

দ্বিতীয় ছাত্র ॥ রাখ রাখ। মোহনবাগানের দিনরাত সমান। চালাকি চলবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।]

ম্যানেজার ॥ বেঁচে থাক বাবা ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগান। তবু চায়ের দোকানগুলো বাঁচিয়ে রেখেছ।

[হেড বয় আসিয়া দাঁড়াইল।]

হেড বয় ॥ খদ্দের বটে তেরো নম্বর।

ম্যানেজার ॥ কেন? কি হ'ল?

হেড বয় ॥ গোগ্রাসে গিলছে মশাই।

ম্যানেজার ॥ তেরো নম্বর—(খাতা দেখিয়া) রাইস-কারি এক প্লেট, ফাউল কাটলেট দুটো, চিকেন রোষ্ট একটা। সাড়ে সাত টাকা হয়েছে।

হেড বয় ॥ না, না,—বিল চাইছে না—খেতে চাইছে আরও। মোগলাই কারি আর পুডিং।

ম্যানেজার ॥ দাও—দাও। বেঁচে থাক বাবা চোরাবাজার।

হেড বয় ॥ আট নম্বর বিল চাইছে।

ম্যানেজার ॥ দুটো কাটলেট—দুটো চপ—দুটো চা। দু' টাকা এগার আনা।

[ম্যানেজার বিল লিখিয়া দিল। হেড বয় চলিয়া গেল। দুই জন যুবক বাহির হইয়া আসিল।]

প্রথম যুবক ॥ আরে, দশ আনা পয়সা উসুল হয়ে গেল—নিম্মির ঐ একখানা নাচেই। বাকি তো সব ফাও।

দ্বিতীয় যুবক ॥ যা-যা—সুরাইয়ার কাছে নিম্মি। সেদিন টিকিট কিনতে গিয়ে এই ছাখ্... (হাতের ব্যাণ্ডেজ দেখাইল।)

প্রথম যুবক ॥ হ্যাঁ, ঐ হাতের একটা ফটো তুলে সুরাইয়াকে পাঠিয়ে দে।

[উভয়ে চলিয়া গেল।]

ম্যানেজার। বেঁচে থাকো বাবা সুরাইয়া—বেঁচে থাকো বাবা নিম্মি—তোমাদের দৌলতেই তবু চপ কাটলেটগুলো কাটছে।

[হেড বয় আসিয়া দাঁড়াইল।]

ম্যানেজার ॥ ওহে এখন থেকে বলবে সুরাইয়া চপ—নিম্মি কাটলেট। কাটবে ভাল।

[এমন সময় দুইজন খদ্দের ভিতরে ঢুকিল]

প্রথম খদ্দের ॥ মশাই আপনার এখানে আজকের 'আনন্দবাজার' আছে?

ম্যানেজার ॥ কেবিনে বসুন। পাঠিয়ে দিচ্ছি। খেতে খেতে দেখবেন এখন।

প্রথম খদ্দের ॥ না, না, মশাই, আগে দিন। (কাগজটি টানিয়া লইয়া) থার্ড পেজ—এই যে। (পড়িতে লাগিল) 'গত রাত্রে পুলিস বেলেঘাটার একটি বাড়ীতে হানা দিয়া তেঁতুলবীচির একটি কারখানা আবিষ্কার করিয়াছে। খোসা ছাড়াইয়া এই তেঁতুলবীচিগুলি, আটাতে ভেজাল দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হইত। এই ব্যাপারে সাত জন ধৃত হইয়াছে। কিন্তু মালিক এখনও ফেরার।'

ম্যানেজার ॥ ওরে বাবা—তেঁতুল-বীচিরও কারখানা!

প্রথম খদ্দের ॥ হ্যাঁ—কারখানা। (সঙ্গীকে দেখাইয়া) ইনি বিশ্বাস করছিলেন না।

দ্বিতীয় খদ্দের ॥ (বন্ধুকে) তা হলে ঐ আটা—তোমার আমার পেটে যাচ্ছে! (ম্যানেজারের প্রতি) তবে আর পেটের দোষ কি বলুন? ভাতে কাঁকর, আটায় তেঁতুলবীচি, তেলে শেয়ালকাঁটা—বদহজম লেগেই আছে। (বন্ধুকে) না ভাই, আমি কিছু খাব না।

প্রথম খদ্দের ॥ সে কি হে?

দ্বিতীয় খদ্দের ॥ না ভাই, বাড়ীর খাবারই পেটে সইছে না। রেস্তোরাঁর খাবারে হবে কলেরা। চলো, চলো।

প্রথম খদ্দের ॥ আরে এক পেয়ালা চা!

দ্বিতীয় খদ্দের ॥ রেস্তোরাঁর চা তো বিষ। চলো—চলো—বাড়ী চলো খাওয়াচ্ছি।

[কাগজটি রাখিয়া দুই জনে চলিয়া গেল।]

ম্যানেজার ॥ খবরের কাগজ রাখাও দেখছি দায় হয়ে দাঁড়াল। যত সব ভ্যাগাবণ্ড···

[এর পর হেড বয়ের পশ্চাতে তেরো নম্বর কেবিনের খদ্দের আসিয়া কাউণ্টারের সামনে দাঁড়াইল। রুক্ষ কেশ—খোঁচা খোঁচা দাড়ি—বয়স

বছর তিরিশ—একটি রেনকোটে সর্বাঙ্গ আবৃত। সুদর্শন চেহারা, কিন্তু ক্লেশ ও দৈন্যের ছাপে তাহাকে মলিন দেখাইতেছে।]

হেড বয় ॥ তেরো নম্বরের বিল…

ম্যানেজার ॥ (খদ্দেরের দিকে তাকাইয়া) আসুন, আসুন। (হেড বয়কে) পরে হ'ল গিয়ে মোগলাই কারি আর পুডিং আড়াই টাকা আর আট আনা—তিন টাকা। আগের ছিল রাইস-কারি এক প্লেট, ফাউল কাটলেট দুটো, চিকেন রোষ্ট একটা—সাড়ে সাত টাকা—মোট সাড়ে দশ টকা।

[ম্যানেজার বিলটি হেড বয়ের হাতে দিল। হেড বয় বিলটি একটি প্লেটে রাখিয়া খদ্দেরের সামনে ধরিল।]

খদ্দের ॥ (বিলটি দেখিতে দেখিতে) পান আছে—পান।

ম্যানেজার ॥ পান—পান।

[একটি বয় পান আনিতে ছুটিল।]

খদ্দের ॥ আর এক প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক।

ম্যানেজার ॥ (বয়ের প্রতি) এক প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক।

[বয় বাহিরে ছুটিল।]

[খদ্দেরকে লক্ষ্য করিয়া] খাবার-টাবারগুলো ভাল লেগেছিল তো স্যার?

খদ্দের ॥ দু'দিন পর আজ খেলাম। ক্ষিদের মুখে সবই অমৃত। তা মন্দ নয়—খাবার বেশ ভাল।

ম্যানেজার ॥ বাইরে থেকে আসছেন বুঝি?

খদ্দের ॥ কেন বলুন তো?

ম্যানেজার ॥ ঐ বর্ষাতিটা দেখে মনে হচ্ছে স্যার। এখানে বিষ্টিটিষ্টি নেই তো।

খদ্দের ॥ কাল রাত একটায় ঘুমিয়েছিলেন বোধ হয়—তাই টের পান নি—কলকাতায় কি বৃষ্টিটাই না হয়েছে। পথে দাঁড়িয়ে ভিজছিলাম। রিক্সা করে এক মাতাল এই রেনকোটটা গায়ে চাপিয়ে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিল—'হেসে

নাও দু'দিন বইতো নয়।' আমাকে ভিজতে দেখে মাতালটার মনে হ'ল কষ্ট। রিক্সা থামিয়ে গা থেকে বর্ষাতিটা খুলে আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে—গাইতে গাইতে চলে গেল—'হেসে নাও—দু'দিন বইতো নয়।' বন্ধুর দানটি ফেলতে পারছি না।

[বয় আসিয়া পান-সিগারেট দিল। খদ্দের পান মুখে দিয়া একটা সিগারেট ধরাইল।]

খদ্দের ॥ ও হ্যাঁ—আপনার বিল—পান-সিগারেটটা…

ম্যানেজার ॥ না, না,—থাক। পান-সিগারেটের জন্য কিছু দিতে হবে না স্যার। আপনি ঐ সাড়ে দশ টাকাই দিন।

খদ্দের ॥ কিন্তু দেখুন—আমার কাছে সাড়ে দশ পয়সাও নেই।

ম্যানেজার ॥ তার মানে?

খদ্দের ॥ তার মানে—নেই। সত্যিই নেই—এই দেখুন।

[প্রথমে বর্ষাতির পকেট দেখাইল—তারপর বোতাম খুলিয়া বর্ষাতিটা ফাঁক করিয়া ধরিয়া ভিতরের অবস্থা দেখাইল। খালি গা—পরনে একটি ছিন্ন মলিন কাপড়।]

ম্যানেজার ॥ তার মানে আপনি একটি জোচ্চোর?

খদ্দের ॥ তা আপনি বলতে পারেন। দয়া করে পুলিসে দিন।

ম্যানেজার ॥ (ভেংচি কাটিয়া) পুলিসে দিন।

হেড বয় ॥ কি সাংঘাতিক জোচ্চোর! পুলিসেই দিন স্যার।

[তখন আরও কয়েকটি বয় সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ম্যানেজার খেঁকাইয়া উঠিল।]

ম্যানেজার ॥ পুলিসে দিন। সাড়ে দশ টাকার জন্য পুলিসে দিয়ে সাড়ে দশ দিন কোর্টে ছুটি—আর উকিল-মোক্তারে সাড়ে দশ টাকা রোজ খরচ হোক। (বয়দের প্রতি) তোমরা আবার এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি? (খদ্দেরের প্রতি) যান মশাই—আপনিও যান। সকালবেলায় যত সব আপদ এসে ঘাড়ে চেপেছে।

খদ্দের ॥ ওয়াটার-প্রুফটি রেখে যাবো ?

ম্যানেজার ॥ না মশাই, না। চোরাই মাল গছিয়ে যাবেন তো ? তারপর আবার সেই থানা-পুলিসের ফ্যাসাদ। যান—যান—আচ্ছা খদ্দের জুটেছে—যান্।

খদ্দের ॥ কোথায় কোন্ চুলোয় যাব মশাই ? আমার কি আর চুলো আছে ? মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর এই কিম্ভূতকিমাকার পোশাক দেখে আপনি আমায় এখনও চিনতে পারেন নি—দেখছি। কিন্তু এক সময় কি ছিল না গোবর্ধন বাবু—যখন আপনার এখানে নগদ দাম দিয়ে অনেক সাড়ে দশ টাকার খাবারই খেয়েছি।

ম্যানেজার ॥ (খদ্দেরের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া) এঁ্যা ! চেনা চেনা মনে হচ্ছে বটে। (হঠাৎ) হঁ্যা—হঁ্যা আগে খুব আসতেন—যেতেন।

খদ্দের ॥ যাক্—চিনতে পেরেছেন দেখছি। দেখলাম কিনা—অনেকে চিনতে পেরেও মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে। আমার নাম ভানু চৌধুরী।

ম্যানেজার ॥ হঁ্যা—হঁ্যা ভানু চৌধুরী। কি একটা বড় মার্চেণ্ট আপিসে বড়বাবু ছিলেন না—আপনি ? তবিল তছরুপের দায়ে পড়েছিলেন—

ভানু ॥ দু'বছর জেল খেটে সম্প্রতি দায়মুক্ত হয়েছি। কিন্তু পেটের দায়ে বোধ হয় শীগ্‌গিরই আবার জেলে যেতে হবে। ভেবেছিলেম আপনার দয়াতেই সে সুযোগটি হবে।

ম্যানেজার ॥ আবার জেলে যাবেন কেন ? একটা চাকরি-বাকরি দেখে নিন না।

ভানু ॥ কে দিচ্ছে মশাই চাকরি-বাকরি ? এ ক'দিন কত দুয়ারেই ত মাথা খুঁড়লাম। আপনার এখানেই দিন না একটা চাকরি—যে কোন চাকরি—

ম্যানেজার ॥ (ক্রুদ্ধ ভাবে) তার মানে আরো ভাল করে আমায় ফাঁসাতে চান ? মানে মানে সরে পড়ুন বলছি।

ভানু ॥ তবেই দেখুন—জেলে যাওয়া ছাড়া আর আমার পথ নেই। বিনামূল্যে থাকা আর খাওয়ার ঐ একটি পথই খোলা আছে। আচ্ছা, দেখি।

[ম্লান হাস্য। সিগারেটে একটি জোর টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া ভানু চলিয়া গেল।]

ম্যানেজার ॥ ওরে বাবা—কি সাংঘাতিক লোক। জেলে যেতে চাইছে। খুন করতে পারে, ডাকাতি করতে পারে। যাক—সাড়ে দশ টাকার ওপর দিয়ে খুব বেঁচে গেছি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পরদিন ভোরবেলা। ভানু চৌধুরী একটি রোয়াকের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দেখা গেল—এটি একটি আপিস। উপরের সাইনবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা :

"প্রজাপতি কার্যালয়

২৪ ঘণ্টায় শুভ-বিবাহ সংঘটন হয়।

ঘটককুলশিরোমণি

শ্রীপ্রজাপতি ভট্টাচার্য (৭)"।

ভানু যেখানে শুইয়া আছে ঠিক তাহারই উপরে আর একটি লম্বা সাইনবোর্ড ঝুলিতেছে। তাহাতে লেখা :

"জরুরি ফি দিলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন এবং সুপাত্রের সন্ধান দেওয়া হয়। এইরূপ সুপাত্রের সন্ধান অন্যত্র পাইবেন না।"

[একটু পরেই প্রজাপতি ভট্টচার্য (৭) আসিলেন। পরনে শান্তিপুরী ধুতি, গায়ে গরদের চাদর। টিকিতে জবা ফুল, ভালে চন্দন তিলক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। দেখিলে মনে হয়—সাক্ষাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মা।]

প্রজাপতি ॥ ও বাবা—ইনি অবার কে ! রকের ওপর দিব্যি ঘুমুচ্ছেন ! একেবারে ঠিক সুপাত্রের বিজ্ঞাপনটার নীচেই। বলি ওহে ও বাপু—

ভানু ॥ (জাগিয়া উঠিয়া বলিল।) আজ্ঞে—আজ্ঞে…

প্রজাপতি ॥ শোবার আর জায়গা পাওনি ? যত সব…

[ভানু ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।]

ভানু ॥ আজ্ঞে একটা কাজের জন্যে…

[প্রজাপতি লোকটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন।]

প্রজাপতি ॥ ও, মফস্বল থেকে আসছেন বুঝি ? তা এখানে কেন, ভেতরে আসুন।

[প্রজাপতি গিয়া চেয়ারে বসিলেন। ভানু পেছনে পেছনে আসিয়া দাঁড়াইল।]

প্রজাপতি ॥ মেয়ের বিয়ে ?

ভানু ॥ আমার বিয়ে হলে তবে তো মেয়ের বিয়ে।

প্রজাপতি ॥ ও—বুঝেছি। মশায়ের নাম ধাম ?

ভানু ॥ নাম—ভানু চৌধুরী।

প্রজাপতি ॥ বেশ—বেশ নাম।

[প্রজাপতি নামটি খাতায় টুকিয়া লইলেন।]

প্রজাপতি ॥ ধাম ?

ভানু ॥ ফুটপাথ।

[প্রজাপতি অবাক হইয়া ভানুর দিকে তাকাইলেন। তারপর ক্রুদ্ধ স্বরে—]

প্রজাপতি ॥ তামাশা হচ্ছে—তামাশা ?

ভানু ॥ আমি একটা কাজ চাইছিলাম—যে-কোনো কাজ। ঘর ঝাঁট দেওয়া—বাসন মাজা—তামাক সাজা—যা বলেন।

প্রজাপতি ॥ চেহারায় তো নবাবপুত্তুর—একেবারে মাকাল ফল—এ্যাঁ।

ভানু ॥ [প্রজাপতির পা ধরিতে উদ্যত] দোহাই মশাই—আর আমি না

খেয়ে থাকতে পারছি না। দু'বেলা দু'মুঠো ভাত আর একটু মাথা গুঁজবার ঠাঁই দয়া করে দিন। মাইনে যা খুশি দেবেন।

প্রজাপতি ॥ আঃ—ছাড়, ছাড়, পা ছাড়। সকালবেলা স্নান-আহ্নিক করে এলুম—দিলে ছুঁয়ে। [ভানু চমকিয়া উঠিয়া পা ছাড়িয়া দিল।] তা বেশ, আমার একজন পিয়নের দরকার ছিল বটে। করতে পার। চাকরের কাজই করতে হবে। খাওয়া পরা মাইনে-পত্তর—ওসব দিতে পারব না। কন্যাদায়ে এখানে অনেকেই আসে—আসবে। তাদের ঘাড় ভেঙে যা নিতে পার—তাতেই তোমায় চালিয়ে নিতে হবে। এখন তোমার হাতযশ আর বরাত।

ভানু ॥ বেশ—তাই হবে।

প্রজাপতি ॥ কিন্তু তোমার এ ভোলটা খুলতে হবে বাপু—[ভানু তখ্খুনি ওয়াটার প্রুফটি খুলিয়া ফেলিল। প্রজাপতি তার কাপড়ের অবস্থা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।] ওরে বাবা! শীগ্গির ঐ ঘরে যাও। পুরনো জামা-কাপড় যা পাও একটা কিছু পরে নাও। ঐ কে আসছে।—যাও, যাও। [ভানু ভিতরে চলিয়া গেল। কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধ মহিম বাবু আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন।] আসুন, আসুন, বসুন।

মহিম ॥ আপনিই তো প্রজাপতি ভট্টাচার্য?

প্রজাপতি ॥ প্রজাপতি সাত ভট্টাচার্য। মানে আমাদের সাতপুরুষ থেকে ঘটকের ব্যবসা। আমার বাবা ছিলেন প্রজাপতি ছয়, তাঁর বাবা ছিলেন প্রজাপতি পাঁচ। মানে বুঝেছেন—আজকাল যে রকম ভুঁইফোড় প্রজাপতির দল গজাচ্ছে—এখানে তা পাবেন না। এ হচ্ছে আদি ও অকৃত্রিম প্রজাপতির বংশ।

মহিম ॥ তা শুনেছি। আমার বুঝলেন কিনা—একটি পাত্র চাই। নিজের মেয়ে—বলতেই নেই—তবে লোকে বলে—রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।

প্রজাপতি ॥ ও সবাই বলে। টাকা-পয়সা যদি ভাল দিতে পারেন—আরো বলবে। তা বেশ দাঁড়ান···

[খাতা টানিয়া লইলেন। এমন সময় জানালার ফাঁকে ভানু একবার

আসিয়া উঁকি দিল। প্রজাপতি ও মহিমবাবু জানালার দিকে পেছন ফিরিয়া ছিলেন বলিয়া ভানুকে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না। ভানু তাঁহাদের কথা শুনিতে লাগিল।]

মহিম॥ ঐ তো হয়েছে মশাই বিপদ। একটি মাত্র ছেলে সুরেশ—ব্রিলিয়্যাণ্ট্ ছেলে মশাই—বেরিলিতে আমার সরষের তেলের ব্যবসা দেখত। তা সে ছেলে কিনা গেল মাসে হঠাৎ কলেরায় মারা গেল। আমায় পথে বসিয়ে গেছে মশাই। পাঁচ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওর করেছিল। মরবার সময় নাকি বন্ধুদের বলে গেছে, আমি যেন ঐ টাকা দিয়ে রমার বিয়ে দিই। একটা মাত্র বোন—বড় ভালবাসত মশাই। একটি ভাল পাত্র দেখে দিন, যে—আমার সুরেশের অভাব পূর্ণ করতে পারে।

প্রজাপতি॥ আজকালকার বাজার জানেন ত মশাই। সেদিন লক্ষ্মী নার্শারি 'অধিক ফসল ফলাতে' একজোড়া বলদ কিনল মশাই—দাম ষোল শ' টাকা। এই তো হ'ল গিয়ে বাজার। তা বেশ—আপনি নাম ঠিকানা বলুন আর রেজেষ্ট্রি ফি বাবদ দশটা টাকা দিন। যদি কিছু সুবিধে করতে পারি—তখন খবর পাবেন। এখন আপনার বরাত আর আমার হাতযশ। নাম?

মহিম॥ শ্রীমহিমচন্দ্র রায়।

প্রজাপতি॥ আপনারা?

মহিম॥ কায়স্থ, শাণ্ডিল্য গোত্র। ভবানন্দের বংশ।

প্রজাপতি॥ ঠিকানা?

মহিম॥ সাত নম্বর গিরিবাবু লেন, বৌবাজার।…এই আপনার দশ টাকা ফি। আচ্ছা, তা হলেঁ উঠি। একটু দেখবেন মশাই। নমস্কার।

[মহিম বাবুর হাত হইতে প্রজাপতি টাকা লইলেন।]

প্রজাপতি॥ দেখব বৈ কি। এ আমাদের অন্ন। একটু গয়না-গাঁটির জোগাড় রাখবেন। (মহিম বাবুর প্রস্থান।) আরে—এই বেটাচ্ছেলে গেল কোথায়? [ওয়াটার প্রুফ্ পরিহিত ভানু আসিয়া দাঁড়াইল।] এই দেখ—এখনও ওটা ছাড় নি! এতক্ষণ করছিলে কি? ঐ যে এক ভদ্রলোক

এসেছিলেন—চলে যাচ্ছেন—টাক-পড়া ঐ ভদ্রলোক, ওকে গিয়ে বলো যে—শুভ কাজে আমাদের কিছু বউনি করুন স্যার। যাও যাও—যা পাওয়া যায়—নিয়ে এসো।

ভানু ॥ যে আজ্ঞে··· (ভানু দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেল।)

তৃতীয় দৃশ্য

মহিম রায়ের বৈঠকখানা। মহিমবাবুর কন্যা রমা ঝাড়ন হস্তে জিনিষপত্র গুছাইতেছে ও ফিলিমের গান গাহিতেছে। মহিমবাবু প্রবেশ করিলেন। রমার গান থামিয়া গেল।

মহিম ॥ একি ? ডাক্তার বলেছে তোমাকে শুয়ে থাকতে। আবার তুমি কাজ-কর্মে লেগে গেছ মা ?

রমা ॥ চুপ করে শুয়ে থাকলেই আমার হার্টের অসুখটা বাড়ে বাবা। কোথায় গিয়েছিলে বাবা ? সরষের তেলের ব্যাপারীরা ফিরে গেল।

মহিম ॥ এ-হে-হে। একা লোক—ক'দিক সামলাব ! গুদোমে তেলগুলো জমে রইল—অথচ লোকগুলো ফিরে যাচ্ছে। কাগজওয়ালারা যে রকম চেঁচাচ্ছে, আর সরকারী নজর ভেজাল তেলের ওপর যে রকম পড়েছে তাতে তাড়াতাড়ি তেলগুলো বিক্রী করতে না পারলে তো গেছি।

রমা ॥ এতই যদি—তবে সাতসকালে কেন বেরিয়েছিলে বাবা ?

মহিম ॥ না বেরিয়ে কি করি বল ! একটু সকাল সকাঁল না গেলেও তো ঘটককে ধরতে পারা যায় না।

রমা ॥ তুমি আমায় বিদেয় করবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছ, না বাবা ?

মহিম ॥ কি করি বল মা ? যার যাবার কথা নয়, সেই সুরেশই আমার চলে গেল। বুড়ো হয়েছি—আমি তো পা বাড়িয়েই আছি—তোর একটা হিল্লে না হলে শান্তিতে মরতেও তো পারব না মা।

[ঝির প্রবেশ।]

ঝি ॥ বাইরে একজন বাবু এসেছেন।

রমা ॥ তেলের ব্যাপারীদের কেউ বোধ হয় আবার ফিরে এলো।

মহিম ॥ (ঝিকে) নিয়ে আয়—নিয়ে আয়।

[ঝি চলিয়া গেল।]

রমা ॥ কিন্তু বাবা, দেরি করো না—অনেক বেলা হয়েছে।

[রমার অন্দরে প্রস্থান]

[ঝি ভানুকে লইয়া আসিল এবং নিজে অন্দরে চলিয়া গেল। ভানু আসিয়াই বর্ষাতিটি খুলিয়া রাখিল, দেখা গেল পরনে ফিন্‌ফিনে কোঁচানো ধুতি—গায়ে গরদের পাঞ্জাবী। ভানু ব্যস্তভাবে মহিম বাবুকে প্রণাম করিতে গেল। মহিম বাবু তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিলেন—]

মহিম ॥ আপনি ?—তুমি—কে—চিন্‌তে পারলাম না তো ?

ভানু ॥ আজ্ঞে, আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না। কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। বেরিলিতে আপনার ফটো দেখেছি কি না—সুরেশের কাছে। সুরেশ ছিল আমার বন্ধু।

মহিম ॥ সুরেশের বন্ধু ? আপনি কোত্থেকে আসছেন ?

ভানু ॥ আজ্ঞে, বেরিলি থেকে। আমাকে আপনি বলে লজ্জা দেবেন না। সুরেশ আজ নেই, তাই এত পরিচয় দিতে হচ্ছে।

মহিম ॥ তুমি কি শেষ সময় তার কাছে ছিলে ?

ভানু ॥ শুধু ছিলাম নয়, শেষ কাজও আমাকেই করতে হয়েছে জ্যেঠামশাই।

মহিম ॥ ও তবে তুমিই সেই রামকানাই ?

ভানু ॥ আজ্ঞে হাঁ—রামকানাই।

মহিম ॥ হাঁ—হাঁ—রামকানাই চৌধুরী। আমার মনে পড়েছে। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) তোমার টেলিগ্রাম আর চিঠি দুটোই একসঙ্গে পেলাম বাবা, চিঠিতে খবর পেলাম কলেরা—টেলিগ্রামে খবর পেলাম—সব শেষ।

(চোখ মুছিয়া) তা তুমি এসে ভালই করেছ। বসো বাবা—বসো। রমা রমা…

(রমা আসিয়া দাঁড়াইল।)

রমা ॥ কি বাবা?

মহিম ॥ আমার মেয়ে। রমা, এই তোর দাদার বন্ধু—নিজের হাতে সেবা-শুশ্রূষা করেছে—শেষ কাজ করেছে।

[রমা ও ভানু পরস্পরকে নমস্কার করিল।]

ভানু ॥ যতক্ষণ প্রাণ ছিল—কেবল আপনাদের কথাই বলেছে—বলেছে, কানু ভাই, রমার যাতে ভাল বিয়ে হয়—বাবাকে ব'লো। আমার ইন্সিওরেন্সের পাঁচ হাজার টাকা রমার বিয়ের জন্যই রইল।

মহিম ॥ আর বিয়ে! সে-ই চলে গেল—কে খোঁজে পাত্র—কে দেয় বিয়ে! আর কেই বা দেখে আজ আমার ব্যবসা। (রমাকে) হাঁ করে দেখছিস কি? চা দে—জলখাবার আন।

ভানু ॥ না, না—ট্রেনেই চা খেয়েছি। চা-টা থাক। আমাকে এখ্খুনি যেতে হবে। এখনো হোটেল ঠিক হয়নি।

মহিম ॥ আমি থাকতে হোটেল! তুমি বাবা যখন এসে পড়েছ তখন যে ক'দিন এখানে থাকো—এখানে আমার কাছেই থাকবে। না—মা যাও—চা না হোক জলখাবার আন। (রমা চলিয়া গেল।) তা তোমার জিনিষপত্র?

ভানু ॥ সে আর বলবেন না জ্যেঠামশাই। মঘাটঘা একটা কিছু নিয়েই হয়তো বেরিয়েছিলাম। বর্ধমানে সকালে উঠে দেখি সব চুরি হয়ে গেছে।

মহিম ॥ সে কি!

ভানু ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। বিছানা সুটকেশ মায় জুতো পর্যন্ত। ফার্ষ্ট ক্লাস স্লিপিং বার্থে এমন রাহাজানি হবে ভাবতে পারি নি।

মহিম ॥ দিনকালের কথা আর বলো না বাবা। যে যাকে পাচ্ছে—খাচ্ছে।

তা যাক—ওর জন্যে আর ভেবে লাভ নেই। চলো বাবা ওপরে চলো। ট্রেনের কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেলে হাতমুখ ধোবে। সুরেশের কত জামা কাপড় কত জুতো পড়ে রয়েছে—তুমি পরলে সার্থক হবে। এসো বাবা।

(উভয়ে অন্দরমহলে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

কলিকাতা প্রজাপতি কার্যালয়।

[প্রজাপতি ভট্টাচার্যের আপিস। প্রজাপতি একটি কোষ্ঠি পরীক্ষা করিতেছিলেন। নবদ্বীপ বাবুর প্রবেশ।]

প্রজাপতি ॥ আসুন, আসুন নবদ্বীপবাবু—সুসংবাদ। ওঁরা কাল এসে-ছিলেন—তা নগদ সাত হাজার দিতেই রাজী আছেন। আপনার ছেলের কপালটি সত্যিই ভাল।

নবদ্বীপ ॥ ছেলের কপাল ভাল কি মন্দ—জানি না মশাই, কিন্তু আমার কপাল পুড়েছে। আপনি—আমি তো এদিকে সব ঠিকঠাক করে বসে আছি, ওদিকে ব্যাটাচ্ছেলে আমাকে কলা দেখিয়ে রেজেস্ট্রী আপিসে কাজ সেরে ফেলেছে।

প্রজাপতি ॥ লভ ম্যারেজ।

নবদ্বীপ ॥ লভ ম্যারেজ।

প্রজাপতি ॥ এ- হে- হে-হে। এত বড় দাঁওটা ফসকে গেল। আপনারও আমারও।

নবদ্বীপ ॥ যাতে না ফসকায়—তাই করে নিন না মশাই। ছেলে না হয় বিয়ে করল না—ছেলের বাপ তো রয়েছে! (প্রজাপতি কিছু বলিতে উদ্যত হইতেই) না, না—গিন্নী অনেক দিন আগেই গত হয়েছেন।

প্রজাপতি ॥ আপনি—সে কি মশাই!

নবদ্বীপ ॥ চালিয়ে নিন মশাই। এ বয়সে কলকাতা শহরে কত লোক বিয়েই করেনি। কিছু না হয় কমই দিতে বলবেন। এত বড় দাঁওটা হাতছাড়া করবেন না মশাই। টু-পারসেণ্ট কমিশন না হয় বেশী নেবেন আপনি।

প্রজাপতি ॥ তাই তো—বড়ই মুশকিলে ফেললেন। আচ্ছা দশটা টাকা রেখে যান তো—দেখি।

নবদ্বীপ ॥ আবার টাকা ? একবার তো দিয়েছি।

প্রজাপতি ॥ সে তো দিয়েছেন মশাই ছেলের জন্যে।

নবদ্বীপ ॥ ও বাবা—বাপের জন্যে আবার দিতে হবে ? তা নিন। দেখবেন মশাই, একুল-ওকুল দু'কুল যেন না হারাই।

প্রজাপতি ॥ (টাকাটা লইয়া) দেখি চেষ্টা করে। তারপর আপনার বরাত আর আমার হাতযশ।

[নবদ্বীপের প্রস্থান। মহিমবাবুর প্রবেশ।]

প্রজাপতি ॥ আরে মহিমবাবু যে—আসুন, আসুন—বসুন। অনেক দেখ'লুম—কিন্তু দিনকাল যা পড়েছে—তা আমাদের ত মশাই পাততাড়ি গুটোতে হয়। আট দশ হাজারের নীচে বরের বাপ তো কথাই কইতে চায় না। তা মশাই, তাই বলে কি বিয়ে ঠেকে রয়েছে ? বরের বাপকে কলা দেখিয়ে এন্তার লভ ম্যারেজ হচ্ছে। লভ ম্যারেজ ! ফাঁকি মশাই—চারিদিকে ফাঁকি। আমার তো মশাই শনির দশা পড়েছে। একে উপার্জন নেই তাতে আবার চুরি। নতুন গরদের জামা মশাই আর শান্তিপুরী ধুতি—চাকরি করতে এসে গালে থাপ্পড় মেরে কান মলে নিয়ে গেল মশাই। করি কি বলুন···তা যাকগে। আর দশটা টাকা দিন শেষ চেষ্টা করে দেখি।

মহিম ॥ কষ্ট করে চেষ্টা করতে হবে না মশাই। মনের মতন পাত্র ঘরে বসে পেয়েছি। একেই বলে প্রজাপতির নির্বন্ধ। এখন একটা দিন দেখে দিন।

প্রজাপতি ॥ বুঝলাম। তার মানে এ তো বরের বাপকে কলা দেখিয়ে লভ ম্যারেজ ! যাক খুব বেঁচে গেছেন। বরাত-বরাত। তা শ্রাবণের আঠারোই মানে—এই শুক্কুরবারেই দিন আছে। কিন্তু যোটক টোটক বিচার···

মহিম ॥ রাখুন মশাই যোটক-বিচার। এখন চার হাত এক করে দিতে পারলে বাঁচি—তারপর যার যেমন বরাত।

প্রজাপতি ॥ বটেই তো—বটেই তো। কিন্তু আমার দিন দেখার ফিটা…

মহিম ॥ একটা দিন দেখে দেবেন—তারও আবার ফি? এই সব পাপেই এত সব লভ ম্যারেজ হচ্ছে জানবেন। আচ্ছা, নমস্কার।

(মহিমবাবুর প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য

মহিম রায়ের গৃহ। ভানু ও রমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ফুলশয্যার রাত্রিও প্রভাত হইয়াছে। ভানু অঘোরে ঘুমাইতেছে। রমা বিছনা হইতে নামিয়া একটী জান্নালা খুলিয়া দিল। সূর্যালোকে কক্ষ উদ্ভাসিত হইল। রমা ছুটিয়া আসিয়া ভানুকে ডাকিতে লাগিল।

রমা ॥ ওগো, ওঠো ওঠো—কত বেলা হয়ে গেছে।

ভানু ॥ এই যা—তাই তো! এত বেলা হয়ে গেছে! (উঠিয়া বসিল) কি চমৎকার স্বপ্ন দেখছিলাম।

রমা ॥ কি স্বপ্ন দেখছিলে?

ভানু ॥ সুরেশ যেন আমাদের বিয়েতে এসেছে। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে দেখে তার খুশি আর ধরে না।

রমা ॥ আমাদের দু'জনকেই খুব ভালবাসতেন কি না—তাই।

ভানু ॥ তা ঠিক। কিন্তু আজ এই আনন্দের মধ্যে সব চেয়ে আমায় কি বিঁধছে জান? এ বিয়েতে আমায় পণ নিতে হ'ল।

রমা ॥ দাদা ও টাকা আমার বিয়েতে আশীর্বাদ দিয়েছেন। তোমাকে তো নিজেই তা বলে গেছেন। এ টাকা তুমি না নিলে দাদার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হ'ত না।

ভানু ॥ তা ঠিক। কিন্তু তোমার বাবাও গয়না দিতে কিছু কম করেন নি।

রমা ॥ না, না, গয়না আর কৈ দিতে পেরেছেন। দাদা এমন করে চলে যাওয়াতে সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

ভানু ॥ হুঁ, তা গয়নার দরকারই বা কি? এত সোনা আমার সামনে—এত সোনা, এত সোনা। (ভানু রমার গালে মৃদু টোকা দিয়া আদর করিল।)

ঝি ॥ (নেপথ্যে কণ্ঠস্বর শোনা গেল) দিদিমণি, আসব?

[রমা দরজা খুলিয়া বাহিরে গেল এবং তখনি একলা ফিরিয়া আসিল।]

রমা ॥ কি কাণ্ড জান? আমাদের উঠতে দেরি দেখে বাবা ভেবেছেন আমার হার্টের অসুখ বুঝি বেড়েছে। ঝিকে পাঠিয়েছেন ব্যাপার কি দেখতে। [নেপথ্যে মহিমবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল 'রমা, ভাল আছিস মা?'] ঐ যে নিজেই আসছেন। (রমা দরজার নিকট ছুটিয়া গিয়া) এসো বাবা।

[রমা মহিম বাবুকে ভিতরে লইয়া আসিল।]

মহিম ॥ ভাল আছিস মা?

রমা ॥ হাঁ বাবা। তুমি আমার জন্য বড্ড বেশী ভাব।

মহিম ॥ আর ভাবব না মা। যে ভাববে—তার হাতে তোকে তুলে দিয়েছি। বুঝলে বাবা রামকানাই—মেয়েটার যখন সাত বছর বয়স—তখন ওর মা মারা যান। আমি ব্যবসা নিয়ে থাকতাম, দেখাশোনার তেমন কেউ ছিল না। মেয়েটার স্বাস্থ্যটাই গেছে ভেঙে। আর কিছু নয় হার্টটা বড় দুর্বল। ডাক্তার বলেছে ভারী কাজকর্ম করা চলবে না, আর হাসিখুশি থাকবে সব সময়। এটা বাবা তোমাকে দেখতে হবে।

ভানু ॥ বটেই তো—বটেই তো।

মহিম ॥ আচ্ছা—কথাবার্তা পরে হবে। তোমরা এখন—

ভানু ॥ আপনি বসুন বাবা। (রমাকে) শোন—আমার 'বেড-টি' চাই।

রমা ॥ আনছি। বাবা—তোমার চা-ও এখানেই দিচ্ছি।

(রমা চা আনিতে চলিয়া গেল)

ভানু ॥ হার্টের অসুখ এখন ঘরে ঘরে, ভেজাল তেল খেয়ে বেরিবেরির ফল।

মহিম ॥ ডাক্তাররা তাই বলে বটে। কিন্তু সব তেলই তো আর ভেজাল নয়।

ভানু ॥ তা হলে একটা গল্প শুনুন। আমার এক বন্ধুর পায়ে ঘা হয়েছিল। কিছুতেই সারে না। শেষে এক কব্‌রেজ বললেন—একটু ভেজাল সরষের তেল আনুন। খুব ভাল একটা মালিস তৈরি করে দিচ্ছি। তা ভেজাল সরষের তেল সারা কলকাতায় মিলল না।

মহিম ॥ কেন ?

ভানু ॥ সবাই বলে—'না মশাই, ভেজাল তেল আমরা রাখি নে।' কব্‌রেজ মশাই শুনে বললেন—'আরে মশাই, করেছেন কি। গিয়ে খাঁটি সরষের তেল চান। তবেই না পাবেন।' (মহিমবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন) আপনার সরষের তেল—(মহিমবাবুর চোখে চোখে চাহিল।)

মহিম ॥ না, তা হ্যাঁ। আজকালকার ব্যবসাই তাই। কিসে ভেজাল না চলছে বলো ? শাস্ত্রেই বলেছে—যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। যাক—একটা কাজের কথাও বলি রামকানাই। সুরেশের এই অকালমৃত্যুতে আমি বসে পড়েছি। বেরিলির ব্যবসাটা বেশ ভালই চলছিল, কিন্তু গেরো দেখ—সুরেশের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কর্মচারী জিনিষপত্র সব বেচে দিয়ে টাকাগুলো সব গাব করে একেবারে হাওয়া। সেখানে এমন একটা লোক নেই যে চিঠিপত্র লিখব।

ভানু ॥ তা আপনিই যান না।

মহিম ॥ কিন্তু যেখানে সুরেশ নেই—সেখানে যেতে আর আমার মন চায় না। তুমি যাবে বাবা ?

ভানু ॥ না বাবা। আমারও সেই কথা। যেখানে সুরেশ নেই, সেখানে আর না। আর তা ছাড়া ও তেলের ব্যবসায়ে আর আমার মন যায় না। আমি তো আপনাকে বলেছি কাপড়ের ব্যবসাই করতাম, কাপড়ের ব্যবসাই করব।

মহিম ॥ আবার কাপড় ? বেরিলিতে তোমার কাপড়ের দোকান—তুমিই

বলেছ—আগুন লেগে একদিনেই সব সাফ. হয়ে গেল। মানুষ ঠেকেই শেখে রামকানাই। না, না বাবা—ও কাপড় টাপড় আর নয়।

(রমার প্রবেশ। পেছনে ঝিয়ের হাতে চা ও জলখাবারের ট্রে। রমা উভয়কে চা-খাবার পরিবেশন করিতে লাগিল।)

বুঝলে মা রমা, বাবাজীকে বলছি—বেরিলির ব্যবসাটা সুরেশের অভাবে নয়-ছয় হয়ে যাচ্ছে। তুমি যখন ব্যবসা করবে বলেই নেমেছ—আমি বলি—তুমি বেরিলি চলে যাও। ও ব্যবসাটা আমি রমা-মার নামেই লিখে দিচ্ছি। কি বলিস্ মা ?

রমা ॥ আমি আর কি বলব বাবা—তোমরা যা ভাল বোঝ করো।

ভানু ॥ বেরিলিতে আপনি যান নি, তাই জানেন না। ভেজাল সরষের তেলে বেরিবেরি ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে দেখে কাগজগুলো যে রকম চেঁচাচ্ছে তাতে লোক একেবারে আগুন হয়ে রয়েছে। ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই।

মহিম ॥ হ্যাঁ—তা হলে সুরেশ কবেই ধরা পড়ত !

ভানু ॥ (চারিদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাইয়া গুপ্ত কথা বলিবার ছলে) তবে শুনুন—আপনারা জানেন—সুরেশ কলেরায় মারা গেছে। কিন্তু আসল কথা তা নয়। সুরেশ মার খেয়ে মরেছে। ব্যবসার স্বার্থে আমরা কলেরা কথাটা প্রচার করেছি।

মহিম ॥ এঁ্যা—

ভানু ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। দোহাই আপনার—ঐ যমের দুয়ারে আমাকেও আর ঠেলবেন না।

(মহিমবাবুর চা তাঁহার মুখে উঠিল না। পেয়ালাটি ধীরে ধীরে রাখিয়া দিলেন।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

বিশ্বম্ভরের আপিস কক্ষ। একটি সেক্রেটারিয়েট্ টেবিলে বসিয়া মালিক বিশ্বম্ভর কোলে কাগজপত্র দেখিতেছেন। দরজার কাছে টুলের উপর একজন বেয়ারা বসিয়া আছে। আপিসের কর্মচারী কৈলাস হাঁসদা বিশ্বম্ভরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

কৈলাস ॥ এ বড় বিপদ হ'ল স্যার।

বিশ্বম্ভর ॥ (মুখ তুলিয়া) তোমার তো চব্বিশ ঘণ্টা বিপদ লেগেই আছে। কি হয়েছে ?

কৈলাস ॥ বড়বাজারের আপনার সেই খালি ঘরটা—

বিশ্বম্ভর ॥ আরে—বড়বাজারে তো আমার খালি ঘর অনেক আছে। লোহাপট্টিতে আছে, খেংরাপট্টিতে আছে, সোনাপট্টিতে আছে—

কৈলাস ॥ আজ্ঞে, তেইশ নম্বর কটন ষ্ট্রীটের সেই ঘরটা যেটা কাপড়ের দোকান ছিল।

বিশ্বম্ভর ॥ হাঁ—সেটা তো ভাড়া দেবার কথা ছিল। ভাড়া দিয়েছ ?

কৈলাস ॥ আজ্ঞে, সেই নিয়েই তো গোল বেধেছে। আপনার হুকুম ছিল—ওটা ঠিক এমনি ভাড়া দেওয়া হবে না। ভাড়া দেবার লোভ দেখিয়ে কিছু সেলামী কামিয়ে নেওয়া হবে।

বিশ্বম্ভর ॥ আরে আজকাল ঐ তো এক ব্যবসা আছে। আর কি আছে ? কিছু হ'ল ?

কৈলাস ॥ তা মন্দ হয় নি। পাঁচ জনের কাছ থেকে ঐ একই ঘরের জন্য হাজার দশেক টাকা নগদ সেলামী পাওয়া গেছে। ক্যাশে জমা দিয়েছি। দেখে থাকবেন।

বিশ্বম্ভর ॥ ঠিক আছে। তোমারও দু'পয়সা হয়েছে তো ?

কৈলাস ॥ আজ্ঞে তা হয়েছে। কিন্তু ভোগ করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না স্যার।

বিশ্বম্ভর ॥ কেন হে? কি হ'ল?

কৈলাস ॥ আজ্ঞে, পাঁচজনেই একসঙ্গে এসে ঘরের দখল চাইছে। দারোয়ান রুখেছে—এখন মারমুখো হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে। আপনার এই আপিস পর্যন্ত ধাওয়া করেছে।

বিশ্বম্ভর ॥ রসিদ-টসিদ দাও নি তো?

কৈলাস ॥ (জিভ কাটিয়া) রসিদ? রসিদ কি বলছেন স্যার? আজকালকার ব্যবসায়ে আবার রসিদ আছে নাকি? কারবার হচ্ছে সব মুখে মুখে।

বিশ্বম্ভর ॥ এই তো বেশ তৈরি হয়েছ। তোমাকে কে মারে হে। যাও—তোমার কাজে যাও।

কৈলাস ॥ দেখবেন স্যার—যেন ফেঁসে না যাই।

(কৈলাস চলিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই ভানু তাহাকে এক রকম জোর করিয়া টানিয়া লইয়াই আপিস-কক্ষে প্রবেশ করিল।)

ভানু ॥ সে হচ্ছে না মশাই। কে আপনার মালিক—দেখিয়ে দিন।

বিশ্বম্ভর ॥ কে আপনি মশাই—গোল করছেন এখানে?

ভানু ॥ আপনিই বুঝি বিশ্বম্ভর বাবু—'রাম রাম ট্রেডিং কর্পোরেশনের' মালিক?

বিশ্বম্ভর ॥ হ্যাঁ—তাতে হয়েছে কি? ওকে ধরেছেন কেন?

ভানু ॥ ধরব না? আপনারই তো গোমস্তা। আমার কাছ থেকে দু' হাজার টাকা নগদ সেলামী নিয়েছে—আপনার ঐ তেইশ নম্বর কটন ষ্ট্রীটের কাপড়ের দোকান-ঘরটার জন্য। কাল দখল দেবার কথা ছিল—গিয়ে দেখি আমার মতো আরও চার জন। তারাও একে সেলামী দিয়েছে—দখল চাইছে। দারোয়ান কিন্তু কাউকেই দখল দিচ্ছে না। দিনে-দুপুরে এই রকম জোচ্চুরি—

বিশ্বম্ভর ॥ অবাক কাণ্ড মশাই! কে গোমস্তা—কোথায় ঘর—কে রসিদ দিলে—কিছুই জানি না।

ভানু ॥ রসিদ দেয় নি মশাই। কিন্তু এই লোকটা আপনার গোমস্তা বলেই বলেছে। ওখানে সব সময় বসে থাকত।

বিশ্বম্ভর ॥ আরে—এ তো চাকরির জন্য হামেশাই ঘোরাফেরা করে। কি যেন তোমার নাম?

কৈলাস ॥ দীনবন্ধু সাধুখাঁ। আপনি তো আমাকে জানেন স্যার। এক বছর কাজকর্ম নেই—আপনার দুয়ারে মাথা খুঁড়ছি।

বিশ্বম্ভর ॥ (ভানুকে) তবেই দেখুন—আপনি অনর্থক এখানে এসে গোলমাল করছেন। বড়বাজারে কম করে আমার ত্রিশটা ব্যবসা মশাই। আমার সময়ের দাম আছে।

(ভানু কৈলাসকে ছাড়িয়া দিল এবং বিশ্বম্ভরের সামনে আসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—)

ভানু ॥ দোহাই আপনার। আমাকে আপনারা এ ভাবে মারবেন না। জীবনে অনেক ঘা খেয়েছি। এমন সব ঘা খেয়েছি—আর যে কোনদিন উঠে দাঁড়াতে পারব তা ভাবি নি। হঠাৎ একটা বিয়ে করে পাঁচ হাজার টাকা বরপণ পেলাম। সৎপথে 'থেকে—ব্যবসা করে আবার উঠে দাঁড়াব—এই আশায়—আপনার ঐ কাপড়ের দোকান-ঘরটা—

বিশ্বম্ভর ॥ ব্যবসা ত মশাই আপনাকে দিয়ে হবে না। সৎপথে থেকে ব্যবসা হয় কখনো? এই বাংলাদেশে? বাড়ী যান—ইস্কুলের 'একটা মাষ্টারী-টাষ্টারী দেখুন।

ভানু ॥ আপনি শুনুন। আমি বুঝছি—আমি ঠকেছি। প্রমাণ-টমান কিছু নেই। মামলা-মোকদ্দমা করেও কিছু হবে না। কিন্তু দোহাই আপনার—আমাকে এমনভাবে পথে বসাবেন না—মারবেন না। আমাকে একটা চান্স দিন—সৎপথে থাকবার চান্স—লাষ্ট চান্স।

বিশ্বম্ভর ॥ (হাসিয়া) ঐ তো বললাম—ইস্কুলে মাষ্টারী করুন। ব্যবসা-ট্যাবসা আপনাকে দিয়ে হবে না মশাই। ও আমি লোক দেখেই বুঝি। (কলিং বেল টিপিলেন।)

ভানু ॥ হুঁ। আচ্ছা।

(ভানু চলিয়া গেল।)

সপ্তম দৃশ্য

কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি জীর্ণ পুরাতন বাড়ীর একতলা। ভানু চৌধুরী এই বাড়ীর একতলাটি ভাড়া লইয়াছে। বাড়ীটি পুরাতন হইলেও নূতন আসবাব দ্বারা সজ্জিত। অপরাহ্ন। ভানুর স্ত্রী রমা ঝি মানদার সহিত কথাবার্তা কহিতেছিল।

মানদা ॥ পুরোপুরি একমাস তো আমার কাজ হয়েছে। মাস কাবারে মাইনে না পেলে আমার কি করে চলে মা? আমারও তো পুষ্যি রয়েছে।

রমা ॥ বাবু এলে বলে দেখি।

মানদা ॥ তুমি তো ক'দিন বলেছ—আমিও বলেছি মা। কিন্তু বাবুর এদিকে খেয়ালই নেই।

রমা ॥ কোন দিকেই খেয়াল নেই। তা যদি থাকত—তবে আজ আমার এমন দশা হয় মানদা!

মানদা ॥ মিথ্যে বলোনি মা। বড়লোকের মেয়েই তুমি। [illegible]তোমাকে কি না এই একটা পোড়ো বাড়ীতে একলা এনে তুলেছে। কি দেখে যে মা—তোমাকে তোমার বাপ ওঁর হাতে দিলেন—ভেবে পাই না আমি—

রমা ॥ তাতে আমার দুঃখ নেই মানদা। দুঃখ শুধু এই আমি ওঁর মন পেলাম না। যে বাবা ওঁকে এত দিলেন—তাঁর উপরে ওঁর কোন ভক্তিশ্রদ্ধা

নেই। দিনরাত কি একটা খেয়ালে চলেন। এই দেখ না বেলা গড়িয়ে গেল— তবু ওঁর দেখা নেই।

মানদা॥ এসব লক্ষণ ভাল নয়, আর কি বলব মা। আমি বাড়ী চললাম।

[মানদা চলিয়া গেল। রমা আয়নার সামনে উঠিয়া গিয়া চুল আঁচড়াইতে লাগিল। একটু পরেই শান্ত সমাহিত মূর্তিতে ভানুর প্রবেশ।]

রমা॥ বাড়ীর কথা ভুলে গিয়েছিলে বুঝি?

ভানু॥ না, ভুলব কেন।

রমা॥ বেলা গড়িয়ে গেল—খিদে পেল—তবে তো মনে হ'ল।

ভানু॥ তা মিথ্যে নয়। সত্যি ক্ষিধে পেয়েছে। খেতে দাও।

রমা॥ বাজারের টাকা দিয়ে গিয়েছিলে?

ভানু॥ এই যা—একেবারে ভুলে গিয়েছি। তা তোমার কাছে কিছু ছিল না?

রমা॥ থাকবে না কেন: কিন্তু সে তো আমার বাপের পয়সা। তাতে আবার তোমার ঘেন্না। ভাত হজম হয় না।

ভানু॥ ও। তা হলে আজ হরিমটর বল? মানে—হাঁড়ি চড়ে নি। (রমা রাগে নিরুত্তর রহিল। ভানু পকেট হইতে দুইখানি এক টাকার নোট বাহির করিয়া) মানদা—মানদা কোথায়? দু'টাকার খাবার নিয়ে আসুক।

রমা॥ কাজে জবাব দিয়ে মানদা চলে গেছে।

ভানু॥ কেন?

রমা॥ আমার মত বিনে মাইনের দাসীবাঁদী সে নয়। মাসকাবারে বেতন না পেয়ে কাজে জবাব দিয়ে চলে গেছে।

ভানু॥ না, না—সে কি? আজই আমি তাকে তার মাইনে চুকিয়ে দেব। বিকেলে এলে বলো। আপাততঃ তা হলে আমিই তবে খাবারটা নিয়ে আসছি।

রমা ॥ দোকানের খাবারে কাজ নেই। ওসব নবাবী থাক। চালে-ডালে খিচুড়ি নামিয়ে রেখেছি। চলো।

ভানু ॥ দাঁড়াও, চানটা সেরে নিই। আমার আবার খেয়ে উঠেই বেরুতে হবে।

[এই বলিয়া ভানু দাড়ি কামাইবার সরঞ্জাম লইয়া বসিল।]

রমা ॥ এক মাস হ'ল শুনছি কাপড়ের ব্যবসা করবে। কি হ'ল জানতে পারি ?

ভানু ॥ কাপড়ের ব্যবসা হবে না। তোমার বাবা যেসব ব্যবসা করেন— ঐ রকম একটা কিছু করতে হবে।

রমা ॥ তুমি তো বাবার ব্যবসাকে মানুষ মারার ব্যবসা বল।

ভানু ॥ যা সত্যি—তাই বলি। তা আমিও ঐ রকম ব্যবসাই ধরব রমা।

রমা ॥ মানে ?

ভানু ॥ মানে—যে যাকে পাচ্ছে—খাচ্ছে। এই ধর তোমার বাবা— ভেজাল তেলের ব্যবসা চালিয়ে কম করে না হোক হাজার পাঁচেক লোক বেরিবেরিতে খেয়েছেন। কি দেশ রে বাবা! চালে কাঁকর, তেলে শেয়ালকাঁটা, ঘিয়ে চবি, দুধে জল, কুইনিনে ময়দা, ময়দায় তেঁতুলবীচি—খুনের কি ব্যবসা দেশে চলেছে। (এই বলিতে বলিতে দাড়ি কামাইতে গিয়া গাল কাটিয়া গেল।) এই যা—কেটে গেল।

রমা ॥ ইঃ—রক্ত পড়ছে—চেপে ধর। একটু আয়োডিনও নেই।

ভানু ॥ খুন করব ভাবছিলাম—নিজেই খুন হলাম।

রমা ॥ সে কি ? কাকে খুন করবে ?

ভানু ॥ কটন ষ্ট্রীটে একটা কাপড়ের দোকানঘর ভাড়া দেবে বলে আমার কাছ থেকে দু' হাজার টাকা সেলামী নিয়ে—শেষে দেখলাম—আমাকে একেবারে ঠকিয়েছে। কথাটা যখনই ভাবি—মাথায় খুন চাপে। কখন কি করে বসি— কে জানে ?

রমা ॥ দেখো—আমাকে আবার খুন করে বসো না।

ভানু ॥ তাও করছে। স্বামী স্ত্রীকে খুন করছে—স্ত্রী স্বামীকে খুন করছে—ছেলে খুন করছে বাপকে—বাপ খুন করছে ছেলেকে—এ সমাজে তাও তো দেখেছি। যে যাকে যেখানে পাচ্ছে—খাচ্ছে।

[এমন সময় ঝাঁকামুটের মাথায় চাল-ডাল প্রভৃতি জিনিষপত্র লইয়া মহিমবাবুর প্রবেশ।]

রমা ॥ একি! বাবা!

মহিম ॥ তোর চিঠি পেয়ে—কি করব? নিজেই আসতে হ'ল। (মুটেকে) এই নামা—(মুটে জিনিষপত্র নামাইয়া রাখিল।) নাও। যাও। (মুটেকে পয়সা দিয়া বিদায় করিলেন।)

ভানু ॥ এখানে মুদিখানা খুলতে এলেন নাকি!

মহিম ॥ মুদিখানা না খুলে আর উপায় কি? মেয়েটা যে উপোস করে মরবে এ তো আর চোখে দেখতে পারি না। কত করে বললাম—বেরিলি যাও—না হয় আমার বাড়ীই চলো। তাও শুনলে না—মেয়েটাকে এনে তুললে শহরের বাইরে—এই পোড়ো বাড়ীতে—

ভানু ॥ আপনার বাড়ী, আপনার অন্ন আমার কাছে বিষ। তোমার বাপের অন্ন আমার মুখে রুচবে না, ও তুমিই খেয়ো।

[ভানু যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।]

মহিম ॥ বিষ। হুঁ। বিষ নেই—কুলোপানা চক্র।

রমা ॥ এদ্দিন যে অন্ন মুখে রুচল—সে কি আমার বাপের টাকায় নয়?

ভানু ॥ না। সেটা আমার বরপণের টাকা—আমার উপার্জন। কিন্তু সে টাকাও যখন ফুরিয়েছে—আমি রোজগারে বেরুলাম। রোজগার করতে পারি খাব—না পারি না খেয়ে মরব। তবু তোমার গুষ্টির পিণ্ডি আমি গিলব না।

[ভানু ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল।]

অষ্টম দৃশ্য

কলিকাতার এক অভিজাত পল্লীতে ‘আনন্দম্’ ক্লাবের জলসা-ঘর। দৃশ্যের পশ্চাদ্‌ভাগে একটি মঞ্চ। মঞ্চের সামনে খানিকটা খালি জায়গা। তৎপর মধ্যস্থলে একটি পার্শ্বপথ রাখিয়া দুই পাশে ছোট ছোট টেবিল এবং সাজানো চেয়ার। ভানুর কপালে প্লাষ্টারের ব্যাণ্ডেজ। ‘আনন্দমে’র অন্যতম সদস্য অবিনাশ ও তিনকড়ি ভানুকে লইয়া প্রবেশ করিল। তখন সন্ধ্যা।

অবিনাশ॥ বয়—বয়! (ছুটিয়া বয় আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।) তিন পেগ্ হুইস্কি।

বয়॥ জী—হুজুর। (বয় চলিয়া গেল।)

অবিনাশ॥ (ভানুর প্রতি) সত্যিই অবাক করেছেন আপনি!

তিনকড়ি॥ না, না—এখনো ওঁর কোন কথা না বলাই ভাল। আরো বেশ খানিকটা রেষ্ট দরকার।

ভানু॥ না, না—বলুন না। ধাক্কাটা আমি সামলে নিয়েছি। জীবনে এমন সব ধাক্কা খেয়েছি—যার কাছে মোটরের এই ধাক্কা কিছুই নয়।

অবিনাশ॥ (তিনকড়িকে) না, না—হি ইজ অল্ রাইট। কোয়াইট এ ব্রেভ ইয়ং ম্যান্। (এমন সময় বয় তিন পেগ্ হুইস্কি আনিয়া সামনে রাখিল।) যদি কিছু জড়তা থেকেও থাকে—এখনই চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। (ভানুকে) কি বলেন—

ভানু॥ হাঁ—আজ আর ওতে আমার আপত্তি নেই মিষ্টার—

অবিনাশ॥ অবিনাশ মিটার। ইনি তিনকড়ি বোস।

ভানু॥ আমি ভানু চৌধুরী।

[পরস্পরের মধ্যে নমস্কার বিনিময় এবং ‘Best of luck’ বলিয়া মদ্যপান।]

অবিনাশ॥ সত্যিই আমাদের আপনি অবাক করেছেন মিঃ চৌধুরী। মোটরের ধাক্কা খেয়ে বাপ চৌদ্দপুরুষ তুলে গালাগাল করেন না, পুলিস-পুলিস বলে চেঁচামেচি করেন না—এ মশাই দেখলাম এই প্রথম। আচ্ছা, আপনার ব্যাপার কি বলুন তো?

ভানু॥ মানে—বাঁচবার সাধ আর আমার নেই।

অবিনাশ॥ তার মানে,—রেসে আজ বেশ কিছু গেছে।

ভানু॥ তা গেছে।

তিনকড়ি॥ তাই আপনি গাড়ী চাপা পড়ে মরতে চাইছিলেন?

ভানু॥ না—ঠিক তা নয়। রেস কোর্স থেকে আকাশ-পাতাল কি সব ভাবতে ভাবতে ফিরছিলাম। হঠাৎ খেলাম আপনাদের মোটরের ধাক্কা, মরলেই হয়তো বেঁচে যেতাম।

তিনকড়ি॥ কিন্তু জানেন—হিটলার যে হিটলার—পলিটিক্যাল রেসে কি হারটাই না হারল। তবু মরতে পারল না তো?

ভানু॥ মরে নি মানে?

তিনকড়ি॥ কেউ কি মরতে চায় মিঃ চৌধুরী? দুটো লোককে পুড়িয়ে মিত্রশক্তির মুখে সে-ই ছাই দিয়ে সরে পড়েছে। আইসল্যাণ্ডে জেলে সেজে নতুন করে রাজনৈতিক মাছ ধরবার ফিকিরে আছে।

ভানু॥ গুড গড। এ খবরটি কোথায় পেলেন মশাই?

অবিনাশ॥ আমাদের ক্লাবে এক ভদ্রলোক আছেন—ত্রিকাল বোস। একটা বড় ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর চীফ অর্গানাইজার। কিন্তু অদ্ভুত গুণতে পারেন মশাই। এই যে আজ রেসে ১২৫০৲ টাকা জিতলাম—এ মশাই তিন মাস আগে বলে রেখেছেন।

ভানু॥ আপত্তি না থাকে তো—আপনাদের এই অদ্ভুত লোকটির সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি?

অবিনাশ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয় আপনার মত ব্রেভ ইয়ং ম্যানকে দেখলে তিনিও ভারী খুশি হবেন।

ভানু ॥ কোথায় দেখা হবে?

অবিনাশ ॥ কেন—আমাদের এই ক্লাবে।

ভানু ॥ (চারিদিকে তাকাইয়া) এটি আপনাদের ক্লাব?

অবিনাশ ॥ হাঁ—নাম শোনেন নি—'আনন্দম্'।

ভানু ॥ না মশাই। নামটা যদি 'দুঃখম্' হতো—নিশ্চয়ই শুনতাম।

[অবিনাশ ও তিনকড়ি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হঠাৎ ত্রিকাল বোসের আবির্ভাব। বয়স পঞ্চাশের উর্ধে। স্থূট পরিহিত—অদ্ভুত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। মুখে পাইপ—চোখে পাঁশ্‌নে।]

ত্রিকাল ॥ হাসো—হাসো—হাসো। বাঁচবার প্রথম নীতিই হচ্ছে—'হেসে নাও—দু'দিন বৈত নয়।'

ভানু ॥ এ কি! ওঁকে আমি দেখেছি। এক বৃষ্টির রাত্রে আমি পথে দাঁড়িয়ে ভিজছিলাম। উনি রিক্সা করে যাচ্ছিলেন। আমার কষ্ট দেখে নিজের গায়ের ওয়াটার-প্রুফটা আমার গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেলেন।

অবিনাশ ॥ তবে ওঁর কৃপা আপনি এরই মধ্যে পেয়ে গেছেন।

[ত্রিকাল বোস ভানুর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।]

ত্রিকাল ॥ ইয়েস—মাই বয়। Then we have already met in a rainy night. কি নাম?

অবিনাশ ॥ ভানু চৌধুরী। ত্রিকাল বোস।

তিনকড়ি ॥ রেসে হেরে উনি আমাদের মোটরের তলায় পড়ে এই মূল্যবান জীবনটি অবসান করতে চেয়েছিলেন। অল্পের জন্য খুব বেঁচে গেছেন।

[ত্রিকাল বোস পকেট হইতে ম্যাগনিফাইং গ্লাস বাহির করিয়া ভানুর কপালের রেখা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।]

ত্রিকাল ॥ আয়ু পুরোপুরি ষাট বছর—কিন্তু কয়েকটি জোর ফাঁড়া আছে। চল্লিশের পর। কিন্তু চল্লিশের আগে গুলি কর—মরবে না, আগুনে ফেল—পুড়বে না, মোটরের কথা কি বলছ তোমরা! দেখো—মোটরটাই বোধ হয় একটু জখম হয়েছে। আচ্ছা—ভাগ্যরেখাটা দেখছি।…হাঁ—ভাগ্যরেখায় কিছু মেঘ জমেছে।

কিন্তু থাকবে না। স্ত্রী-ভাগ্যে ধন। বল কি হে—এর যে লক্ষপতি যোগ রয়েছে। কিন্তু সবকিছু—ঐ স্ত্রী-ভাগ্যে।

ভানু ॥ স্ত্রী-ভাগ্যে যা হবার তা হয়ে গেছে স্যার। পাঁচ হাজার-টাকা বরপণ পেয়েছিলাম। বৌ নিয়ে নতুন সংসার পাততে হাজার-খানেক বেরিয়ে গেল। কাপড়ের দোকানের জন্য কটন ষ্ট্রীটে একটা ঘর ভাড়া নিতে গিয়ে দু' হাজার টাকা আক্কেলসেলামী দিয়েছি। বাকী ছিল দু' হাজার, তার এক হাজার টাকা খুইয়েছি—আজ রেসে।

ত্রিকাল ॥ এ সব তো জানা কথা। কিন্তু আবার হবে। রাহু মশাই শেষ ধাক্কাটি দিয়ে আজ সরে পড়লেন। কাল থেকে দেখবেন। অবিনাশ বাবু, তোমার কি হ'ল আজ ?

অবিনাশ ॥ **You have never failed, Sir.** বলেছিলেন—হাজারখানেক পাব। কিছু বেশীই পেয়েছি—১২৫০৲।

ভানু ॥ আপনাকে আমার কিছু বলবার আছে। যদি দয়া করে শোনেন—গোপনে।

ত্রিকাল ॥ গোপনে আবার কি বলবে হে ? বলবার আছেই বা কি ? টাকার অভাবে দুঃখ পাচ্ছ। এই তো ?

ভানু ॥ হাঁ—কতকটা তাই বটে।

ত্রিকাল ॥ (অবিনাশ ও তিনকড়ির প্রতি) কৈ হে—তোমাদের শনিবারের জলসার আর কত দেরি ?

অবিনাশ ॥ আশেপাশেই বোধ হয় সব আছে—সময় হলেই আসবে।

ত্রিকাল ॥ সুনন্দা দেবী নাকি আজ নাচবেন। দেখো—দেখো। আজ তোমাদের আসরে নতুন অতিথি এসেছেন। **Cheer him up. Pick him up.**

[অবিনাশ ও তিনকড়ি ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।]

ত্রিকাল ॥ (ভানুকে) কি বলছিলুম—টাকা। টাকার অভাবে দুঃখ পাচ্ছ। এই তো ? দুঃখ পাচ্ছ—**Only because you are a fool.** কলকাতা শহরের পথে-ঘাটে আকাশে-বাতাসে টাকা ছড়ানো রয়েছে। শুধু তুলে নিতে

জানা চাই। যে তা জানে—সে বড়লোক। দুনিয়ার সবকিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ তার করায়ত্ত। যে তা জানে না—সে-ই হচ্ছে গরীব। এ দুনিয়ার কোন কিছুতে তার অধিকার নেই।

ভানু ॥ ঐ তুলে নেবার কৌশলটাই আমি জানতে চাই। সৎপথে থেকে—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কত চেষ্টা করেছি···

ত্রিকাল ॥ (উচ্চ হাস্য করিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ—You are a fool. বেকুব বলেই করছো। চুরি, জোচ্চুরি, ধাপ্পাবাজি, রাহাজানি—আজ এই পথেই টাকা। ধরা পড়লেই জেল—কিন্তু কোন্ ব্যবসায়ে risk না আছে বল ?

[এমন সময় বিপিন মালাকারের প্রবেশ।]

বিপিন ॥ এই যে স্যার—আপনি এখানে ? আপনাকে আমি খুঁজছি।

ত্রিকাল ॥ **Yes, Malakar, what can I do for you ?**

বিপিন ॥ (ভানুর প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া—ত্রিকালকে) একটু কথা ছিল স্যার।

ত্রিকাল ॥ না, না,—এখানে বাপু প্রাইভেট কিছু নেই। (ভানুর প্রতি) একটা ব্যবসা আছে—এরা যা করছে। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড—সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কেন থার্ড হ্যাণ্ড মোটর গাড়ী রং চং করে এক মোটর ইন্সিওরেন্স কোম্পানির এজেণ্টের যোগসাজসে নতুন গাড়ী বলে চালিয়ে—দশ হাজার টাকার ইন্সিওর করে—নিজের হাতে পেট্রল দিয়ে সে গাড়ী পুড়িয়ে দেয়। কোম্পানি টাকাটা দিতে গিয়ে হঠাৎ এই জোচ্চুরির খবর পেয়েছে। পুলিশ এন্‌কোয়ারি হচ্ছে। তোমাদের প্ল্যানে কোনো জায়গায় একটা স্ক্রু আলগা ছিল। এখন আপসোস করে লাভ কি !

বিপিন ॥ কিন্তু স্যার এখনও বোধ হয় বাঁচবার পথ আছে।

ত্রিকাল ॥ আচ্ছা কাল আপিসে যেও। ভেবে দেখব। কই হে—সুনন্দা দেবীর নাচ ?

বিপিন ॥ দেখছি। (বিপিন চলিয়া গেল।)

ভানু ॥ ইন্সিওর করে নিজের গাড়ী নিজে পুড়িয়ে—টাকা রোজগারের এ-এক বেশ ফন্দী দেখছি।

ত্রিকাল॥ এ সব ত এখন হামেশাই হচ্ছে। এ আর কি! বউয়ের লাইফ ইন্সিওর করে তারপর তাকে যেন-তেন-প্রকারেণ মেরে ফেলে ইন্সিওর কোম্পানির কাছ থেকে টাকা আদায় করা—এ রকম দু-দুটো কেস এই বছরেই হয়েছে। কেন—কাগজে পড় নি?

ভানু॥ বলেন কি স্যার?

ত্রিকাল॥ না, না—অবাক হবার কিছু নেই। সমাজই বল আর রাষ্ট্রই বল—সব কিছুর বুনিয়াদই হয়েছে আজ টাকা। স্নেহ, প্রীতি, মায়া, মমতা কর্তব্য, মনুষ্যত্ব, ধর্ম—এমন কি মন্দিরের দেবতা সবকিছু ছাপিয়ে আজ জগতে একটি মাত্র শব্দই ধ্বনিত হচ্ছে—টাকা! টাকা! টাকা! এ দুনিয়ায় টাকার শব্দই আজ ব্রহ্ম।

[সহসা রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইয়া তখনি আবার আলোকিত হইল। দেখা গেল মঞ্চের উপর নৃত্যরতা সুনন্দা। 'আনন্দমে'র সভ্যদের দ্বারা চেয়ারগুলি পূর্ণ। বলা বাহুল্য—সেখানে ত্রিকালের পার্শ্বে ভানু চৌধুরীও রহিয়াছে। নৃত্য শেষ হইল। করতালি। নৃত্যশেষে যৌবনোচ্ছলা, আনন্দোজ্জ্বলা সুনন্দা দেবী মঞ্চ হইতে তর তর করিয়া অবতরণ করিয়া পার্শ্ব পথ দিয়া আসিতে আসিতে ত্রিকাল বোসের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।]

ত্রিকাল॥ পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। 'আনন্দমে'র আনন্দ—সুনন্দা দেবী। ভানু চৌধুরী। আমাদের অতিথি। 'আনন্দমে'র নতুন সভ্য।

(উভয়ের দৃষ্টি ও নমস্কার বিনিময়।)

নবম দৃশ্য

ভানু চৌধুরীর শয়ন-কক্ষ। মানদা বিছানা করিতেছিল। ভানুর প্রবেশ।

ভানু ॥ এই যে—মানদা। যাক—তবে তুমি যাও নি।

মানদা ॥ টাকা না পেলে কি করে যাই বাবু? আর টাকা পেলে কেন যাব বলুন?

ভানু ॥ (পকেট হইতে দুইখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া মানদাকে দিল) তোমার মাইনে। (আর একখানি নোট বাহির করিয়া) রেশনের টাকা। (আর একখানি নোট বাহির করিয়া) বাজার। (মানদার চোখ কপালে উঠিল।) রমা কোথায়?

মানদা ॥ ছাদে পায়চারি করছেন। আজ একদানা ভাত মুখে দেন নি। আমি ডেকে দিচ্ছি। আপনি একটু—

[ইঙ্গিত করিয়া মানদা চলিয়া গেল। ভানু তাহার বাহিরের পোশাক খুলিয়া রাখিয়া আয়নার সম্মুখে গিয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে গুন গুন করিয়া গাহিতে লাগিল—'হেসে নাও—দু'দিন বৈ তো নয়।' রমা প্রবেশ করিল। বিছানায় গিয়া বসিল। ভানু চিরুণীটি রাখিয়া ধীরে ধীরে রমার সম্মুখে আসিয়া বসিল।]

ভানু ॥ আমায় ক্ষমা করো রমা। (ভানু রমার হাত ধরিল। রমা অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না।) কেঁদো না রমা, ওঠ! আনন্দ করো। আজ তোমার স্বামী রোজগার করে এনেছে। এই নাও।

[সে পকেট হইতে নোট বাহির করিয়া ক্রমাগত রমার গায়ে ছুঁড়িয়া দিতে লাগিল।]

রমা ॥ (বাধা দিয়া) রাখো—রাখো—একি!

[সে নোটগুলি কুড়াইয়া লইল।]

ভানু ॥ পুরো দু'হাজার। না, না—দেড়শ টাকা কম আছে। কুড়ি টাকা ঝির মাইনে—দশ টাকা রেশন—দশ টাকা বাজার। মানদাকে দিয়েছি। আর একশ' দশ টাকার এই আংটিটা—তোমার জন্য। (রমার হাত টানিয়া আনিয়া আংটি পরাইয়া দিল।) তোমাকে আমার প্রথম দান। পছন্দ হয়েছে ?

রমা ॥ খু-ব। কিন্তু এত টাকা এক দিনে রোজগার করলে কিসে ?

ভানু ॥ শেয়ার মার্কেটে। এমন আরো কত রোজগার হবে—তুমি দেখো। শোন—রাগ করে তো এখান থেকে চলে গেলাম। আকাশ-পাতাল কি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখি—গঙ্গার ধারে গিয়ে পৌছেছি। সামনে বসে আছেন—ছাই-ভস্ম মেখে এক সাধুবাবা। ইশারা করে ডাকলেন। কপালটা দেখলেন। হেসে বললেন—আরে বেটা গঙ্গায় ডুবে মরা কি এতই সোজা ! তোকে যে সংসারে এখনো অনেক হাবুডুবু খেতে হবে। শেয়ার-মার্কেটটা ঘুরে বাড়ী যা। আরে বেটা—স্ত্রীভাগ্যে তোর ধন। স্ত্রীকে পূজো কর—সব হবে—তোর সব হবে। কিন্তু বেটা—হিসেব করে খরচ করবি। যে টাকা পাবি—তা দিয়ে আজই একটা মোটা রকমের জীবন-বীমা করে ফেল। নইলে বেটা—তোর টাকা—জোয়ারের জল—ভাঁটায় বেরিয়ে যাবে।

রমা ॥ বলো কি !

ভানু ॥ আর বলো কি ! কথাগুলো শুনে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠলো। পায়ের ধূলো নিয়ে ছুটে গেলাম শেয়ার-মার্কেটে। গিয়েই দেখি—আমারই এক বন্ধু ওখানকার মস্ত বড় দালাল। খুলে বললাম তাকে—এই সাধুর কথা। শুনে বন্ধুটি আমার নামে শেয়ার ধরল। হুড়হুড় করে চলে এল আমার হাতে দু'হাজার টাকা।

রমা ॥ বলো কি !

ভানু ॥ আর বলো কি ! সাধুবাবার নাম স্মরণ করতে করতে তখনই ছুটলাম ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর আপিসে। তখন আপিস প্রায় বন্ধ হয়-হয়। মরিয়া হয়ে আমি ঢুকলাম। এজেণ্টকে বললাম—দশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওর করব—জয়েণ্ট লাইফ। মানে আমি মারা গেলে—টাকাটা পাবে তুমি।

আর আমার যদি কপাল পোড়ে—তোমার একটা কিছু হয়—তবে টাকাটা পাবো আমি।

রমা॥ (হাসিয়া) কপাল তোমার পুড়বে না। আমি মারা গেলে তুমি দশ হাজার পাবে—সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বিয়ে করবে।

ভানু॥ (হাসিয়া) হাঁ—করব। তা করব।

রমা॥ (অভিমানভরে ভানুর প্রতি তাকাইয়া) হুঁ?

ভানু॥ (প্রতিধ্বনি করিয়া) হুঁ। কাজেই তোমাকে বাঁচতে হবে। শরীরের দিকে নজর দিতে হবে। ভালো খেতে-পরতে হবে। রাতদিন ঘ্যান ঘ্যান প্যান্ প্যান্ না করে একটু ফলে ফুলে ভরে ওঠ দেখি—যাতে চোখ দুটো আর না ফেরাতে পারি। নাও—ইন্সিওরের এই কাগজটায় তোমার সই লাগবে। সই দাও। (ভানু কাগজপত্র বাহির করিয়া রমার সামনে ধরিল।) এই যে—এইখানে—লেখ—র-মা-চৌ-ধু-রী। (রমা সই করিতে লাগিল) বাঃ—সুন্দর লেখা! চমৎকার!

দশম দৃশ্য

'আনন্দম্' ক্লাবের জলসাঘর। ভানু এবং অন্যান্য সভ্যরা ফরাসে বসিয়া আছেন। সুনন্দা দেবী এবং আরও কয়েকজন মহিলাও আছেন। ত্রিকাল বোস মঞ্চের উপর দণ্ডায়মান।

ত্রিকাল॥ আমাদের 'আনন্দম্' ক্লাবের নিয়মমত আমাদের নবাগত বন্ধু ভানু চৌধুরী আমাদের আজকে গল্প শোনাবেন—তাঁর জীবনের পুঁথি থেকে।

ভানু॥ আমি?

ত্রিকাল॥ হ্যাঁ ভাই, তুমি।

সুনন্দা ॥ বলুন ভানু বাবু, আপনার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় রাত্রির কাহিনী। আমাদের এখানে এই-ই নিয়ম।

[ঘন ঘন করতালি। ত্রিকাল বোস নামিয়া আসিয়া বসিলেন। ভানু মঞ্চে গিয়া দাঁড়াইল।]

ভানু ॥ জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় রাত—আমার পক্ষে যেমন দুঃখের—তেমনি কৌতুকের। শুনুন তবে। ম্যানেজার ছিলাম কলকাতার এক বিখ্যাত ফার্মের। নাম বললে সবাই চিনবেন—ফার্মটিকেও—ফার্মের মালিকটিকেও। মালিকের দান ধ্যানের খবর প্রায়ই ফলাও করে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা হয়। লোকে ধন্য ধন্য করে। সরকারকে ইন্‌কাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া নিয়ে এ হেন মালিকের সঙ্গে আমার এক দিন মতান্তর হ'ল। বললাম—ব্রিটিশ আমলে যা করেছেন—করেছেন। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, এটা ছাড়ুন। তিনি মুখে বললেন—তা বটেই তো—তা বটেই তো। সেইদিন সন্ধ্যারাতে তবিল তছরুপের মিথ্যে চার্জ দিয়ে তিনি আমায় পুলিসের হাতে তুলে দিলেন। তাঁর দিকে অবাক হয়ে যেই তাকিয়েছি—মনে হ'ল আমার সামনে একটা শেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। পুলিস-হাজতে বসে সেই রাত্রে যেন আমি তৃতীয় নয়ন লাভ করলাম। যার দিকে তাকাই—তাকেই মনে হয় একটি জন্তু। অবশ্য তার মধ্যে ভালমন্দ সবই দেখলাম। ভাল লোকদের মধ্যে দেখলাম— গরু, ভেড়া, ছাগল, গাধা—দু' একটি ভাল কুকুরও দেখলাম। কিন্তু বেশীর ভাগই দেখলাম—বাঘ, শেয়াল, কুমীর আর সাপ।

সুনন্দা ॥ সুন্দরবনটা কলকাতার খুব কাছে। সেই জন্যেই হয় তো—

ভানু ॥ তা হবে। দেখলাম রাতের অন্ধকারে মানুষবেশী জানোয়ারগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে—কেবল চেষ্টা—কে কার রক্ত খাবে।

ত্রিকাল ॥ Quite a correct picture, my boy. That's the world we live in. I congratulate you on the discovery.—এই হচ্ছে আমাদের সমাজের সত্যিকার ছবি।

ভানু ॥ যাক, বিচারে আমার দু'বছর জেল হ'ল। সেই যে চাকরি গেল—

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দুয়ারে দুয়ারে মাথা খুঁড়েও আর আমার চাকরি জুটল না। আমার কপালে কে যেন লোহা পুড়িয়ে লিখে দিয়েছে—'এ লোকটা চোর। এ লোকটা জোচ্চোর।' আশ্চর্য, সেই মিথ্যা লিখন কিছুতেই আমি তুলে ফেলতে পারলাম না। আজও না—আজও না। মিথ্যাটাই আমার জীবনে সবচেয়ে বড় সত্য হয়ে দাঁড়াল।

[ভানু মঞ্চ হইতে নামিয়া মধ্যবর্তী পথ দিয়া যাইতেছিল। ত্রিকালের নিকট পৌঁছিতেই তিনি তাহার হাত ধরিয়া আটকাইলেন ও উঠিয়া দাঁড়াইলেন।]

ত্রিকাল॥ কিন্তু সেজন্য দুঃখ করো না বন্ধু। অনুতাপও করো না। **Rather rebel against this order of things. Pay them back in their own coins.** হাত গুটিয়ে বসে হা-হুতোশ করলে—একদিন দেখবে তোমাকেও পিষে মেরে ফেলেছে। না-না, মিথ্যা নয়। জগৎকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করার জন্যে ঋষিদের উদাত্ত আহ্বান ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছেন—খৃষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য। ব্যর্থ হয়েছেন—রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধী। স্বর্গরাজ্য নেমে আসে নি। অধর্মের অভ্যুত্থানই চলেছে—সগৌরবে—আজও। নিপীড়িত—নির্যাতিত—তোমার আমার কাছে আজ একমাত্র পথ—কণ্টকেনৈব কণ্টকম্। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। (ডাইনিং রুমে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।) খাবার ঘণ্টা বাজল। নইলে আজ আমি আরও কিছু বলতাম। চল। **Eat, drink and be merry**—হেসে নাও দু'দিন বৈতো নয়।

[সকলে খাবারঘরের দিকে চলিয়া গেল। মৃদু বাদ্য বাজিতেছে শোনা গেল। কিন্তু একটু পরেই ভানুকে লইয়া সুনন্দা ফিরিয়া আসিল।]

সুনন্দা॥ হাঁ—এই ঘরটাই বেশ নিরিবিলি আছে। মন খুলে কথা বলা চলবে। বসুন। [নেপথ্যে স্থিত বয়ের প্রতি] হাঁ—আমাদের খাবার এখানে দাও।

[উভয়ে বসিয়া কথাবার্তা সুরু করিল। কথাবার্তার মধ্যে বয় আসিয়া তাহাদের খাবার রাখিয়া গেল। খাইতে খাইতে কথা হইতে লাগিল।]

সুনন্দা ॥ প্রথম দর্শনেই বুঝেছিলাম—আপনি অসাধারণ। কিন্তু এত অসাধারণ তা ভাবতে পারি নি। কথা শুনতে শুনতে আপনাকে আমরা মাল্যদান করতেও ভুলে গেছি। (কবরী হইতে মালা খুলিয়া লইয়া ভানুর কণ্ঠে দিয়া—) আমার এ মালা আপনার।

ভানু ॥ সুন্দরীর হাতে এমন সুন্দর মালা আমি পেলাম এই প্রথম।

সুনন্দা ॥ কেন আপনার বৌ নেই ?

ভানু ॥ বৌ ? হাঁ—আছে। বিয়ে একটা করেছি বটে—কিন্তু সেও টাকার জন্যে। আমাদের জীবনে হাসি বলুন—উচ্ছাস বলুন—আনন্দ বলুন, যা কিছু—সব টাকা রোজগারের ফন্দী আর ফিকির।

[ভানু মালাটা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিল।]

সুনন্দা ॥ বিয়ে ক রেছেন টাকার জন্য ? আপনি তবে আপনার স্ত্রীকে ভালবাসেন না ?

ভানু ॥ আমার যদি টাকা থাকত—তবে অবশ্য এ মেয়েকে আমি বিয়ে করতাম না সুনন্দা দেবী।

সুনন্দা ॥ টাকা থাকলে কাকে বিয়ে করতেন ভানু বাবু ?

ভানু ॥ আজ যখন আমার টাকা নেই—সে আলোচনা করে লাভ নেই সুনন্দা দেবী। কিন্তু আপনি বিয়ে করেন নি কেন ? জীবনের এই ভরা-বসন্তে আজও আপনি একা কেন সুনন্দা দেবী ?

সুনন্দা ॥ হয় তো আমার জীবন-দেবতা নিঃস্ব। এ ষ্টেশনে আসবার টিকিট কাটতে পারছেন না।

[সুনন্দা ও ভানু দুই জনেই হাসিয়া উঠিল।]

ভানু ॥ কিন্তু প্রেম কি দুর্নিবার নয় ? তা কি টাকার বাধা মানে ?

সুনন্দা ॥ আমাদের জীবনেরই একটা ঘটনা বলছি। আপনার প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

ভানু ॥ বলুন, বলুন।

সুনন্দা ॥ আমার বাবা ছিলেন এক অধ্যাপক। দরিদ্র অধ্যাপক। অপরূপ রূপসী এক সহপাঠিনীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

ভানু ॥ লাভ ম্যারেজ?

সুনন্দা ॥ লাভ ম্যারেজ। বাবা মাইনে পেতেন ১২৫৲। ছোট সংসারটাও ভাল করে চলবার কথা নয়। তবে তাঁদের মনে ছিল প্রেম। তাই জীবনে ছিল না দুঃখ।

ভানু ॥ প্রেম দুর্নিবার। টাকার বাধা সে মানে না।

সুনন্দা ॥ মানে কিনা দেখুন। এক লক্ষপতি ছিলেন কলেজ কমিটির প্রেসিডেণ্ট। কলেজের এক প্রাইজের দিনে বাবার সঙ্গে তিনি মাকে দেখেন। আলাপ হ'ল। প্রেমের সংসারে রাহু এল। প্রমোশনের প্রলোভন বাবা তুচ্ছ করলেন, তখন সুরু হল নির্যাতন। মা আমাকে কোলে নিয়ে বাবাকে বললেন—"এখানে থাকলে···তোমার জীবন যাবে। চল—আজই আমরা পালিয়ে যাই দেশে।"

ভানু ॥ তারপর? পালিয়ে গেলেন?

সুনন্দা ॥ না। বাবা রাজী হলেন না। বললেন—'এখানে আইন আছে, পুলিস আছে, সরকার আছে। এখানে যদি রক্ষা না পাই—গ্রামে দেশে—সেখানে কে রক্ষা করবে। বাবা পুলিস কমিশনারকে খবর দিতে গেলেন। পুলিশ কমিশনার পিঠ চাপড়ে বললেন 'কিচ্ছু ভয় নেই।' বাড়ীতে ফিরে দেখেন—আমি ঘুমিয়ে আছি, মা নেই।'

ভানু ॥ ও! তবে টাকারই জয় হ'ল!

সুনন্দা ॥ টাকারই জয় হ'ল।

ভানু ॥ তারপর?

[নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি।]

সুনন্দা ॥ ঐ জলসার ঘণ্টা বাজল। আজ আর বলা হ'ল না।

[রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল। আলোকিত হইলে দেখা গেল সভ্যগণ ফরাসে উপবিষ্ট। মঞ্চে নৃত্যরতা সুনন্দা।]

একাদশ দৃশ্য

ভানু শয়নকক্ষে বসিয়া লাইফ ইন্সিওরের পলিসি দেখিতেছিল। রমা চা লইয়া আসিল।

রমা ॥ এত মনোযোগ দিয়ে কি দেখছ ?

ভানু ॥ লাইফ ইন্সিওরের পলিসিটা আজ এই সকালের ডাকে এলো। দশ হাজার টাকার পলিসি—নাও তুলে রাখো। হারায় না যেন।

রমা ॥ যাই বলো—ওটা অলক্ষুণে জিনিষ—ও আমি ছোঁব না। রাখতে হয় তুমি রাখো।

ভানু ॥ অলক্ষুণে জিনিষ! তুমি আমি—যে মরি—সঙ্গে সঙ্গে দশ হাজার টাকা। কত বড় একটা বল-ভরসা। আরে, মরতে তো এক দিন হবেই। বলি—আমরা ত কেউ আর অমর নই।

রমা ॥ মরব—আমিই মরব। হার্টের অসুখটা এখানে এসে আমার বেড়েই গেল। তুমি সারাদিন বাড়ী থাকো না। এক এক সময় এমন হয়—

ভানু ॥ ডাক্তার সেন ওপরের ফ্লাটে থাকেন বলেই আমি নিশ্চিন্ত মনে বাইরে কাজের ধান্দায় ঘুরি। তোমাকে ঠিক মেয়ের মত দেখছেন। বাড়াবাড়ি হলে ওঁকে তুমি খবর দিলেই পারো।

রমা ॥ তা দিই বৈ কি। কিন্তু এই পোড়ো বাড়ীতে একলা থাকতে কেমন আমার গা ছম ছম করে।

[মানদা চায়ের কাপ ইত্যাদি লইয়া যাইতে আসিয়াছে। রমার এই কথায় সে বলিল—]

মানদা ॥ (ভানুকে) আপনি বাড়ী ফিরতে রাত করবেন না বাবু। মা একলা থাকতে ভয় পান। আমার বাড়ী যেতে অত রাত হয়—আমারও ত কাচ্চা-বাচ্চা আছে।

কাজের ধান্দায় ফিরতে হয়। রাত হয়ে যায়। আচ্ছা দেখব।

[মানদা চলিয়া গেল। ভানু উঠিয়া একটা জামা গায়ে দিল।]

রমা ॥ কি যে তোমার কাজ হচ্ছে—তাও তো বুঝি না।

ভানু ॥ এমন কপাল। এত চেষ্টা করছি—কিছুতেই কিছু হচ্ছে না; সাধুবাবারও আর দেখা নেই। আজ আবার বাড়ী-ভাড়া গুন্‌তে হবে।

রমা ॥ বাড়ীটা ছাড়ো। এত বড় একটা পোড়ো বাড়ী। এই বাড়ীটাই অপয়া।

[ভানু রমার মুখে এইরকম একটা কথাই চাহিতেছিল। সে ইহার সুযোগ লইল।]

ভানু ॥ ও। তা হলে তুমিও শুনেছ?

রমা ॥ কি?

ভানু ॥ এ বাড়ীতে একটি মেয়ে নাকি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল।

রমা ॥ না, তা শুনি নি। কে মরেছিল? কবে? কোথায়? কোন ঘরে?

ভানু ॥ তাতে কি—ওসব বাজে। ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। চলি। দুর্গা, দুর্গা।

রমা ॥ ওগো—তুমি যেও না। আমার ভয় করছে।

ভানু ॥ কি বিপদ! একশ' বছরের পুরনো বাড়ী। খুব কম করে জন ত্রিশেক লোক এ বাড়ীতে হয়তো এই ঘরেই মরেছে। কিন্তু আমি ত তাই বলে কাজকর্ম ছেড়ে বাড়ীতে বসে থাকতে পারি না। না,না—ওসব নিয়ে মাথা খারাপ করো না। আমি ফিরব—শীগগিরই ফিরব…

[ভানুর প্রস্থান। রমা দুই হাতে বুক চাপিয়া বিছানায় বসিয়া পড়িল। ছাদের কড়ি-কাঠের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া কাঁপিয়া উঠিল। চোখ বুঁজিয়া বিছানায় এলাইয়া পড়িল। মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল, ক্ষণপরে আলোকিত হইলে দেখাগেল—শয্যার চাদরে আপাদ-মস্তক আচ্ছাদিতা রমা। মানদা পাশে বসিয়া আছে। ভানু দরজায় মৃদু করাঘাত করিল। মানদা গিয়া দরজা খুলিয়া দিল।]

ভানু ॥ (মৃদু কণ্ঠে মানদাকে) কেমন আছে?

মানদা ॥ কৈ আর ভালো। আজ সারাদিনই কেবল ভূতের ভয়ে কাঁপছেন। বুকের যন্ত্রণাটাও বেড়ে গেছে। এই সবে একটু ঘুমের মতো হয়েছে।

ভানু ॥ ডাক্তার এসেছিলেন ?

মানদা ॥ হাঁ—এসেছিলেন।

ভানু ॥ কি বললেন ?

মানদা ॥ ইংরেজীতে ক্যাটম্যাট কি সব বললেন—ছাই বুঝলাম না।

ভানু ॥ ওষুধ দিয়ে গেছেন ?

মানদা ॥ হাঁ—দিয়েছেন।

ভানু ॥ আমি খেয়ে এসেছি—তুমি বাড়ী যেতে পার।

[মানদা চলিয়া গেল। ভানু পোশাক খুলিয়া রাখিল এবং রমার ঘুম ভাঙাইবার উদ্দেশ্যে একটি ভারী বই হাতে লইয়া ইচ্ছা করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। রমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল]

রমা ॥ কে ? কে ওখানে ?

ভানু ॥ আমি—আমি।

[ভানু রমার কাছে গিয়া বসিল।]

রমা ॥ ওগো—আমাকে তুমি বাবার ওখানে পাঠিয়ে দাও। এখানে একলা থাকলে আমি বাঁচব না।

ভানু ॥ সবাই তাই বলছে বটে। বাড়ীটা ভাল নয়। রাত্রে নাকি সব—যাক, তুমি একটু সেরে উঠলেই আমি এ বাড়ী ছেড়ে দেব।

রমা ॥ এ বাড়ী ছাড়লেই আমি সেরে উঠব। তুমি আমায় নিয়ে চল—এখ্খুনি চল। চুপ—ঐ শোন—

ভানু ॥ কৈ ? হুঁ। না—ও কিছু নয়। তুমি একটু ঘুমোও—একটু ঘুমোও রমা।

রমা ॥ তুমি কিছু শুনলে না ? কেমন একটা গোঙানির শব্দ ?

ভানু ॥ ও কিছু না—যত সব বাজে—নাও, এখন একটু চোখ বোজ। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

রমা ॥ তুমি আমার কাছ থেকে যাবে না বলো ?

ভানু ॥ আমি ত কাছেই রয়েছি—সারা রাত কাছেই থাকব। তুমি ঘুমোও রমা।

[নীরবতা। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। পেচকের চীৎকার। কুকুরের ঘেউ ঘেউ। দেওয়াল ঘড়ির টিক্ টিক্……সবকিছু মিলিয়া একটা ভয়াবহ থমথমে ভাব সৃষ্টি করিল। মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।

পুনরায় আলোকিত হইলে দেখা গেল—রমা ঘুমাইতেছে, অস্বাভাবিক, অতিদীর্ঘ একটি নারীমূর্তি দরজায় দণ্ডায়মান। নারীমূর্তিটি অট্টহাস্য করিয়া উঠিল– হাঃ হাঃ হাঃ। রমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—অগ্রসরমান অতিদীর্ঘ ঐ বিকট মূর্তিটি দেখিয়া সে তখনই আর্তনাদ করিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। বলা বাহুল্য, মূর্তিটি আর কেহ নহে—ভানু স্বয়ং। দেখা গেল একটি কলসীর মুখের মধ্যে সে তাহার দুই হাত ঢুকাইয়া দিয়া ঊর্ধবাহু হইয়াছিল— সর্বাঙ্গ জড়াইয়াছিল একটি শাড়ীতে। ঊর্ধবাহু হওয়াতে কলসীর তলাটি হইয়াছিল নারীমূর্ত্তির বিকট বদন। ঐ বদনে শাড়ীর ঘোমটা দেওয়া হইয়াছিল। চকিতে ভানু কলসীর মুখ হইতে হাত দুইটি মুক্ত করিয়া লইল। ধীরভাবে কলসীটি যথাস্থানে রাখিল—সাড়ীটি সাজাইয়া রাখিল আলনায়। তারপর ছুটিয়া গেল—রমার শয্যায়।]

ভানু ॥ রমা! রমা! রমা!

[কোন সাড়া না পাইয়া ভানু রমার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিল— তাহাতে জীবনের স্পন্দন নাই। ভানু ছুটিয়া জানালায় গেল। চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল—]

ডাক্তার সেন! ডাক্তার সেন! শীগগির আসুন। আমার স্ত্রীর বোধ হয় হার্টফেল হয়েছে। ডাক্তার সেন! ডাক্তার সেন! ডাক্তার সেন!

[যবনিকা পড়িল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

'আনন্দমে'র একটি নিভৃত কক্ষ। সন্ধ্যা। ত্রিকাল ও ভানু আলাপ করিতেছিল।

ভানু॥ আপনাদের সাহায্যেই claim-টা এত সহজে settled হয়েছে।

ত্রিকাল॥ হবেই—হবেই—হতে বাধ্য। ক্লাবের কমিশন অবশ্য তুমি ভোল নি—শতকরা পঁচিশ টাকা।

ভানু॥ দশ হাজারের পঁচিশ পারসেণ্ট—এই আড়াই হাজার টাকা। যেমন নিয়ম—আমি নগদই দিচ্ছি।

[ভানু এক বাণ্ডিল নোট ত্রিকালের হাতে দিল।]

ত্রিকাল॥ But I hope this is only the begining of an end, এই শেষ নয়—এ শুধু আরম্ভ। কি বল?

ভানু॥ না, না—একটু দম নিতে দিন। তার সেই শেষ চীৎকারটা আমার কানে এখনো বাজছে।

ত্রিকাল॥ Don't be sentimental, my boy. ব্যবসাতে হৃদয়ের কোন দাম নেই—স্থান নেই।

ভানু॥ না, না—ভাববেন না—আমি অনুতাপ করছি। ওর বাপ ভেজাল সরষের তেল খাইয়ে বেরিবেরিতে অন্ততঃ হাজার লোক শেষ করেছে। এটা তার nemesis।

ত্রিকাল॥ **As I told you—pay them back in their own coin—** শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। শাস্ত্রের কথা। এ না হলে আজকের এ দুনিয়ায় তুমি দাঁড়াতে পারবে না। ওদের পায়ের চাপে তুমি পিষে মরবে। তোমার এখন তিরিশ চলছে, না?

ভানু ॥ আজ্ঞে—হাঁ।

ত্রিকাল ॥ এ বয়সে অনেকে বিয়েই করে না। অনায়াসে আর একটা বিয়ে করতে পার। দেখি—(ত্রিকাল ম্যাগনিফাইং গ্লাসে তাহার কপাল দেখিয়া—) আর তার রেখাও রয়েছে। বলেছি তো—তোমার হচ্ছে গিয়ে স্ত্রীভাগ্যে ধন। এসব কাজে দেরি করতে নেই, বুঝলে।

[টেলিফোন তুলিয়া টেলিফোন করিতে লাগিলেন।]

ত্রিকাল ॥ হ্যালো······বড়বাজার ১২৩৪···ইয়েস······এটা কি 'প্রজাপতি কার্যালয়' ?···প্রজাপতি ভট্টাচার্য মশাই আছেন···কি ? প্রজাপতি ভট্টাচার্য সাত ? হাঁ—হাঁ—প্রজাপতি ভট্টাচার্য সাত। তা ভট্টাচার্যি মশাই শুনুন—আমি ত্রিকাল বোস কথা বলছি। ভাল পাত্রীর সন্ধান আছে ?···বড়ঘরের মেয়ে-টেয়ে ? ···কি বলছেন···লভ ম্যারেজ ? (ভানুর প্রতি হাসিয়া) বলছেন—'আর পাত্রী ! ব্যবসা তো উঠে যবার উপক্রম। সব লভ ম্যারেজ।' (পুনরায় ফোনে বলিতে লাগিলেন।) না, না, লভ ম্যারেজ-ট্যারেজ নয়···আপনি শিগ্‌গীর একবার দেখা করবেন।···হাঁ—হাঁ, 'আনন্দমে'ই আসবেন।···হাঁ—হাঁ···সুনন্দা দেবীর সঙ্গে দেখা করলেই চলবে। (রিসিভার রাখিয়া দিলেন।)

ভানু ॥ কিন্তু আপনি সর্বনাশ করলেন। ঐ প্রজাপতি সাতের আমি চাকরি নিয়েছিলাম। তাঁর গরদের জামা কাপড় চুরি করে উধাও হয়েছিলাম যে !

ত্রিকাল ॥ আরে—ওরা সব আমার বন্ধুলোক।

[সুনন্দার প্রবেশ।]

ত্রিকাল ॥ এই যে সুনন্দা—এসো, এসো। প্রজাপতি সাত আসবেন—পাত্রীর খোঁজ নিয়ে—চৌধুরীর জন্যে। তুমি দেখে শুনে ভাল একটি পাত্রী বেছে দিও। তোমরা বসো, আমি আসছি।

[ত্রিকাল বোস চলিয়া গেলেন।]

সুনন্দা ॥ বিয়ে করছেন ?

ভানু ॥ বিয়ে করছি বলতে পারি না—ব্যবস্থা করছি।

স্থনন্দা ॥ কি রকম পাত্রী আপনার পছন্দ বলুন তো ?

ভানু ॥ ব্যবসার জন্য—না বিয়ের জন্য ?

স্থনন্দা ॥ যদি বলি বিয়ের জন্য।

ভানু ॥ পছন্দের কথা যদি বলেন—বলতে পারি। পাব কিনা জানি না।

স্থনন্দা ॥ বলুন না—জেনে রাখতে দোষ কি।

ভানু ॥ বলতে আমার ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে।

স্থনন্দা ॥ ওরে বাবা—ঘণ্টাখানেক !

ভানু ॥ লাগবে না ? সারা জীবনের স্বপ্ন। সারা জীবনের কাব্য। তবে হ্যাঁ—এক মিনিটেও বলতে পারি।

স্থনন্দা ॥ তাই বলুন—এক মিনিটেই বলুন। এ জীবনে অত কথা শোনবার সময় কোথায় ?

ভানু ॥ বেশ—বলছি। (একটু স্তব্ধ থাকিয়া) সারা জীবন যাকে খুঁজে বেড়িয়েছি—তাকে পেয়েছি। সে তুমি।

[বাতায়ন-পথে দেখা গেল—বাহিরে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ত্রিকাল বোস ইহাদের আলাপ শুনিতেছেন।]

ভানু ॥ এক মিনিটের বেশী সময় নিই নি স্থনন্দা দেবী।

স্থনন্দা ॥ এক মিনিট ! হ্যাঁ, এক মিনিটেই আপনি বলে ফেললেন। কিন্তু আমার কথা শুনতে হলে এক মিনিটে হবে না—এক ঘণ্টাতেও নয়। জীবনে সে সময় পাব কিনা—তাও জানি না। দেখছি—আমি আপনার বিয়ের যোগাড় দেখছি।

[একরূপ ছুটিয়াই স্থনন্দা বাহির হইয়া গেল। ভানু বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

কোন্নগরের এক জমিদারবাড়ীতে ভানুর বিবাহ। বাসরঘর। গান শেষ হইলে মেয়েরা বাহির হইয়া গেল। কয়েকটি ছেলেমেয়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নববধূ ঘুমের ভান করিয়া রহিয়াছে। ভানু সিগারেট খাইতেছে। নহবৎ হইতে সানাইয়ের মূর্চ্ছনা ভাসিয়া আসিতেছে।

ভানু ॥ ছবি! ছবি! নাঃ—এমন লজ্জাও কখনো দেখিনি। ওগো শুনছ—(ভানু তাহাকে জাগাইল। ছবি উঠিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া স্বামীর দিকে তাকাইল।) সেই কখন থেকে ডাকছি—আমার গলাটা শুকিয়ে গেছে। এখানে জল কোনখানে দেখছি না—আমাকে একটু জল দিতে পার?

[ছবি কুঁজো হইতে জল ভরিয়া দিল।]

চুপ করে রইলে যে? দুটো কথা কও। বোবা তো নও।

[মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—সে বোবা!]

এঁ্যা—তুমি বোবা? কেউ তো বলে নি। না, না, বলো—সত্যিই কি তুমি বোবা?

[মেয়েটি পুনরায় ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—সে বোবা। তাহার চক্ষে জল আসিল। প্রজাপতি ভট্টাচার্য সাতের প্রবেশ।]

প্রজাপতি ॥ এই যে বাবাজী—আমি না এসে পারলাম না। আমাকে এখনই—এই কোন্নগর থেকেই চন্দননগর ছুটতে হচ্ছে। সেখানেও আবার আজ শেষ লগ্নে আর একটা বিয়ে। তা চলে যাবার আগে—আশীর্বাদ করতে এলাম।

ভানু ॥ আপনি যে এত বড় শয়তান—তা জানতাম না। একটা বোবা মেয়েকে গছিয়ে খুব প্রতিশোধ নিলেন—যা হোক। একটা গরদের জামা আর একটা শান্তিপুরী ধুতির দাম সুদে-আসলে উসুল করলেন।

প্রজাপতি ॥ জয় গুরু! জয় গুরু—এ তুমি কি বলছ? বোবা—তাতে চটবার কি আছে? টাকা পয়সা দিতে তো কিছু কসুর করে নি বাপু। পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিয়েছে, গা-ভরা গয়না দিয়েছে—দানসামগ্রীই বা কি কম দিয়েছে? বোবা মেয়ে বলেই দোজবরেও এত দিয়েছে। ও ধরো না বাবাজী। পেটে খেলে পিঠে সয়!

ভানু ॥ আপনি এখন যান দেখি।

প্রজাপতি ॥ যেতে বলছ—যাচ্ছি। বিদায়টা না হয় দু'দিন পরেই নেব—যখন বুঝবে বোবা বউ নিয়ে ঘর করায় কি শান্তি—কি আরাম। বলব কি বাবাজী—বাংলাদেশের ঘরে ঘরে এক একটি কুরুক্ষেত্র। জানি তো। আসি বাবাজী—আসি মা। (ছবি প্রজাপতিকে প্রণাম করিল।) নামেই বোবা—নইলে রূপে লক্ষ্মী—গুণে সরস্বতী। সুখী হও মা, সুখী হও।

তৃতীয় দৃশ্য

ভানুর ঘর। সাজ-সজ্জা এবং আসবাবপত্রের অনেক উন্নতি হইয়াছে। ভানু ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া দাড়ি কামাইবার উদ্যোগ করিতেছে। মানদা কাপে গরম জল লইয়া আসিল।

ভানু ॥ মানদা, তোমার মা কি করছেন?

মানদা ॥ চা করছেন।

[মানদা চলিয়া যাইতেছিল। ভানু বলিল—]

ভানু ॥ এ বৌ—কেমন হ'ল মানদা?

মানদা ॥ খুব ভাল হয়েছে।

ভানু ॥ কিন্তু বোবা তো—ঐ এক দোষেই মাটি করেছে।

মানদা ॥ যা বলেছেন বাবু—তবু কানে শুনতে পান।

ভান্থ ॥ জন্মবোবা নয় কিনা মানদা, তাই। টাইফয়েড হওয়াতে কথা বন্ধ হয়েছে। তা, ও লিখতে পড়তে জানে। আর, বুদ্ধিসুদ্ধিও আছে—কি বল মানদা ?

মানদা ॥ তা আছে বাবু—খুব আছে। কেবল বিপদ হয়েছে এই যে—ওর হাত-পা নাড়া বুঝতে বুঝতেই আমার দিনের অর্ধেক কেটে যাচ্ছে।

ভান্থ ॥ তার জন্যে কি—মাইনে তোমার বাড়িয়ে দেব। বাপের বাড়ী থেকে তো—চাকর-বাকর সঙ্গে দিতে চেয়েছিল—কিন্তু তা আমি নেব কেন ? দু'জন তো লোক, তা তুমিই চালিয়ে নিতে পারবে।

মানদা ॥ এই যে, মা চা এনেছেন।

[ছবির প্রবেশ ও মানদার প্রস্থান।]

ভান্থ ॥ বসো।

[ছবি চেয়ারে বসিল। ভান্থ চায়ে চুমুক দিল।]

ভান্থ ॥ বাঃ বেশ চা হয়েছে।

[ছবির চোখে মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিল।]

ভান্থ ॥ তোমার এখানে কোন অসুবিধা হচ্ছে না ত ?

[ছবি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—'না'।]

বাড়ীটা বড় পুরনো—না ?

[ছবি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।]

এ বাড়ীতে থাকতে তোমার ভয় করছে না ত ?

[ছবি মাথা নাড়িয়া জানাইল—'না'।]

ভয় পাও না ? বটে !

[ছবি চট্ করিয়া প্যাডের কাগজে কি লিখিয়া ভান্থর হাতে দিল।]

ভান্থ ॥ (পাঠ) "তুমি কাছে আছ—তাই।" (হাসিয়া উঠিল) বাঃ—বেশ লেখা ত তোমার। সত্যি—তোমার হাতের লেখাটি বেশ।

[ছবি সলজ্জ হাসি হাসিয়া মাথা নাড়িয়া জানাইল—'না'।]

ভান্থ ॥ হাঁ—হাঁ নামও ছবি—লেখাও ছবি। সত্যি চমৎকার লেখা—আমার চেয়ে অনেক ভাল।

[ছবি সলজ্জ হাসিয়া বারে বারে মাথা নাড়িয়া জানাইল—'না'।]

ভানু॥ আচ্ছা, দাঁড়াও।

[ভানু উঠিয়া গিয়া আলমারি খুলিল। তাহা হইতে ইন্সিওরেন্সের কিছু ফর্‌ম বাহির করিয়া আনিল।]

ভানু॥ এই কাগজগুলো কি বল ত?

[ছবি পড়িতে চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিলনা। হতাশ ভাবে স্বামীর দিকে তাকাইল।]

ভানু॥ তুমি ইংরেজী জান না?

[ছবি মাথা নাড়িয়া জানাইল—'না'।]

ভানু॥ বেশ ত—আমরা এখন স্বাধীন হয়েছি। বাংলাতেই লিখব। এই আমি আমার নাম লিখলাম। এরই নীচে তুমি লেখ দেখি তোমার নাম।

[ছবি স্বামীর মুখের দিকে একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইয়া তাহার নাম লিখিল।]

ভানু॥ না, এটা ত তেমন সুন্দর হ'ল না।—আচ্ছা এইখানে আবার আমি লিখছি। এর নীচে তুমি আবার লেখ দেখি তোমার নাম।

[ছবি এইবার ধীরে ধীরে খুব সুন্দর করিয়া তাহার নাম লিখিল।]

ভানু॥ বাঃ—বাঃ চমৎকার। যে দেখবে—সেই বলবে তোমার লেখা আমার চেয়ে অনেক ভাল।

[ভানু কাগজ দুইটি পকেটে পুরিয়া বলিল—]

ভানু॥ আচ্ছা আমি তবে আসি। জরুরি একটা কাজ আছে।

[ছবি হঠাৎ গিয়া তাহাকে আটকাইল। ইঙ্গিতে বলিল একটু দাঁড়াও। ভানু দাঁড়াইল। ছবি ছুটিয়া গিয়া কি লিখিয়া ভানুর হাতে দিল।]

ভানু॥ (পাঠ) 'বেশি রাত ক'র না। আমি দেখেছি ঠাণ্ডা ভাত তুমি খেতে পার না।' (ছবিকে) বটে।

[ছবি জানাইল—'হাঁ'।]

ভানু ॥ আচ্ছা—আচ্ছা, সকালেই ফিরব।

[ভানু চলিয়া গেল। ছবি দরজায় দাঁড়াইয়া ভানুকে দেখিতে লাগিল। পরে ছুটিয়া বাতায়নে গিয়া সেখান হইতে দেখা যায় কিনা—দেখিতে লাগিল। গৃহকর্মরতা মানদা ঘরে প্রবেশ করিল।]

মানদা ॥ বাবু—চলে গেলেন ?

[ছবি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—'হাঁ'।]

মানদা ॥ মন খারাপ করছে ?

[ছবি লজ্জারক্তিম হাসি হাসিল।]

মানদা ॥ শোন—বাবু বেশি রাতে বাড়ী ফিরলে খুব কান্নাকাটি ক'র।

[ছবি অর্থহীন হাসি হাসিল।]

মানদা ॥ না, না, শোন। আমারও তো একটা ঘর-সংসার আছে। আমি এখানে বেশী রাত থাকতে পারি না। আর—তোমাকেও একলা এ বাড়ীতে ফেলে যেতে আমার ভয় করে।

[ছবি ইঙ্গিতে জানাইল—'তুমি যেও—আমি থাকব।']

মানদা ॥ না, না—তা হয় না। এ বাড়ীটা ভাল নয়। আর শোন নি বুঝি—তোমার আগে যে বউ ছিল—সে এ বাড়ীতে রাত্রে কি সব দেখে ভয়ে মারা গেছে।

[ছবির মুখে আতঙ্ক ফুটিয়া উঠিল।]

মানদা ॥ বাবুকে আজ খুব করে ধরবে। এ বাড়ী ছাড়তেই হবে। এ বাড়ীতে থাকলে তুমি বাঁচবে না—কেউ বাঁচবে না। এটা ভুতুড়ে বাড়ী।

[ছবি ভয়ে মানদাকে জড়াইয়া ধরিল।]

চতুর্থ দৃশ্য

আনন্দম্। একটি কুঞ্জ-বীথিতে ভানু এবং সুনন্দা আসিয়া দাঁড়াইল। রাত্রি।

সুনন্দা ॥ আসুন, এখানে একটু বসা যাক। সারাদিন ঘরে বন্দী থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি।

ভানু ॥ কিন্তু এখ্‌খুনি আপনার ডাক পড়বে যে। আপনি না থাকলে 'আনন্দম্' হয়ে ওঠে 'দুঃখম্'।

সুনন্দা ॥ ডাক পড়লে যেতেই হবে—চাকরি তো।

ভানু ॥ চাকর—না মালিক? আমি তো শুনেছি—আপনি 'আনন্দমে'র মালিক। এ দলটাই চালাচ্ছেন আপনি। আমার সঙ্গে যে বোবা মেয়ের বিয়ে হ'ল—সেও ত আপনারই ব্যবস্থা সুনন্দা দেবী।

[সুনন্দা অতর্কিতে একটু চমকিয়া উঠিল।]

সুনন্দা ॥ আপনার বিশ্বাস হয়?

ভানু ॥ আপনার সম্পর্কে আমার সবকিছু বিশ্বাস হয়—সব।

সুনন্দা ॥ কেন—বলুন তো?

ভানু ॥ ব্যবসার আবেদন নিয়ে আমি এসেছিলাম সত্য—কিন্তু হৃদয়ের নিবেদনও আমি জানিয়েছিলাম। পাষাণী বলেই আপনি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ করতে পেরেছেন—আমার ঘাড়ে ঐ বোবা বউয়ের বোঝা তুলে দিয়ে।

সুনন্দা ॥ আপনি আমার জীবন জানেন না। জানেন না—আমি কে—আমি কি। প্রিয়া হবার যোগ্যতা হয়তো আমার আছে, কিন্তু জায়া হবার যোগ্যতা আমার নেই। চরম দারিদ্র্যই নিয়ে এসেছে আমাকে এ পথে—যেমন এনেছে আপনাকে। এখানকার প্রতিটি লোক এই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে এক একটি বিদ্রোহ। শুধু দুঃখ এই—বিদ্রোহ করে যে একবার এ পথে পা

দিয়েছে—সে আর ফিরতে পারে না। স্বাভাবিক জীবনের পথ আমাদের রুদ্ধ। আমারও—আপনারও।

ভানু ॥ আপনার এ কথা আমি মানি। পথ থেকে একবার বিপথে নামলে পথে গিয়ে দাঁড়াবার আর পথ নেই। জানি, আমি জানি, কিন্তু তবু বলব—এত লোক থাকতে একটা বোবা মেয়েকে মারবার দায়িত্ব আমার ঘাড়েই চাপানো কেন ?

সুনন্দা ॥ (অকস্মাৎ ভানুর হাত দুখানি টানিয়া কাছে লইয়া) বোবা মেয়ের সঙ্গে তুমি প্রেমে পড়বে না—তাই। (যাদু-দৃষ্টিতে) কিন্তু কাজ শেষ করতে আর দেরি করছ কেন ?

ভানু ॥ (সুনন্দার বন্ধন হইতে হাত মুক্ত করিয়া) ন', না, সে যে কত অসহায়—কত নিরীহ—তুমি দেখনি। তাকে খুন করা—অসম্ভব।

সুনন্দা ॥ তা হলে বলুন—শেষটায় আপনি ঐ বোবা মেয়েরই প্রেমে পড়েছেন।

ভানু ॥ (চটিয়া গিয়া) সুনন্দা দেবী—আপনি তাকে দেখেন নি। তাই এ কথা বলতে পারছেন।

[ত্রিকাল, অবিনাশ ও তিনকড়ির আবির্ভাব।]

ত্রিকাল ॥ ব্যাপার কি ? ব্যাপার কি ? What's wrong with you ?

ভানু ॥ এই যে—আপনারাও এসেছেন দেখছি। বেশ—সবাই শুনুন—সে বোবা মেয়ের সঙ্গে এ জগতে কেউ প্রেমে পড়বে না—পড়তে পারে না। কখনও মনে হবে সে মা। কখনও মনে হবে—সে মেয়ে।

ত্রিকাল ॥ But business is business. আমাদের টাকার দরকার। নাটক-নভেল নয়।

সুনন্দা ॥ আপনাকে আর তিন দিন সময় দেওয়া হচ্ছে। শুনছেন—আজ থেকে তিন দিন।

পঞ্চম দৃশ্য

গিরিডিতে 'নারায়ণী' মূক বধির বিদ্যালয়ের আপিস। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ খাতাপত্র দেখিতেছিলেন। ভানু আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল।

ভানু ॥ আপনিই বোধ হয় এই 'নারায়ণী' মূক বধির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ?

অধ্যক্ষ ॥ আজ্ঞে হাঁ। বসুন। কোত্থেকে আসছেন ?

ভানু ॥ কলকাতা থেকে। আম'র স্ত্রী তিন বছর আগে টাইফয়েডে ভুগে বোবা হয়ে গেছে। কানে শোনে—কিন্তু কথা বলতে পারে না। সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখেছিল। আবার তাকে পড়াতে চাই—আপনাদের হোষ্টেলে রেখে।

অধ্যক্ষ ॥ এখানে! কিন্তু কলকাতা ছেড়ে এই গিরিডিতে কেন ? কলকাতাতে তো খুব বড় ডেফ এণ্ড ডাম্ব স্কুল রয়েছে।

ভানু ॥ হাঁ—রয়েছে। কিন্তু নানা কারণে আমি কলকাতায় রাখতে চাই না।

অধ্যক্ষ ॥ আপনার স্ত্রীর বয়স কত ?

ভানু ॥ উনিশ—কুড়ি।

অধ্যক্ষ ॥ ছেলে-পিলে ?

ভানু ॥ নেই।

অধ্যক্ষ ॥ বেশ। আমাদের স্পেশ্যাল ক্লাসে তাকে নিতে পারি। কিন্তু হোষ্টেলের সিট নিয়েই হচ্ছে মুশকিল।

ভানু ॥ দয়া করে একটা ব্যবস্থা করুন।

অধ্যক্ষ ॥ আচ্ছা, কয়েকটি পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ শিশুর সঙ্গে আপাততঃ কিছুদিন এক ঘরে থাকতে পারবেন ? পরে তাঁকে আলাদা ঘর দেব।

ভানু ॥ ওদের সঙ্গে থাকতে পারলে—আলাদা ঘর সে-ই নেবে না। সন্তান পেটে ধরে নি সত্যি কিন্তু যেন সকলের মা হয়েই জন্মেছে।

অধ্যক্ষ ॥ বেশ। একি! উঠছেন যে ? ফর্ম নিন্।

ভানু ॥ দিন। (ফর্ম লইয়া) বড্ড তাড়া। কলকাতার ট্রেনটা মিস না করি।

অধ্যক্ষ ॥ (ঘড়ি দেখিয়া) মিস আপনি প্রায় পনের মিনিট আগেই করেছেনে।

ভানু ॥ সে কি? next train?

অধ্যক্ষ ॥ কাল সকালের আগে ট্রেন নেই। কলকাতা পৌছবেন রাত তুপুরে। [ভানু ফর্ম লইয়া হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

ছবির শয়ন কক্ষ। রাত্রি এগারটা। ছবি প্যাডের কাগজে কি লিখিতেছিল। মানদা পানের ডিবাতে পান ভরিয়া ছবির হাতে দিল। ছবি তাহা টেবিলে রাখিয়া দিল।

মানদা ॥ বাবুর কাল আসবার কথা ছিল। এলেন না। রাত এগারটা বাজে—আজও দেখা নেই। ছেলেটার জ্বর আবার বেড়েছে—আমি তো আর বাড়ী না গিয়ে পারছি না মা।

[ছবি ইঙ্গিতে জানাইল 'যাও'।]

মানদা ॥ যাব? তা তুমি একা থাকতে পারবে তো?

[ছবি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল 'হাঁ'।]

মানদা ॥ আচ্ছা—তা হলে আমি চলি। দোর দিয়ে খুব সাবধানে থেকো। বাবুর গলা পেলে—তবে দোর খুলবে। (যাইতে গিয়া আবার ফিরিয়া) ভূতটুত নেই—ওসব বাজে কথা।

[ছবি কিন্তু তাহাতে আশ্বস্ত হইতে পারিল না। সে ছুটিয়া গিয়া মানদার আঁচল ধরিল এবং তাহার দৃষ্টি কড়িকাঠের দিকে আকর্ষণ করিয়া বুঝাইতে চাহিল, কোন এক বৌ এই ঘরে আত্মহত্যা করিয়াছে]

মানদা ॥ না, না—কে আবার গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে ! কেউ তো আর দেখে নি। মিছিমিছি মজা দেখবার জন্য লোকে এসব কথা মিথ্যে রটায়। না, না—ওসব কথা তুমি ভুলে যাও মা। কেমন ? ভুলবে তো ?

[ছবির ভয় গেলনা, তবু জানাইল 'ভুলিবে'।]

মানদা ॥ দেখ—ভয় করবে না তো ?

[ছবি জানাইল 'না'। মানদা যাইতে গিয়া কি ভাবিয়া পুনরায় ঘুরিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল—]

না, বিপদ হ'ল দেখছি। তোমাকে এভাবে এখানে একলা রেখে যেতেও মন সরছে না—ছেলেটার দারুণ জ্বর—না গিয়েও পারছি না। এক কাজ কর মা—আমার সঙ্গে চল। আমার বাড়ী।

[ছবি কি ভাবিল। আবার কড়িকাঠের দিকে তাকাইল। ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, 'আচ্ছা'।]

মানদা ॥ তবে বাইরে তালা লাগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু বাবু যদি আসেন—

[ছবি চমকিয়া উঠিল এবং হাত নাড়িয়া জানাইল সে যাইতে পারিবে না। দৃঢ় চিত্তে সে বিছানায় আসিয়া বসিল।]

মানদা ॥ যাবে না মা ?

[ছবি তাহার দিকে না তাকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল 'না'।]

মানদা ॥ তা হলে আমি আর কি করি। চলি। মা মঙ্গলচণ্ডী—দেখো মা। যাচ্ছি। দরজা দাও মা।

[মানদা বাহির হইয়া গেল ! ছবি উঠিয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিল। ধীর পদক্ষেপে বিছানায় আসিয়া বসিল। কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। আতঙ্কে ছুটিয়া গেল টেবিলে—কড়িকাঠটির দিকে আবার চাহিল এবং পরক্ষণেই প্যাডে কি লিখিতে লাগিল। বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ শুনিয়া ছবি বার বার চমকাইয়া উঠিতেছে—কিন্তু তবু লিখিতেছে। বোধ করি বাতাসের প্রকোপে

হঠাৎ সশব্দে জানলা খুলিয়া গেল। ছবি তাহা বন্ধ করিবার জন্য উঠিতেই দেখে, বাহিরে, জানালার ফ্রেমে একটি নরকঙ্কাল—পরক্ষণেই বিকট অট্টহাসি। বলা বাহুল্য, ছবি আর এক পাও অগ্রসর হইতে পারিল না। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে ভূপতিত হইল। আর উঠিল না। নরকঙ্কাল ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইল। অবিনাশ এবং তিনকড়ি বাতায়নপথে মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া গেল—তাহাদের কার্য সিদ্ধ হইয়াছে।

দূর হইতে একটি মোটরের হর্ন ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইতে লাগিল। স্পষ্ট বোঝা গেল বাড়ীর সামনে একটি মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণপরে দরজায় ভানুর গলা শোনা গেল—]

ভানু॥ (ব্যাকুল কণ্ঠে) মানদা! মানদা! মানদা! ছবি! ছবি! ছবি!

[কোন সাড়া না পাইয়া ভানু দরজায় পদাঘাত করিতে লাগিল। জীর্ণ দরজা পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া গেল। ভানু ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখে ছবি ভূপতিতা।]

ভানু॥ ছবি! ছবি! ছবি!

[নাড়ী ধরিয়া বুঝিল সব শেষ হইয়াছে। ভানু উঠিয়া দাঁড়াইল। চার দিকে একবার দেখিল। টেবিলে রক্ষিত প্যাডের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। প্যাড তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল—]

ভানু॥ (পাঠ) "তুমি কেন আসছ না? ইতি তোমার পথ চাওয়া ছবি।"

"আমাকে তোমার ভাল লাগে না বলেই তুমি আসছ না। ভগবান আমাকে বোবা করেছেন—আমি কি করব!"

"ওগো—তুমি এসো। শীগগির এসো। তুমি না এলে আমি বাঁচব না।"

[ভানু প্যাডের কাগজটি হঠাৎ বুকে চাপিয়া ধরিয়া নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িল।]

যবনিকা পড়িল

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

'আনন্দমে'র একটি নিভৃত কক্ষ। সকালবেলা। ত্রিকাল বোস চা-টোষ্ট খাইতেছিলেন এবং খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। অনতি-দূরে একটি টেবিলে চক্রাকারে বসিয়া সুনন্দা, অবিনাশ ও তিনকড়ি চা-টোষ্ট খাইতে খাইতে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিতেছিল।

অবিনাশ ॥ এ বাবা 'হর্ষবর্ধন লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী'! ভারি কড়াক্কড়ি। তবু ওর বুদ্ধির তারিফ করতে হয়—সেখান থেকে নির্বিবাদে টাকাটা আদায় করেছে। পুরোপুরি পনের হাজার।

সুনন্দা ॥ টাকা পেয়েও যখন এখানে আসে নি তখন পনের হাজারের পনর পয়সাও তোমরা পাচ্ছ না।

তিনকড়ি ॥ কিন্তু আপনার চিঠি পেয়েই কি রকম যেন হয়ে গেল। মানে—একটা কৈফিয়ত দেবার একটা চেষ্টা।

সুনন্দা ॥ যাক—আসবে বলেছে তো?

তিনকড়ি ॥ বিলক্ষণ! আপনি ডাকলে না এসে পারে? আজ সকাল ন'টার মধ্যেই আসবে বলেছে।

[সুনন্দা ঘড়ি দেখিল।]

অবিনাশ ॥ কথা তা নয়। কথা হচ্ছে ডাকতে হবে কেন?

তিনকড়ি ॥ ভানুবাবুর শ্বশুর মশাইকে দেখলাম।

সুনন্দা ॥ কোথায়?

তিনকড়ি ॥ ভানুবাবুর কাছেই বসে ছিলেন। আর তা ছিলেন বলেই—আমার কাজটা সহজ হ'ল। মানে—বাগবিতণ্ডার অবকাশ পেল না।

সুনন্দা ॥ শ্বশুরকে কি বোঝাচ্ছিল ?

তিনকড়ি ॥ কি আর বোঝাবে। কখনও বলছিল ভূতের ভয়, কখনও বলছিল হার্টের ব্যারাম। বাপের মনে বেশ একটু খটকা লেগেছে।

সুনন্দা ॥ আর খটকা। ইন্সিওরেন্স কোম্পানী টাকা দিয়ে দিয়েছে—একটি নয়—দুটি নয়—পনেরটি হাজার।

ত্রিকাল ॥ (উচ্চ কণ্ঠে) ওহে—তোমরা আজকের কাগজ পড়েছ? **There is a very interesting piece of news.** গিরিডির নারায়ণী মূকবধির বিদ্যালয়ে অজ্ঞাতনামা দাতার দশ হাজার টাকা দান।

সকলে ॥ বলেন কি!

ত্রিকাল ॥ আমি আর কি বলব? খবরের কাগজগুলোই বলছে—দাতা শতং জীবতু।

সুনন্দা ॥ এ দাতা তবে আমাদের বন্ধু ভানু চৌধুরী ?

ত্রিকাল ॥ হবে। শোকটা বড্ড লেগেছে কি না! **Sentimental fool.** আজকালকার জীবন-সংগ্রামে এরা একেবারে অচল।

সুনন্দা ॥ অথচ এই সব লোকদের খামখেয়ালীর খেসারত দিতে হবে আমাদের। তিনকড়িবাবু বলছেন—ন'টার মধ্যে তিনি আমাদের এখানে আসবেন। আমি খুব বিস্মিত হবো না—যদি তিনি ন'টার মধ্যে থানায় গিয়ে হাজির হন।

ত্রিকাল ॥ **But all roads lead to Rome**—যে পথে যেখানেই যান না কেন ঘুরে ফিরে তাঁকে এখানেই আসতে হবে। পতঙ্গ যেমন—পথে বিপথে ঘুরে ফিরে ঐ আগুনের কাছেই আসে। সুনন্দা—পায়ের শব্দ শুনছি। তোমার আসামী বোধ হয় এলেন। হাঁ ঠিক—এস—এস, ভানুবাবু এস।

[ভানু চৌধুরীর প্রবেশ।]

সুনন্দা ॥ আঘাতটা এখনও সামলে উঠতে পারেন নি দেখছি—ভানুবাবু।

ত্রিকাল ॥ না—না। নারায়ণী মূকবধির বিদ্যালয়ে দশ হাজার টাকা দান

করার পর মনটা একটু হালকা হয়েছে বৈকি। কি বল হে? আর দাঁড়িয়ে কেন? বস—বস। বয়, চা।

[ভানু একটি চেয়ারে বসিল।]

ভানু ॥ (সুনন্দাকে) আপনি আমাকে ডেকেছেন সুনন্দা দেবী?

সুনন্দা ॥ (মৃদু হাসিয়া) এদ্দিন কিন্তু ডাকতে হয় নি ভানুবাবু।

ভানু ॥ ছবির বাবা এসেছিলেন। সময় পাই নি আমি।

সুনন্দা ॥ বুঝি। তা ছাড়া দানধ্যানেও সময় লেগেছে। বুঝি না—শুধু ইতর জন মিষ্টান্ন থেকে কেন বঞ্চিত হ'ল!

ত্রিকাল ॥ Well said Sunanda! ইতর জন যে মিষ্টান্ন আশা করেন ভানুবাবু তা ভুলে গেছেন।

ভানু ॥ আপনাদের কমিশনের কথা বলছেন বোধ হয়?

অবিনাশ ॥ কথাটা সেই রকমই দাঁড়ায় বটে।

ত্রিকাল ॥ There is honesty even amongst thieves—মানে—চোরেরাও নিজেদের মধ্যে সততা রক্ষা করে চলে।

ভানু ॥ তা মানি। কিন্তু চুক্তিটা আপনারা পুরোপুরি মানেন নি।

সুনন্দা ॥ মানে?

ভানু ॥ কথা ছিল বোবা মেয়েটাকে মারব আমি। কিন্তু মেরেছেন আপনারা।

সুনন্দা ॥ আপনি মারেন নি বলেই আমাদের মারতে হয়েছে।

ভানু ॥ কিন্তু আমি কি করি—শেষ পর্যন্ত আপনারা তা দেখেন নি।

ত্রিকাল ॥ (পকেট হইতে একটি কাগজ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন।) "মিঃ চৌধুরীকে আমি তাঁহার বাড়ী হইতেই অনুসরণ করি। তিনি হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া গিরিডির একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটেন। আমি কাটিলাম তৃতীয় শ্রেণীর।...গিরিডি ষ্টেশনে নামিয়াই তিনি একখানি রিক্সা লইয়া ছুটিলেন। আমি রিক্সা না পাইয়া তাঁহার পিছু পিছু পায়ে হাঁটিয়াই ছুটিলাম। তিনি নারায়ণী মূকবধির বিদ্যালয়ে ঢুকিলেন। আমি বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

ক্ষণপর তিনি বাহির হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি বিদ্যালয়ে ঢুকিলাম। অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করিয়া পরিচয় দিলাম—আমি আই, বি, পুলিস। ভয় পাইয়া অধ্যক্ষ মহাশয় জানাইলেন—"মিঃ চৌধুরী তাঁহার বোবা স্ত্রীকে ঐ বিদ্যালয়ে রাখিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। এই সম্পর্কে খাতাপত্র দেখাইলেন।"...আশা করি—আর পড়তে হবে না ভানুবাবু।

ভানু॥ আপনারা তবে আমাকে বিশ্বাস করেন নি। পেছনে লোক লাগিয়েছিলেন।

সুনন্দা॥ সেটা কি খুব অন্যায় হয়েছে ভানুবাবু?

ভানু॥ আপনারা বলুন—আমাকে নিয়ে আপনারা কি করতে চান? কমিশন আমি দেব না।

ত্রিকাল॥ (খবরের কাগজ লইয়া) ওহে—কলকাতায় হ'ল কি? তোমরা এ খবরটা পড়েছ? (পাঠ) "নৃশংস হত্যাকাণ্ড। মাণিকতলার খাল হইতে বস্তাবন্দী মৃতদেহ উদ্ধার। গতকল্য রাত্রি দশটায় মাণিকতলা খালের জলে একটি বস্তাবন্দী লাশ প্রথমে কুকুরের তৎপর পথচারী পথিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিকটেই থানা। পুলিস খবর পাইয়া বস্তাটি খুলিয়া দেখে—একটি মস্তক বিহীন লাশ। মৃত ব্যক্তিকে সনাক্ত করিবার মত কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। জোর পুলিস তদন্ত চলিতেছে।" থানার চোখের উপর মাণিকতলার খালে মস্তকবিহীন লাশ। কি দুঃসাহস বল!

ভানু॥ (অধীর হইয়া) আমি জানি—আমি বিশ্বাস করি আপনাদের পক্ষে সবই সম্ভব। আপনারা আমাকে খুন করতে চান।

ত্রিকাল॥ Do'nt be unkind to us, my boy—মিছি-মিছি তোমাকে আমরা কেন মারব। তোমার জীবনে এখনও কত আশা কত স্বপ্ন। দু'দুটো বিয়ে করেছ—but I pity you poor boy. দু'জনের কাউকেই তুমি ভালবাস নি। প্রথম স্ত্রীকে করেছ তুমি ঘৃণা—দ্বিতীয় স্ত্রীকে করেছ তুমি স্নেহ। মনের পিপাসা রূপের তৃষ্ণা—মেটেনি তোমার ভানুবাবু। I want you to marry again. এ জগতে কে তোমার প্রিয়া—কে তোমার মানসী—আমি

জানতে পারি ভানুবাবু? হাঁ—তারই সঙ্গে হবে তোমার বিয়ে। তোমার কোন কামনা আমরা অপূর্ণ রাখব না। বল—বল কে সে?

[ভানু নতমুখে নীরব রহিল।]

ত্রিকাল ॥ লাজুক ছেলে। এত ভীরু তোমার প্রেম? ভানুবাবু, ম্যাগ্নি-ফাইং গ্লাস দিয়ে আমি শুধু তোমার কপাল দেখিনি, তোমার মনও দেখেছি। আমি জানি—সে কে। Friends, I have the greatest pleasure in announcing to day a marriage will take place immediately. পাত্র শ্রীমান ভানু চৌধুরী। পাত্রী কুমারী সুনন্দা দেবী।

[অবিনাশ ও তিনকড়ি ঘন ঘন করতালি ধ্বনি দ্বারা এই ঘোষণাকে অভিনন্দিত করিল।]

ত্রিকাল ॥ আশা করি—পাত্র কিংবা পাত্রীর এ বিবাহে অমত নেই।

[সুনন্দা ও ভানু পরস্পরের প্রতি তাকাইয়া মুখ নীচু করিল। অবিনাশ এবং তিনকড়ি ঘন ঘন করতালি দিয়া সম্মতিসূচক এই নীরবতাকে অভিনন্দিত করিল।]

ত্রিকাল ॥ কিন্তু এ বিয়ে হবে একটি সর্তে। জীবন অনিত্য। শুধু বিয়ে করলে চলবে না। ভবিষ্যতের ভাবনাও ভাবতে হবে। সুনন্দার অভাবে ভানুবাবুকে অভাবে পড়তে হবে না। কিন্তু ভানুবাবুকে হারালে সুনন্দা কি নিয়ে দাঁড়াবে? কাজেই ভানুবাবু, তোমাকে বিয়ের আগেই পঁচিশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওর করতে হবে। আর তা তোমাকে লিখে দিতে হবে সুনন্দার নামে। It is a fair deal, my boy.

ভানু ॥ আমি জানি—এর পরিণাম কি। কিন্তু তাতে আমার দুঃখ নেই। কামনার ধন পেয়ে যদি একদিনও বাঁচি—কামনার ধন না পেয়ে এমন করে পুড়ে মরার চেয়ে সে অনেক ভাল—অনেক ভাল।

ত্রিকাল ॥ That's exactly what I wanted my boy. Then fill up the forms. পঁচিশ হাজার টাকার ইন্সিওরেন্স। ফর্ম পূরণ করে প্রথম প্রিমিয়ামের টাকা নিয়ে চলে এস—আমার আপিসে।

[ত্রিকাল বোস কাগজপত্র ভাস্থর সামনে রাখিল। অবিনাশ ও তিনকড়িকে চোখের ইশারায় ডাকিয়া বাহির হইয়া গেল। ভান্থ স্থনন্দার প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইল।]

স্থনন্দা॥ (মৃদু হাস্যে) কি ভাবছ? সই কর।

ভান্থ॥ পতঙ্গ পুড়ে মরবে জেনেও আগুনে ঝাঁপ দেয়। এও তাই—এও তাই। আমি সানন্দে সই করছি স্থনন্দা।

[ভান্থ সই করিতে বসিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভান্থ চৌধুরীর পূর্বতন গৃহ। জীর্ণ হইলেও তাহার যতটা সম্ভব সংস্কারসাধন করা হইয়াছে। বাতায়নে এবং দরজায় সুদৃশ্য পর্দা ঝুলিতেছে। স্থনন্দা একটি ঝাড়ন লইয়া বসিবার ঘরের আসবাবাদি ঝাড়িতেছে এবং গাহিতেছে—

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়ন্থ
পেখন্থ পিয়ামুখ-চন্দা"

ভান্থ সোফাতে দেহ এলাইয়া দিয়া নিমীলিত চোখে গান শুনিতেছে।

স্থনন্দা॥ (ভান্থকে) এ কি—ঘুমুচ্ছ না কি?

ভান্থ॥ (সচকিত হইয়া বসিয়া) না শুনছিলাম তোমার গান। কিন্তু থামলে কেন?

স্থনন্দা॥ গানেরও তো শেষ আছে।

ভান্থ॥ (অনেকটা আপনমনে) গানেরও শেষ আছে। তা আছে বটে, গানের শেষ আছে—যেমন আছে দিনের শেষ—জীবনের শেষ। (হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল) এ গান তবে তোমার শেষের কবিতা স্থনন্দা!

সুনন্দা ॥ গান—গান। শেষ কি সুরু জানি না। (ঘড়ির দিকে তাকাইয়া) রাত ন'টা বেজে গেল।

ভানু ॥ ন'টা বেজে গেল ? তোমার বাবা এলেন না তো।

সুনন্দা ॥ তাইতো দেখছি। তুমি খেয়ে নেবে ?

ভানু ॥ সে কি করে হয় ? তোমার বাবা আসছেন—দেখা হবে এই প্রথম। আর রাতই বা এমন কি বেশী হয়েছে।...আচ্ছা, তোমার বাবা কেমন দেখতে ? তোমার বাবা যখন—নিশ্চয়ই বেশ সুদর্শন ?

সুনন্দা ॥ সুদর্শন ! হাঁ, সুদর্শন। কিন্তু তুমি তাঁকে দেখলে ভয়ে আঁতকে উঠবে।

ভানু ॥ কেন ? কেন বল তো ?

সুনন্দা ॥ আমার মা ছিলেন অপরূপ সুন্দরী—ইংরেজীতে তোমরা যাকে বল Beauty Queen। বলি নি ?

ভানু ॥ বলেছ। কিন্তু তোমাদের কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় একটা লক্ষপতি শয়তান। তাও বলেছ।

সুনন্দা ॥ সেই থেকে বাবাও হয়েছেন শয়তান। ছিলেন অধ্যাপক—মনে ছিল কত প্রীতি, কত আশা, কত স্বপ্ন ! কিন্তু আজ তাঁর জীবন একটা শ্মশান। হাঁ—শ্মশানের প্রেত হয়ে তিনি আজ সংসারে বাস করছেন। স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা—সবকিছু ভুলে গেছেন।

ভানু ॥ কিন্তু তোমাকে তিনি কি করে ভুলতে পারলেন ?

সুনন্দা ॥ আমাকে তিনি ভোলেন নি। শ্মশানের এক কোণে হয় তো একটা ফুল ফুটেছে—তাঁর জীবনে সেই একটি মাত্র ফুল—আমি। নাঃ—তিনি বোধ হয় আর এলেন না। চল আমরা খেয়ে নি। ওঠো।

[দুই জনে খাবার ঘরে গেল। মঞ্চ অন্ধকার হইল। পুনরায় মঞ্চ আলোকিত হইলে দেখা গেল দেয়াল-ঘড়িতে রাত্রি চারটা বাজিয়াছে। ভানু মাথায় হাত দিয়া সোফায় বসিয়া আছে। সুনন্দা ঘুম হইতে উঠিয়া ভানুর কাছে আসিল।]

সুনন্দা ॥ তুমি এখানে? কখন বিছানা থেকে উঠে এলে জানি না। আচ্ছা তোমার কি হয়েছে বল তো? রাত্রে ঘুমাও না—এমন করলে শরীর ক'দিন টিঁকবে?

ভানু ॥ শরীর! আমার শরীরের কথা বলছ?

সুনন্দা ॥ হাঁ—দিন দিন তুমি শুকিয়ে যাচ্ছ। ঘুম ছেড়েছ—খাওয়া দাওয়া ছেড়েছ—কেন বলতো?

ভানু ॥ জীবন অনিত্য। দেহের ভাবনা ভেবে আর কি হবে? এ তো যাবেই—দু'দিন আগে, আর দু'দিন পিছে। ব'স, ব'স সুনন্দা। একটা গল্প মনে পড়ল।

[ভানু সুনন্দাকে ধরিয়া কাছে ব ল

ভানু ॥ জান—আমার এক বন্ধু ছিল এক দুঃসাহসী বিপ্লবী। এক পুলিস অফিসারকে গুলী করে মেরে ফেলে। কিন্তু পুলিসের গুলীতে নিজেও ভীষণ-ভাবে আহত হয়। বাঁচবার কোন আশা ছিল না।

সুনন্দা ॥ মরাই ছিল ভাল। বেঁচে উঠলেও তো সেই ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে।

ভানু ॥ যা বলেছ। কিন্তু সরকার তাকে মরতে দিলে না। তাকে বাঁচাবার জন্যে হাসপাতালে এমন সেবা-শুশ্রূষা—এমন যত্ন-আত্তি করতে লাগল যে, এক মাসেই ভদ্রলোকের ওজন দশ পাউণ্ড বেড়ে গেল। কেন জান তো?

সুনন্দা। খুব ঘটা করে তাকে ফাঁসি দেবে বলে—এই তো?

ভানু ॥ যা বলেছ। তোমার এই সেবা-শুশ্রূষা—তোমার এই আদর-যত্ন দেখে—কেবলই কেন যেন—আমার এই গল্পটাই মনে পড়ছে সুনন্দা।

সুনন্দা ॥ (গম্ভীর ভাবে) তোমার বিশ্বাস—তোমাকে আমি খুন করব—ঐ পঁচিশ হাজার টাকার ইন্সিওরের লোভে?

ভানু ॥ নইলে তোমাকে তো আমার পাবার কথা নয় সুনন্দা।

সুনন্দা ॥ সেইজন্যেই কি পেয়েছ? পাবার আর কোন কারণই কি ছিল না? খুনী তুমি—আমি নই। তোমাকে খুন করতে চাইলে—খুন হবার ভয়

আমারই বেশী। এত বড একটা বিপদ আছে জেনেও তোমার জীবনে আমি এলাম—হাসিমুখে।

ভানু॥ (আবেগভরে) সুনন্দা, সুনন্দা…

সুনন্দা॥ হাঁ, নইলে কে তুমি? কি তোমার যোগ্যতা? টাকা রোজগারের যোগ্যতা তোমার নেই—যদি না চুরি করো—খুন করো। এত বড় কাঙাল তুমি। কিন্তু যোগ্যতা—অযোগ্যতা সবকিছু ছাপিয়ে এমন একটা লগ্ন মানুষের জীবনে আসে—যখন কোন বিচারের অবসর থাকে না—চিন্তার অবকাশ থাকে না। সেই পরম লগ্নে তোমার সঙ্গে হয়েছিল আমার দেখা। অত বড় কাঙাল হয়েও সেই মুহূর্তেই তুমি আমাকে জয় করেছিলে—জয় করেছিলে।

ভানু॥ সত্যিই তো। তোমার হাতে আমার খুন হওয়ার চেয়ে—আমার হাতে তোমার খুন হওয়ার ভয় বেশী। তবু তুমি এসেছ। সে-ই যদি এলে—এত দেরীতে কেন এলে সুনন্দা। দু'দুটো অতৃপ্ত আত্মার অভিশাপ মাথায় নিয়ে কেন তুমি এলে। (হঠাৎ) সুনন্দা—চল আমরা পালাই।

সুনন্দা॥ পলাব! কেন? কোথায়?

ভানু॥ যেখানে তোমার খুশী চলো। কিন্তু এখানে আর নয়। এ বাড়ী খুনের বাড়ী—এ বাড়ী ভূতুড়ে বাড়ী।

সুনন্দা॥ না, না, তুমি ব'স। এ সব কি বলছ?

ভানু॥ না, না, তুমি বুঝছ না। এ বাড়ীতে দু'দুটো খুন হয়েছে—আমারই চোখের সামনে। তার একটিকে খুন করেছি—আমি নিজে।

সুনন্দা॥ (হাসিয়া) কিন্তু আমাকে খুন করলে তো লাইফ ইন্সিওরের টাকা পাবে না তুমি। কিন্তু তোমাকে খুন করলে আমি পাব।

ভানু॥ না, না,—সে ভয় আর আমার নেই। খুনই যদি করতে—তবে অনেক আগেই করতে। এক দিন তা বিশ্বাসও করতাম। কাল পর্যন্ত আমার সেই বিশ্বাসই ছিল। আমার জীবনে তোমাকে পাবার জন্য—জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলাম কাল পর্যন্ত। কিন্তু সে জন্য কাল আমি যা করেছি—

তাতে তোমাকে আর আমি পাব না। আমি তোমাকে হারিয়েছি সুনন্দা—তোমাকে আমি হারিয়েছি।

সুনন্দা ॥ সে কি? আমাকে হারিয়েছ—এ কথার অর্থ?

ভানু ॥ কাল রাত্রের কথা মনে কর সুনন্দা। কাল রাত্রেই প্রথম তুমি আমায় ধরা দিলে—তোমার জীবনের—তোমার যৌবনের—সবকিছু দিয়ে। তখন কি তুমি অট্টহাস্য শুনেছিলে? অট্টহাস্য…দু'দুটো অতৃপ্ত আত্মার অট্টহাস্য?…আমি শুনেছিলাম—ঐখানে। (আঙ্গুল দিয়া একটি স্থান নির্দেশ করিয়া) ঐখানে মরেছিল রমা। (অন্য একটি স্থান নির্দেশ করিয়া) ঐখানে মরেছিল ছবি।

সুনন্দা ॥ শোনো—শোনো। তুমি শোবে চল।

ভানু ॥ অট্টহাস্যে ওরা দু'জন কি বলেছিল—জান? বলেছিল—এই মিলনই শেষ মিলন। এ-রাতই শেষরাত। তখনই মনে হ'ল—তুমি এক বিষ-কন্যা। তোমার চুম্বনে বিষ—আলিঙ্গনে বিষ।—বিষের জ্বালায় আমি যেন জর্জর হয়ে উঠলাম। তুমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছ—নইলে তুমি দেখতে—আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায়—ছুটে এসে বসলাম টেবিলে। প্যাডের পাতার পর পাতা ছিঁড়ে পুলিসের কাছে লিখে জানালাম—কি করে, কেমন করে—দু'দুটো নিরীহ জীবন আমারই হাতে অকালে শেষ হয়েছে।

সুনন্দা ॥ (আর্তনাদ করিয়া) এ্যাঃ…তুমি লিখেছ? কোথায় সে কাগজ?

ভানু ॥ শুধু লিখি নি—পোষ্টও করেছি কালই রাত্রে। এতক্ষণে পুলিসের হাতে।

সুনন্দা ॥ ওগো তুমি কেন এমন করলে? এমন করে নিজের হাতে নিজের সর্বনাশ করলে।

ভানু ॥ তোমার হাতে আমার আজ সর্বনাশ হবে ভেবে—আমার হাতে যে দুই মহা সর্বনাশ হয়েছে—তার দুর্বহ বোঝা আর গোপন রাখতে পারলাম না—পারলাম না সুনন্দা। (দরজায় করাঘাত শোনা গেল। ভানু ভয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিল) পুলিস।

সুনন্দা ॥ দাঁড়াও, আমি দেখছি। (সুনন্দা ত্বরিত পদে দরজার কাছে গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল—) কে ?

[নেপথ্য হইতে উত্তর আসিল "আনন্দম্। দরজা খোল।" সুনন্দা দরজা খুলিয়া দিল। ত্রিকাল বোসের প্রবেশ।]

সুনন্দা ॥ এ কি—এত রাত্রে ?

ত্রিকাল ॥ বরং বল এত ভোরে।

[সোফার দিকে দুজনে অগ্রসর হইল]

ত্রিকাল ॥ (ভানুকে দেখিয়া) কিন্তু এ কি ? একে এখানে—এখন—এভাবে দেখব—এ আশা তো করি নি সুনন্দা। প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম—গাড়ী নিয়ে—লোকজন নিয়ে—একটা বড় ব্যাগ নিয়ে। তারিখ ভুল হ'ল! এই রাতেই তো আমাদের আসবার কথা ছিল সুনন্দা।

সুনন্দা ॥ হ্যাঁ ছিল। কিন্তু আপনাদের কোন কথা রাখতে পারি নি আমি। আর পারবও না। কিন্তু আপনাদের চলে যেতে হবে—এখান থেকে—এই মুহূর্তে।

ত্রিকাল ॥ আমি লাশ নিয়ে যেতে এসেছি। লাশ না নিয়ে আমার যাবার কথা নয়।

সুনন্দা ॥ পুলিসকে খবর দেওয়া হয়েছে। এখানে অপেক্ষা করলে যে-কোন মুহূর্তে আপনারা ধরা পড়বেন।

ত্রিকাল ॥ পুলিসকে খবর দেওয়া হয়েছে! (ভানুকে) কিন্তু তবু তুমি বাঁচবে না।

[ভানুকে গুলী করিবার জন্য ত্রিকাল রিভলবার তুলিয়া ধরিলেন।]

সুনন্দা ॥ বাবা—ওকে মারলে আমিও মরব।

[সুনন্দা বাডিসের ভিতরে লুক্কায়িত রিভলবার বাহির করিয়া নিজের কণ্ঠে লাগাইয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইল।]

ত্রিকাল ॥ I see you are in love. বিয়েটা তবে তোমার জীবনে সত্যি হয়েই দাঁড়াল মা! I did not expect it of you—সত্যি বলছি এটা আমি আশা করি নি—ভাবতে পারি নি।

সুনন্দা ॥ (ভানুর হাত ধরিয়া) প্রণাম কর। আমার বাবা।

[ভানু ও সুনন্দা উভয়ে ত্রিকালকে প্রণাম করিল।]

ভানু ॥ আমারই স্বীকারোক্তি পেয়ে পুলিস আসছে আমাকে ধরতে। আপনারা এখনই চলে যান—যদিও আমার স্বীকারোক্তিতে আপনাদের কাউকে আমি জড়াই নি।

ত্রিকাল ॥ That's like a brave boy. একথা আগে বললে—আমার হাতে রিভলবার উঠত না।

ভানু ॥ আপনারা আমার মৃত্যু চেয়েছিলেন মৃত্যুই হবে ফাঁসিকাঠে। লাইফ ইন্সিওরেন্সের পঁচিশ হাজার টাকা—সে সুনন্দাই পাবে। আপনাদের কারও কোন ক্ষোভের কারণ নেই।

সুনন্দা ॥ (অধীরভাবে) বাবা ওকে কি কিছুতেই বাঁচানো যায় না?

ত্রিকাল ॥ বাঁচবে। ও বেঁচে যাবে। যত স্বীকারোক্তিই করুক হত্যার কোন প্রমাণ ওর বিরুদ্ধে নেই। কিন্তু সুনন্দা—ও ফিরে এলে ওকে নিয়ে তোকে চলে যেতে হবে 'আনন্দমে'র বাইরে। যাদের বিবেক আছে, যাদের জীবনে আছে প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, মায়া, মমতা, মনুষ্যত্বের দুর্বলতা 'আনন্দমে' তাদের স্থান নেই। বিদায় ভানু—বিদায় মা। [ত্রিকাল বোসের প্রস্থান।]

ভানু ॥ বিবেক! প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, মায়া, মমতা, মনুষ্যত্বের দুর্বলতা—এসব কিন্তু একদিন ওঁরও ছিল।

সুনন্দা ॥ তোমারও আছে। কিন্তু যাদের এসব নেই তারাই আজ সুখী—তারাই আজ সমাজের মাথা, তাদেরই আজ রাজত্ব। (দরজায় বাহির হইতে ঘন ঘন করাঘাত।) কে?

ভানু ॥ পুলিস।…সুনন্দা, বিদায়।

[সুনন্দার হাত আবেগে টানিয়া লইয়া লইয়া বিদায় গ্রহণ করিল।]

সুনন্দা ॥ আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব চিরদিন—চিরকাল।

ভানু ॥ আর আমার দুঃখ নেই। (আগন্তুকের উদ্দেশ্যে।) Come in!

[কয়েকজন আর্মড পুলিসসহ একজন পুলিস অফিসারের প্রবেশ।]

॥ যবনিকা ॥

মন্মথ রায়

চাষীর প্রেম

রচনা-কাল :
২২-৫-৫৩ হইতে ২৩-৬-৫৩
প্রথম-প্রকাশ :
রঙ্গালয়
(মাসিক পত্র)
শারদীয়া সংখ্যা
১৩৬০

সোদরপ্রতিম

সুরসম্রাট শ্রীপঙ্কজ কুমার মল্লিক

শ্রীকরকমলেষু

সখ্যগর্বিত

মন্মথ রায়

মহালয়া :

১৩৬৩

২২৯সি, বিবেকানন্দ রোড

কলিকাতা-৬

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কল্যাণপুর। অর্জুন মণ্ডলের কুটীর প্রাঙ্গন। সময় দ্বিপ্রহর। অর্জুন মণ্ডলের স্ত্রী দুর্গা বাহির হইতে জলের কলসী লইয়া প্রবেশ করিয়া দাওয়ায় উঠিতে যাইবে, এমন সময় অর্জুনের বালকপুত্র লক্ষ্মণ একটা খাসীর দড়ি ধরিয়া দ্রুতপদে মাকে ডাকিতে ডাকিতে তথায় ছুটিয়া আসিল।

লক্ষ্মণ ॥ মা, মা, ঐ ছাখো, বুড়ো ভূতটা আবার এসেছে।

[দুর্গা দাওয়ার উপর জলের কলসীটি রাখিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল।]

দুর্গা ॥ ছিঃ লক্ষ্মণ! গুরুজনকে ভূত বলতে নেই—উনি তোমার দাদু।

[পথশ্রান্ত বৃদ্ধ পরাণ মণ্ডল ভিতরে প্রবেশ করিয়া কুটিরের দাওয়ায় বসিয়া পড়িলে দুর্গা সশব্যস্তে কলসী লইয়া অন্দরে চলিয়া গেল। লক্ষ্মণ খাসীটিকে দাদুর সম্মুখে লইয়া আসিল।]

লক্ষ্মণ ॥ (খাসীটিকে) দেখছিস্ না, কদ্দিন পরে দাদু এলো। নমো কর —নমো কর।

পরাণ ॥ নাঃ—তোর খাসীটার জৌলুস দেখছি দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

[বৃদ্ধের শুষ্ক দৃষ্টি লালসায় সজল ও তীব্র হইয়া উঠিল।]

লক্ষ্মণ ॥ তাইতো এটার নাম দিয়েছি রাজা।

পরাণ ॥ দা' টা নিয়ে আয় তো।

লক্ষ্মণ ॥ কেন দাদু ?

পরাণ ॥ ওকে কাটবো, খাবো। বড্ড খিদে পেয়েছে রে !

[বালক বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।]

লক্ষ্মণ ॥ আমার রাজাকে কাটবে ? বুড়ো ভূত ! মা বলে, গুরুজনকে ভূত বলতে নেই। গুরুজন না গরুজন !

[ভাতের থালা ও এক গেলাস জল লইয়া দুর্গা রান্না ঘরের বাহিরে আসিল।]

দুর্গা ॥ লক্ষ্মণ !

লক্ষ্মণ ॥ ছ্যাখোতো মা আমার রাজাকে কেটে খেতে চায় বুড়ো।

পরাণ ॥ ক্ষিদে তেষ্টায় প্রাণ যায়, তাই ঠাট্টা করছিলাম। যা শালা, যা,—ওকে আমি না খাই আর কেউ খাবে।

[দুর্গা ভাতের থালা ও জলের গেলাস শ্বশুরের সম্মুখে রাখিয়া দিল। পরাণ ব্যগ্রভাবে জলের গেলাসটী হাতে লইয়া পান করিতে উদ্যত হইয়াই হঠাৎ প্রশ্ন করিল—]

পরাণ ॥ এ কোন কুয়োর জল মা ? আমার সাবেক ভিটার ?

দুর্গা ॥ (ভয়ে ভয়ে) নতুন কুয়োর জল বাবা।

পরাণ ॥ নতুন কুয়োর জল ! খাবো না, খেতে হয় তোরা খা। বলিনি, যে-কটা দিন বাঁচি, আমায় সাবেক কুয়োর জল দিবি ?

দুর্গা ॥ মহাজন যে সাবেক কুয়ো থেকে জল আনতে দেয় না বাবা।

পরাণ ॥ মহাজন ভিটে-মাটি নীলেম করেছে বলে কী জলও নীলেম করে নিয়েছে ? আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

[পরাণ উঠিয়া দাঁড়াইল।]

দুর্গা ॥ বাবা আপনি যাবেন না। মহাজনের কাছে গিয়ে আমিই সাবেক কুয়োর জল ভিক্ষে করে আনছি।

পরাণ ॥ ভিক্ষে! ভিক্ষে কেন? মহাজন তো আমাকে বলেছিলো—যদ্দিন তুমি বাঁচবে এই জলই খেও পরাণ। তাই না আমি ভিটে ছেড়ে এসেছি। তোর কী? তোর সাত পুরুষতো ঐ ভিটেয় জন্মায়নি—মরেও নি। ওখানকার জলের মর্ম তুই কি বুঝবি?

[ক্রোধ ও ক্ষোভে আত্মহারা হইয়া বৃদ্ধ ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল। দুর্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তাহার গমন পথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল। লক্ষ্মণ বিস্মিত হইয়া কহিল—]

লক্ষ্মণ ॥ রাক্ষসটা না খেয়ে চলে গেল কেন মা?

দুর্গা ॥ ছিঃ বাবা! দাদুকে রাক্ষস বলতে নেই।

লক্ষ্মণ ॥ রাক্ষস নয় তো কি? আমার রাজুকে খেতে চায় কেন?

দুর্গা ॥ খুব বেশী ক্ষিদে পেয়েছিল তাই। কিন্তু সত্যি কি আর খেতেন! দেখলি তো ভাত চারটেও আর খেলেন না!

লক্ষ্মণ ॥ কিন্তু রাজুকে পেলে ঠিক খেতেন। তুমি দেখনি মা, ওর জিভটা লক লক করছিল—হ্যাঁ মা, তোমার আচার দেখে যেমন আমার জিভে জল আসে। আমরা চানে চললাম মা—চল ব্যাটা রাজা, আজ তোকে সাঁতার শেখাবো।

[খাসীটিকে টানিতে টানিতে লক্ষ্মণ চলিয়া গেল। অর্জুন বাহির হইতে আসিল।]

অর্জুন ॥ বাবাকে দেখলাম কী সব বকতে বকতে চলে গেলেন। (হঠাৎ ভাতের থালার দিকে দৃষ্টি পড়াতে) একী! না খেয়েই চলে গেছেন? হ্যাঁরে দুর্গা, ব্যাপার কী?

দুর্গা ॥ ব্যাপার আবার কী? সেই এক গোঁ—সাবেক কুয়োর জল চাই।

অর্জুন ॥ আমি তো তোকে বলেছি, নতুন কুয়োর জল দিয়েই বল—সাবেক কুয়োর জল।

দুর্গা ॥ মিথ্যে আমি বলতে পারবো না। আর বলে লাভও নেই—জল মুখে দিলেই তিনি বুঝতে পারেন। বাবার একবার খোঁজ করবে না?

অর্জুন ॥ মর্জি হলে তিনিই আসবেন, নইলে পায়ে ধরেও আমি তাঁকে আনতে পারবো না। খুঁজে লাভ কি? এখন এসো দেখি দুর্গ্‌গো ঠাকরুণ—

দুর্গা ॥ কোথায়?

অর্জুন ॥ গোলায় ধান তুলতে হবে:

দুর্গা ॥ খেয়ে নিয়ে তুলবো'খন! থাক্‌না এখন গাড়ীতেই।

অর্জুন ॥ না, না। এবার আমার ওই এক গাড়ীই ধান। তা এর ওপরও মহাজনের চোখ পড়েছে। গাড়ীতে ধান তুলে ক্ষেত থেকে যেই বেরিয়েছি, দূরে যেন দেখলাম মহাজনের গোমস্তা লোকজন নিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি আর ফিরে তাকাইনি। সে যা হেঁটে এসেছি, গরুর গাড়ীকে রেলগাড়ী চালিয়েছি। ও ধান মাড়াই করে গোলায় তুলে তালাচাবি না মারা পর্যন্ত আমার বিশ্বেস নেই—বিশ্বেস নেই।

দুর্গা ॥ তুমি একা—

অর্জুন ॥ একা—আমি! দশভূজা দুর্গাকে বিয়ে করেছিলাম কেন? চল—চল—দশ হাত হয়ে আমার সঙ্গে ধান নামাবি চল। নকুলকেও আসতে বলে এসেছি। ও বেচারাকে মহাজনের লোক তাড়া করেছে। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

দুর্গা ॥ তুমি এগোও, আমি ভাতের থালাটা তুলে রেখে আসছি।

[ভাতের থালা ও জলের গ্লাস তুলিয়া লইয়া দুর্গা ভিতরে চলিয়া গেল। অর্জুন বাহিরের দিকে যাইতেছিল, এমন সময়ে মহাজন আদালতের পিওনসহ সদলবলে তথায় আবির্ভূত হইল—পুরোভাগে মহাজনের গোমস্তা দুর্যোধন—সবার শেষে হতবাক পরাণ।]

মহাজন ॥ ওহে অর্জুন, তা দেখলাম গাড়ীতে তো বেশ সাজানোই রয়েছে। ও যেমন আছে, বেশ আছে। এখন গাড়ীটা হাঁকিয়ে চল আমার বাড়ী।

অর্জুন ॥ মানে?

দুর্যোধন ॥ (পিয়নের প্রতি) কইহে, বাবাজীবনকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দাও।

পিওন ॥ সাতশো পঁচাত্তর নম্বর টাকার মামলায় মহাজন যুধিষ্ঠির সামন্ত তোমার এই ধান অগ্রিম ক্রোক করেছে। এই ধান অগ্রিম ক্রোক হয়ে রইলো।

[আদালতের পিয়নের ইংগিতে জনৈক লোক ঢ্যাটরা দিতে লাগিল। উক্ত শব্দ শুনিয়া দুর্গা দ্রুতপদে রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া তথায় প্রবেশ করিল। আদালতের লোকজনসহ মহাজনকে দেখিয়া উহারা সমস্ত বিষয়টি উপলব্ধি করিল। একান্ত অসহায়ের মত দুর্গা ভয়ে ও দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল। আর বৃদ্ধ পরাণ মণ্ডল আশাভংগের নিদারুণ ক্ষোভের জ্বালায় বুকভাঙ্গা কান্নার নামান্তর—একপ্রকার অদ্ভুত অট্টহাসির শব্দে সকলকে সচকিত করিয়া মর্মস্পর্শী ও অসংলগ্ন ভাষায় যাহা ব্যক্ত করিল তাহা একমাত্র তাহার মতো হতভাগ্য কৃষকের পক্ষেই সম্ভব।]

পরাণ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ। তোকে সেদিন বলেছিলাম নারে অর্জুন, আমাদের ধান হয় খাসীতে খাবে, না হয় মহাজন খাবে। জমি যে চষবে সে খাবে না। যা বাবা, যা। গাড়ীতে ভালো করে সাজিয়ে দে। বল হরি—হরিবোল।

দুর্যোধন ॥ আ-মরণ! পাগলটার কাণ্ড দেখো।

পরাণ ॥ তা আমাকে এমনি করে কবে ক্রোক করবে বাবা? আমায় তোমার গাড়ীতে তুলে, আমার—না, না তোমার ভিটেয় নিয়ে মাটি দেবে? আমি যে সেইদিনটিরই পথ চেয়ে বসে আছি।

[হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।]

অর্জুন ॥ আদালতের পিওন। অগ্রিম ক্রোক। কিন্তু, কিন্তু—সারা বছর আমরা কি খাবো, মহাজন?

মহাজন ॥ সে ভাবনা ভাবিস্‌নে অর্জুন। আমি বেঁচে থাকতে তোদের দুমুঠো ভাতের অভাব হবে না। তবে ন্যায্য পাওনা ছেড়ে দিই কী করে বল? আদালত রয়েছে—অবিচার কিছু হবে না।

[অর্জুন হতাশভাবে বসিয়া পড়িল।]

মহাজন ॥ আরে যা, বসে পড়লি যে? আরে হবে হবে। তোদের বাঁচিয়ে না রাখলে আমি বাঁচবো কী করে?

পরাণ ॥ তোমার আমার ভালোবাসা
মুসলমানের মুর্গিপোষা
যেন হিঁদুর ঘরে পাঁঠা পোষা ॥

[ক্ষোভের হাসি হাসিতে হাসিতে পরাণের প্রস্থান।]

মহাজন ॥ তোমার বাপের মাথাটা দেখছি একেবারে গেছে। ভাল কব্‌রেজ দিয়ে চিকিৎসা করাও। কিন্তু শোন বাবা, তোমার নিজের জোতের ধান তো অগ্রিম ক্রোক হলো। আমাদের যে জোত ভাগচাষ করেছো, তাতে তোমার দেনা দাঁড়াচ্ছে ছ'মণ।

দুর্যোধন ॥ সোজা হিসেব।
কুড়োবা কুড়োবা কুড়োবা লিজ্জে।
কাঠায় কুড়োবা কাঠায় লিজ্জে ॥

বুঝলেতো?

অর্জুন ॥ থাক! থাক্, আপনাদের হিসেব আর এ জন্মে বুঝবো না। এখন কী নিচ্ছেন—নিন্, আর কী দিচ্ছেন—দিন।

মহাজন ॥ এইতো বাপের ব্যাটা! কথার মতো কথা! চল—

[সকলে বাহিরে চলিয়া গেল। অর্জুন যাইতে যাইতে ফিরিয়া দুর্গাকে ডাকিল—]

অর্জুন ॥ দুর্গা, দুর্গা।

[দুর্গা অন্তরালেই দাঁড়াইয়াছিল। অর্জুনের ডাক শুনিয়া সে বাহিরে আসিল।]

অর্জুন ॥ লক্ষ্মণকে তুই খাইয়ে দিস্। আমি ধানের গাড়ী নিয়ে মহাজনের বাড়ী চললাম।

[অর্জুন চলিয়া গেল।]

দুর্গা॥ আমি দুর্গা। আমার নাকি দশহাত! দশহাত দিয়ে আমার গোলায় আমি ধান তুলবো!

[উদ্‌গত অশ্রু রোধ করিতে পারিল না। চক্ষে অঞ্চল দিয়া দুর্গা দ্রুত অন্দরে চলিয়া গেল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য *

চৈত্রমাসে গ্রামে গাজনের মেলা বসিয়াছে। তাহারই একাংশ-পথ মেলাটি খুব জমিয়া উঠিয়াছে। কলিকাতা হইতে রতনবাঈজী নামে এক নামকরা বাঈজী মেলায় এক নাচের আসর বসাইয়াছে। রতনবাঈএর দলবল বাজনা বাজাইয়া মেলার পথে পথে ছড়া কাটিয়া প্রচারকার্য চালাইতেছে।

ক'লকাতার সেরা বাঈ
আমাদের রতন বাঈ
স্বর্গের অপ্সরী ভাই
যদি তার নাচ দেখ্‌তে চাস্‌।
(মরি মরি হায় রে)

আমাদের নেই তো মানা
খাবে যদি সে-বেলের পানা
টিকিট কিনে দু-দুয়ানা
ছেলে বুড়ো মেলায় তোরা যাস্‌।
(মরি মরি হায় রে)

* এই দৃশ্যের ছড়াগুলি শ্রীকানুরঞ্জন ঘোষের রচনা।

ভীড় জমিয়া গিয়াছে। তাহারা যখন চলিয়া গেল ভীড়ও তখন তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেল। এবার আসিল ফেরিওয়ালার একদল। দেখা গেল, সিঁন্দুর, আলতা, আয়না, চিরুণী, সাবান, ফিতে, মাথার কাঁটা, ক্লীপ, সুগন্ধি তৈল, প্রভৃতি মনোহারী জিনিষ তিনজন লোকে ফেরী করিয়া বিক্রয় করিতেছে। তাহাদের ঘিরিয়া কয়েকজন নরনারী, বালক বালিকা দাঁড়াইয়া আছে। কেহ কেহ কোন কোন জিনিষ কিনিতেছে। ফেরীওয়ালা দলের তিন জনের মধ্যে একজন জিনিষপত্র বেচিতেছে, অন্য একজন সুর করিয়া ছড়া কাটিতেছে ও তৃতীয় জন তাহার সহিত ঢোলক বাজাইতেছে।

মনোহারী জিনিস তোরা কে কিনবি
আমার কাছে।
সাবান, তরল আলতা, সিঁদুর,
মাথার কাঁটা কিলিপ আছে।
সতী-সিঁদুরের এমনি গুণ
যমরাজও হয় যে গুণ
সাবিত্রীর সোয়ামীরে
ছুঁতে পারেনা চিতের আঁচে॥

কিছু পরে ফেরীওয়ালার দল পূর্ববৎ ছড়া কাটিতে কাটিতে চলিয়া গেল। জনতাও কলরব করিতে করিতে তাহাদের অনুসরণ করিল। তাহাদের মধ্যে কেবল রুক্মিণী ঐ ভীড়ের মধ্যে না গিয়া বিপরীত দিকে ফিরিল। মেলা উপলক্ষ্যে গ্রাম্য কৃষকরমণীগণের মনে আজ আনন্দের বান ডাকিয়াছে—অপরূপ প্রসাধন ও বেশভূষা তাহাদের সর্বাঙ্গে। নিজ নিজ অলঙ্কার ও শাড়ী পরিয়া আনন্দ করিবার এমন সুবর্ণ সুযোগ আর তাহাদের কবে মিলিবে! সুসজ্জিতা রুক্মিণী বিপরীত দিকে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ দুর্গা-তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রুক্মিণী। আরে দুর্গা যে! কখন এলি মেলাতে?

দুর্গা॥ অনেকক্ষণ।

রুক্মিণী॥ তা ভাই, খালি হাতে যে! এখনো কিনিস নি কিছুই?

দুর্গা॥ কি আর কিনবো ভাই রুক্মিণী?

রুক্মিণী॥ আমিও ভাই তাই বলছিলাম। তোমার দেওরতো কিছুতেই শুনবে না।—এই গাজনের মেলাতে কী কিনছে, আর কী না কিনছে—বাসন থেকে শুরু করে মায় চুড়ি, আংটি, মাথার কিলিপ! নীলাম্বরীতে আমায় ভালো দেখায় বলে মিনসে এখন সারা মেলায় নীলাম্বরী খুঁজে বেড়াচ্ছে। পারিনে ভাই—আর সামলাতে পারিনে—

দুর্গা॥ হ্যাঁ, সে তো জানি—গণেশ ঠাকুরপো যে রুক্মিণী বলতে অজ্ঞান!

রুক্মিণী॥ হ্যাঁ, তুমি যেমন তোমার সোয়ামী বলতে অজ্ঞান। আমি তো, তাই বলি, রূপ ধুয়ে যদ্দিন পারিস জল খেয়ে নে। যাই ভাই, দেখি আবরা মেলাশুদ্ধ না কিনে বসে!

[রুক্মিণী যেদিক পানে যাইতেছিল, সেই দিক পানে চলিয়া গেল। বিপরীত দিকে দুর্গাও চলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ সেখানে অর্জুন আসিল।]

অর্জুন॥ লক্ষ্মণ কোথায় গেল? তাকে দেখছি না যে!

দুর্গা॥ ওই যে ওখানে নাগরদোলায় চাপতে গেছে।

[এমন সময় জনৈক ফেরীওয়ালাকে ছড়া কাটিতে কাটিতে খড়ম ফেরী করিয়া সেখান দিয়া যাইতে দেখা গেল।]

হরেক রকম
আছে খড়ম
ও বাবু, পারো বেছে নিতে।
নারদ মুনির খড়ম এ-যে
পায়ে প'রে বেড়াও সেজে
মনের সুখে স্বর্গ মর্ত চারিভিতে॥

তুচ্ছ নয় এ-খড়ম হায়
শ্রীরামচন্দ্র দিলেন পায়,
ভরত মাথায় রাখেন তায়—
ও বাবু, এমনি খড়ম
তাও পারি দিতে ॥

দুর্গা ॥ ও খড়মওয়ালা—শোনো—শোনো—

[খড়মওয়ালা থামিলে দুর্গা তাহার নিকটে গিয়া একজোড়া সুদৃশ্য খড়ম হাতে লইয়া দেখিতে লাগিল।]

অর্জুন ॥ একী, খড়ম দেখছিস যে?

দুর্গা ॥ হ্যাঁ, এমনি একজোড়া খড়মের আমার অনেক দিনের সখ।

অর্জুন ॥ খড়ম পরবি তুই? ও বাবা, কোন দিন হয়ত শুনবো মেয়েমানুষের গোঁফ—

দুর্গা ॥ পায়ে দাও তো—

অর্জুন ॥ তার মানে?—আমি—

দুর্গা ॥ পরোই না।

[অর্জুন খড়ম পায়ে দিলো। দুর্গা বসিয়া পড়িয়া পায়ে ঠিক হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিতে লাগিল।]

ফেরীওয়ালা ॥ ঠিক হয়েছে—চমৎকার মানিয়েছে মণ্ডলের পো।

দুর্গা ॥ কতো দাম?

ফেরীওয়ালা ॥ তা সস্তা করেই দিচ্ছি। খড়ম এর চেয়ে সস্তায় আর এ মেলায় পাবেন না। দেড়…

অর্জুন ॥ দেড়—আনা না টাকা?

[দুর্গা উঠিয়া দাঁড়াইল।]

ফেরীওয়ালা ॥ দেড় আনায় কাঠের খড়ম হয় না, একজোড়া খড়ের খড়ম হতে পারে।

অর্জুন ॥ বটে ! তাহলে থাক তোমার খড়ম। বুঝলি দুর্গা, আমি বরং জুতোই একজোড়া কিনবো। চল—

ফেরীওয়ালা ॥ ইস্ ! খড়ম কেনবার মুরোদ নেই—কিনবেন জুতো !

[পুনরায় ছড়া কাটিতে কাটিতে খড়মওয়ালা চলিয়া গেলে দুর্গা হতাশভাবে সেদিকে চাহিয়া রহিল।]

অর্জুন ॥ দাঁড়িয়ে রইলি যে ? কই চল—দেখি গিয়ে লক্ষ্মণের নাগরদোলা চাপা হোল কিনা ?

[এমন সময় দুইজন শাঁখারীকে ছড়া কাটিতে কাটিতে শাঁখা ফেরি করিয়া যাইতে দেখা গেল।]

তোরা ঢাকাই শাঁখা
কে নিবি গো, কে নিবি।
আছে শাঁখা সাদামাটা
মকর মুখো নক্সা-কাটা
মনের মতো শাঁখা পাবি
যে-যেমন পয়সা দিবি ॥
এ-শাঁখার দাম হয়না
কোথায় লাগে সোনার গয়না
মা-দুর্গার হাতে পরিয়ে শাঁখা
পাগল হ'ল বুড়ো শিবই ॥

অর্জুন ॥ ও শাঁখারী শোন—শোন—

[শাঁখারী দুইজন থামিলে অর্জুন তাহাদের দিকে আগাইয়া গেল।]

অর্জুন ॥ দেখি একজোড়া ভালো শাঁখা দেখি।

দুর্গা ॥ (অর্জুনের নিকট আসিয়া) না, আগে তোমার জুতো কেনো, তারপর শাঁখা কিনবো।

অর্জুন ॥ আগে শাঁখা কেন তারপর জুতো কিনবো। (শাঁখাগুলি দেখিতে দেখিতে) এই জোড়াটা দেখি—

দুর্গা ॥ না, না, এ জোড়া নয়, এতো খুব ভালো—অনেক দাম হবে—

অর্জুন ॥ আরে একজোড়া শাঁখা—তার আবার কতো দাম?

শাঁখারী ॥ ও সাঁচ্চা কাজ—আসল ঢাকাই—দাম সাড়ে তিন টাকা।

অর্জুন ॥ তা হোক্। আমার বেশ পছন্দ হয়েছে—তোকে পরতেই হবে দুর্গা।

[দুর্গার হাতে শাঁখা দিলে দুর্গা তাহা পরিতে লাগিল]

অর্জুন ॥ (শাঁখারীকে দাম দিতে দিতে) রাম, দুই, তিন—এই নিন সাড়ে তিন টাকা।

দুর্গা ॥ (অত দামে শঙ্কিত হইয়া) না, না, দাঁড়াও, এ আমার হাতে হচ্ছে না।

শাঁখারী ॥ হচ্ছে না? এইতো চমৎকার ফিট করেছে।

দুর্গা ॥ নাঃ আমার হাতে লাগছে।

অর্জুন ॥ কোথায় আবার লাগছে?

(অর্জুন দুর্গার হাত দুখানি ধরিয়া দেখিতে লাগিল।)

দুর্গা ॥ আমি বলছি লাগছে। (নিজ হাত হইতে শাখা খুলিয়া) আমায় বরং ওই জোড়াটা দিন।

অর্জুন ॥ ওতো বাজে জিনিষ,—ও আমার পছন্দ হয় না। তাহলে চল,—অন্য কারুর কাছ থেকে নিবি চল।

[অর্জুনকে দাম ফেরৎ দিয়া শাঁখারী দুজন চলিয়া যাইতেছে।]

শাঁখারী ॥ (যাইতে যাইতে সহকারীকে) লাগছে কোথায়, বুঝলে হে?

সহকারী ॥ তা আর বুঝিনি? হাতে নয়, লাগছে মোড়ল গিন্নীর ট্যাঁকে।

[উভয়ে চলিয়া গেল।]

অর্জুন ॥ লক্ষ্মণটা এখনও ফিরলো না যে! এইখানে তুই একটু দাঁড়াতো দুর্গা, আমি ওকে ডেকে নিয়ে আসি।

দুর্গা ॥ বাঃ, আমি একা একা দাঁড়িয়ে থাকবো?

অর্জুন ॥ একা আবার কেন? ঐ তো রুক্মিণী এদিকে আসছে। দাঁড়া এখুনি আসছি।

[অর্জুন অন্যদিকে চলিয়া গেল। বিপরীত দিক হইতে রুক্মিণী আসিল।]

রুক্মিণী ॥ কী ভাই, শাঁখা কিনলে বুঝি?

দুর্গা ॥ না ভাই, পছন্দ হোল না।

রুক্মিণী ॥ (নিজের হাত দেখাইয়া) আমার এই শাঁখাও পছন্দ হয় না?

দুর্গা ॥ তা হয়তো হতো, কিন্তু হাতে লাগলো না।······ওমা, ঐতো লক্ষ্মণ।

[লক্ষ্মণ দৌড়াইয়া আসিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল।]

লক্ষ্মণ ॥ মা! মা! আমায় একটা বাঁশী কিনে দাও না মা।

দুর্গা ॥ কোথায় বাঁশীরে লক্ষ্মণ?

লক্ষ্মণ ॥ ওই যে ওখানে বসেছে। চল না মা, একটা কিনে দেবে।

দুর্গা ॥ না জানি কত দাম! ওসব কী আর ছুঁতে পারবো বাবা? বরং চল, তোকে বাঁদর-নাচ দেখাচ্ছি। কী মজা দেখবি চল।

[লক্ষ্মণকে লইয়া দুর্গা চলিয়া গেল। রুক্মিণীও বিপরীত দিকে চলিয়া গেল। কিছু পরে পূর্বোক্ত শাঁখারী দুইজন আগের মতোই ছড়া কাটিতে কাটিতে এই পথ দিয়া পুনরায় চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের পিছনে পিছনে অর্জুন আসিয়া ডাকিল।]

অর্জুন ॥ ও শাঁখারী—ও শাঁখারী—

[শাঁখারী দুইজন থামিলে অর্জুন তাহাদের নিকট আসিল।]

অর্জুন ॥ ঐ যে তখন যে শাঁখা জোড়াটা দেখিয়ে ছিলেন—আমার পরিবারের হাতে চমৎকার মানিয়েছিল—সেই শাঁখা জোড়া দিন তো।

সহকারী ॥ কেন, অন্য কোথাও পাওয়া গেল না বুঝি?

অর্জুন ॥ না মশাই, পাওয়া গেল না। ওই জোড়াই নিতে হবে। এই নিন্ সাড়ে তিন টাকা।

[অর্জুন টাকা দিয়া পূর্বোক্ত শাঁখা জোড়াটি লইলে শাঁখারী দুইজন ছড়া কাটিতে কাটিতে চলিয়া গেল। অর্জুন শাঁখাজোড়া হাতে লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল।]

অর্জুন॥ (আপনমনে) খাসা মানাবে দুর্গার হাতে। ও সঙ্গে থাকলে কি আর কেনা যেত! উঃ কি ভীষণ কিপ্টে দুর্গা!

[শাঁখাজোড়া লুকাইয়া রাখিয়া উৎফুল্লমুখে অর্জুন চলিয়া গেল। বিপরীত দিক দিয়া পূর্বোক্ত খড়মওয়ালাকে ছড়া কাটিতে কাটিতে আসিতে দেখা গেল। জনৈক গ্রাম্যব্যক্তি সেখান দিয়া যাইতেছিল।]

গ্রাম্যব্যক্তি॥ ও খড়মওয়ালা, বাচ্চা ছেলেদের ছোট খড়ম আছে নাকি?

খড়মওয়ালা॥ আজ্ঞে না কত্তা।

[গ্রাম্যব্যক্তি চলিয়া গেল। খড়মওয়ালাও যেই চলিয়া যাইতে গেল, অমনি দুর্গা ব্যস্তভাবে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।]

দুর্গা॥ এই যে খড়মওয়ালা—তোমাকেই খুঁজছিলুম। সেই খড়মজোড়াটা দাও দিকিন—সেই যে তখন যেটা দেখিয়েছিলে…দেড় টাকা দাম।

খড়মওয়ালা॥ কেন? ওই দামে জুতো মিললো না বুঝি?

দুর্গা॥ না, আমার ওই খড়ম জোড়াটাই চাই। (এদিক ওদিক একবার দেখিয়া লইয়া) কই, তাড়াতাড়ি দাও।

[খড়মওয়ালা পূর্বোক্ত খড়মজোড়াটি দিলে দুর্গা তাহা লইয়া আঁচল হইতে টাকা বাহির করিয়া দিল। খড়মওয়ালা আবার ছড়ার সুর ধরিয়া চলিয়া গেল। দুর্গা খড়মজোড়াটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল।]

দুর্গা॥ (আপনমনে) ওর পায়ে মানাবে ভালো। ওঃ ওকে লুকিয়ে খুব জোর খড়ম জোড়া কেনা গেছে। যা কিপ্টে মানুষ!

[এমন সময় দূর হইতে অর্জুনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—]

অর্জুন॥ লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ—

[দুর্গা তাড়াতাড়ি খড়ম জোড়াটি লুকাইয়া ফেলিল। অর্জুন আসিল।]

অর্জুন ॥ এই যে, তুমি এখানে, তোমাকে গরু খোঁজা খুঁজছি। লক্ষ্মণ গেল কোথায় ?

দুর্গা ॥ ওই বটগাছটার তলায় বাঁদর নাচ দেখছে।

[দূরে ঢাক ও কাঁসির শব্দ শোনা গেল, উভয়েই সেই দিকে চাহিল।]

অর্জুন ॥ দ্যাখ দ্যাখ, বাবার কাণ্ডটা দ্যাখ, বুড়ো বয়সে শিব সেজে গাজনের নাচে মেতেছে, আবার পাশে একটা দুগ্‌গাকেও জুটিয়েছে !

দুর্গা ॥ ছিঃ ছিঃ! কি লজ্জার কথা! চল—চল—লক্ষ্মণকে ডেকে নিয়ে আমরা বাড়ী চলে যাই।

অর্জুন ॥ চল।

[দুর্গা ও অর্জুন চলিয়া গেল। বিপরীত দিক হইতে গাজনের দল আসিল—পার্বতী-বেশধারিণী নৃত্যগীত শুরু করিল। শিববেশী পরাণ মণ্ডল তাহার সহিত তালে তালে অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিল। ঢাক ও কাঁসি বাজিতেছে। পথচারীরা মাঝে মাঝে পরাণ মণ্ডলের হাতে পয়সা দিতেছে। পার্বতীর গাজনের গান—]

আমি কাল যা'ব বাপের বাড়ী,
মাথা বেঁধে দে মা শাশুড়ী।
বড়দাদা নিতে এসে
করে গেছে মনভারী,
ছোটদাদার বিয়ে হবে
ভাজতে হবে খই মুড়ি।

তৃতীয় দৃশ্য

অর্জুন মণ্ডলের কুটির প্রাঙ্গণ। কাল—সন্ধ্যা। বারান্দায় একটি লণ্ঠন ঝুলিতেছিল। দুর্গা তুলসীতলায় সন্ধ্যা প্রদীপ রাখিয়া গললগ্নী কৃতবাসে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এমন সময়ে রুক্মিণী সেখানে আসিল।

রুক্মিণী ॥ কীগো মোড়ল গিন্নী, মেলা থেকে পালিয়ে এলে যে?

দুর্গা ॥ পালিয়ে আসব কেন ভাই? দেখা-শোনা হয়ে গেল,—চলে এলাম। তাছাড়া সন্ধ্যে দিতে হবে তো।

রুক্মিণী ॥ তোমার মিনসের এ সব জ্ঞান আছে—বললে ছেড়ে দেয়। আমারটি গোঁয়ার গণেশ। বলে, সন্ধ্যে হবে'খন। কলকাতা থেকে মেলায় রতনবাঈজী এসেছে। এমন নাচ নাকি নাচছে, যে দেখছে মাথা ঘুরে যাচ্ছে। সেই নাচ কাল মিনসে দেখেছে। বাঈজীর পরণে ছিল ময়ুরপঙ্খী সাড়ী। ওমা! বলে কি না সেই সাড়ী আমায় কিনে এনে দেবে—মেলাতে নাকি উঠেছে। তিরিশ টাকা দাম—কিন্তু ভাই না কিনে ছাড়লো না। ছ্যাখ দেখি ভাই, মিনসের কাণ্ড ছ্যাখ!

[সাড়ীখানি বাহির করিয়া দেখাইল।]

দুর্গা ॥ কেন? এ-তো বেশ হয়েছে। রতনবাঈজীকে দেখতে পাবো কিনা জানিনে। তোমাকে দেখেই ভাই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবো। কিন্তু তোমার কর্তার জন্যে তুমি কি কিনলে ভাই?

রুক্মিণী ॥ কি আর কিনবো? আমার সব কিনতেই টাকা ফুরিয়ে গেল। আর বলেতো, রুক্মিণী, তুই খুসী হলেই আমি খুসী। মানুষটিকে জানোতো? না ভাই আর দাঁড়াবো না। কত্তা কোথায়?

দুর্গা ॥ গা ধুতে গেছেন।

রুক্মিণী ॥ আর লক্ষ্মণ?

দুর্গা ॥ গুরুমশায়ের কাছে পড়তে গেছে।

রুক্মিণী ॥ মেলায় বাঁশীর জন্যে এতো কান্নাকাটি! ধন্যি মা তুমি। একটা বাঁশী কিনেও তো দিতে পারতে।

দুর্গা ॥ না ভাই, তা পারতাম না। ও যে বাঁশীটা চেয়েছিল, তার দাম পুরো একটি টাকা। জানোতো একটা টাকার দাম আমাদের কাছে অনেক! ওর পড়ার সব বই-ই এখনও কিনে দিতে পারি নি।

রুক্মিণী ॥ নাও ভাই, এই বাঁশীটা ওকে দিও।

দুর্গা ॥ হাতে করে তুমিই দিও বোন। কতো খুসী হবে। আমি জানি, ছেলেটাকে তুমি কতো ভালোবাসো। ওর সব আব্দার যখন মেটাতে পারি না, ভালো করে দুমুঠো যখন খেতে দিতে পারি না—তখন কেবলই মনে হয়, তোর পেটে না এসে ও কেন আমার পেটে এলো!

রুক্মিণী ॥ আমিও তাই ভাবি দুর্গা, আমিও তাই ভাবি। চলি।—

[রুক্মিণী চলিয়া গেল। অর্জুন ভিতর হইতে বাহিরে আসিল।]

অর্জুন ॥ বৌঠানের গলা পেলুম যেন মনে হোল।

দুর্গা ॥ হ্যাঁ।

অর্জুন ॥ গণেশদার কাণ্ডতো আর দেখনি। পারে তো, বাজারশুদ্ধ কিনে দেয়।

দুর্গা ॥ পারে বলেই দেয়।

অর্জুন ॥ তা বৈকি! আমরা কিছুই পারি না।

দুর্গা ॥ তাতেই বা দুঃখ কী? যেটুকু পারি সেই আমাদের লাখ টাকা।

[দুর্গা তুলসীতলা হইতে খড়ম জোড়াটী লইয়া আসিল।]

দুর্গা ॥ মণ্ডলমশাই, এবার পায়ে দিনতো।

অর্জুন ॥ একী! সেই খড়ম? তুমি কিনেছো? ও বুঝেছি—সুতো বিক্রী করে। কেন কিনলে?

[অর্জুন খড়ম পায়ে দিল।]

দুর্গা ॥ বাঃ বেশ হয়েছে, দিব্বি মানিয়েছে ! স্থতো কাটা আমার সার্থক হোলো।

[দুর্গা অর্জুনকে প্রণাম করিল। অর্জুন তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া ট্যাক হইতে শাঁখাজোড়া বাহির করিয়া বলিল—]

অর্জুন ॥ মণ্ডল গিন্নী এবার পরুন তো !

দুর্গা ॥ একী ! সেই শাঁখা ? তুমি কিনেছো ? কিন্তু এতো দাম দিয়ে কেন কিনলে ?

অর্জুন ॥ এমনি—

দুর্গা ॥ তা জিনিষটা কিন্তু ভারী স্থন্দর। দেখে আমার সত্যি সখ হয়েছিলো।

[দুর্গা শাঁখা পরিল। উভয়ে উভয়ের দিকে তৃপ্তির সহিত তাকাইল। এমন সময় নেপথ্য হইতে গ্রামের চাষী বন্ধুদের গলা পাওয়া গেল।]

প্রথম ॥ অর্জুন ভাই—আমরা সব আসছি।

[দুর্গা সলজ্জ ভাবে মাথার ঘোমটা টানিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।]

অর্জুন ॥ আরে, এসো এসো, হলধর দা যে ! তোমরা আসবে—তা এতো হাঁক ডাক কেন ? সব ভদ্দরলোক হয়ে গেছো দেখছি।

[তিন চারিজন চাষী আসিল।]

প্রথম ॥ ভদ্দরলোক হব না ? সহর থেকে বাঈজী এসেছে। গ্রাম যে সহর হয়ে গেছে হে !

[দুর্গা আসিয়া একখানি মাদুর পাতিয়া দিল।]

অর্জুন ॥ বসো, বসো,। বৌ ! নতুন তাসজোড়া—

দ্বিতীয় ॥ না হে না, আজ আর তাস-টাস নয়। তাই বলে বৌমা পান-তামাকটা বাদ দিও না !

[দুর্গা ভিতরে চলিয়া গেল।]

অর্জুন ॥ কিন্তু তাসটা বাদ যাচ্ছে কেন ?

তৃতীয় ॥ রাখো তোমার তাস্। আঃ মাইরি কী গানই গাইলে! একেবারে রঙের তুরুপ করে দিলে হে!

চতুর্থ ॥ রতনবাঈ-এর চেয়ে বড়ো বাঈজী আজকাল কলকাতাতেও নেই।

প্রথম ॥ না, তা' বলতে পারো না। কলকাতায় যাতায়াত তো রয়েছে। এর চেয়ে বড়ো ঢের ঢের আছে। তবে হ্যাঁ, এমন চেহারা নেই।

অর্জুন ॥ বাঈজীতো শুনেছি ভালো! গান জমেছে কেমন? সঙ্গত কী রকম?

দ্বিতীয় ॥ আরে, রাখো তোমার সঙ্গত। মুখখানা দেখলেই পয়সা উশুল।

অর্জুন ॥ পয়সা থাকলে, তবেতো উশুল। পয়সা যখন নেই, তখন আমাদের ভাই ও শুনেই সুখ। তা' তোমরা তো সব নাচ দেখে এলে। বলি সঙ্গত কেমন দেখলে হে—তবলা? ক্ল্যারোট বাজনা—কলের বাঁশী আছেতো?

তৃতীয় ॥ তবলা তো থাকবেই। তবলা ছাড়া কী নাচ হয়? বাজালেও 'যা, সে চমৎকার! কিন্তু কলের বাঁশী মানে, তোমার ওই ক্ল্যারোটতো দেখলাম না!

দ্বিতীয় ॥ (অর্জুনকে) যাওনা ভায়া, তোমার ক্ল্যারোট বাজনার কেরামতিটা বাঈজীকে একবার দেখিয়ে এসো।

প্রথম ॥ হাাঃ! বাঈজীর কাছে যাওয়া অতো সোজা না। বাঈজীদের ব্যাপারই হচ্ছে,—ফ্যালো কড়ি মাখো তেল।

অর্জুন ॥ তা ঠিকই বলেছো। (ম্লান হাসিয়া) পয়সা যাদের নেই, তাদের আবার সখ,…তাদের আবার সুখ। বুঝলে ভাই, চাষবাস করে চাষীর আর চলবে না। আর কোনো পথ ধরতে হবে এখন।

[এমন সময় বাহির হইতে জমিদারের গোমস্তার ডাক শোনা গেল—]

গোমস্তা ॥ মণ্ডলের পো ঘরে আছো নাকি হে? ও মণ্ডলের পো—

প্রথম ॥ সর্বনাশ হয়েছে। জমিদারের গোমস্তা।

দ্বিতীয় ॥ হ্যাঁ, জমিদারের গোমস্তা!

[সকলে উঠিয়া পড়িল। সকলের মুখেই ভীতির চিহ্ন। বাহির হইতে গোমস্তা আবার ডাক দিল—]

গোমস্তা ॥ ও মণ্ডলের পো !

তৃতীয় ॥ আরে, এসে পড়লো যে ! পালাও-পালাও—

[তৃতীয় চাষী পালাইতে গেলে চতুর্থজন তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—]

চতুর্থ ॥ আরে দাদা, পালাবে কোথায় ? সামনেই যমদূত ! এইখানেই কোথাও এসো লুকিয়ে পড়ি।

[অর্জুন ব্যতীত অন্যান্য চাষীরা আশেপাশে লুকাইল। এমন সময় জমিদারের গোমস্তা আসিয়া হাজির !]

গোমস্তা ॥ কী হে মণ্ডলের পো ! বলি সন্ধ্যে রাতেই ঘুমিয়ে পড়ছিলে নাকি ? ডেকে গলা ফেটে গেল যে !

অর্জুন ॥ না খুড়ো, ঘুমোইনি। এইতো, মেলা থেকে ফিরলুম। তোমার ডাক শুনেই ঘর থেকে বেরিয়েছি।

গোমস্তা ॥ আজ দেখছি তোমাদের তাসের আড্ডা এখনও বসেনি। এমনিতেইতো কারুর টিকিটি দেখতে পাওয়া যায় না। বাকী খাজনা দেবার ভয়ে সবাইতো গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছ। ভাবলুম এই তাসের আড্ডায় সবকটাকে একসঙ্গে পাকড়াও করব। তা হ্যাঁ হে মণ্ডলের পো, বলি তিন কিস্তি খাজনা বাকী পড়েছে, সেদিকে হুঁস আছে ? খাজনা দেবার তো নামটি নেই, অথচ দেখলাম মেলায় গিয়ে ফুর্তি করবার বেলায় তো টাকা ঠিক জোটে। এখনি পনেরোটি টাকা ফেলে দিয়ে বাকী খাজনাটা মিটিয়ে দাও।

অর্জুন ॥ বিশ্বাস করো খুড়ো, আমার হাতে এখন একটি টাকাও নেই। আজ রাতে যেমন করে হোক টাকা জোগাড় করে কাল ভোরে গিয়ে আমি বাকী খাজনা মিটিয়ে দিয়ে আসবো।

গোমস্তা ॥ বলি, কালকে চোত মাস কাবার·সেটা খেয়াল থাকে যেন।

কালকে যদি জমিদার-সরকারে বাকী খাজনা আদায় না দাও, তাহলে তোমার নামে তামাদির মামলা দায়ের করে তোমায় ভিটে মাটী ছাড়া করা হবে।

অর্জুন॥ না, না, খুড়ো। তুমি দেখে নিও, কথার আমার নড়চড় হবে না। বাপের ভিটে একবার গেছে, এ ভিটেটুকু গেলে বৌ-ছেলে নিয়ে দাঁড়াবার আর পথ থাকবে না।

গোমস্তা॥ হ্যাঁ, গাছতলায় দাঁড়াতে হবে—মনে থাকে যেন।

[গোমস্তা চলিয়া গেল। অর্জুনের চাষীবন্ধুগণ লুক্কায়িত স্থান হইতে একে একে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, হঠাৎ গোমস্তা আবার ফিরিয়া আসিল।]

গোমস্তা॥ আর ছাখো মণ্ডলের পো—

[অতর্কিতে গোমস্তা সন্মুখে আসিয়া পড়ায় চাষীগণ বেকায়দায় পড়িয়া গেল। কোন রকমে এধার ওধার দিয়া পালাইল। একজন তো গোমস্তার দু পায়ের ফাঁক দিয়া সরিয়া পড়িল।]

গোমস্তা॥ এই যা—সব হাওয়া! আরে, আরে, পালিয়ে বাঁচবে ভেবেছ? আমার চোখে ধূলো দিয়ে কোথায় পালাবে বাছাধনরা! দাঁড়াও তোমাদের মজা দেখাচ্ছি আজ—

[গোমস্তাও ক্ষিপ্রপদে তাহাদের অনুসরণ করিল। ফাঁক পাইয়া পরাণ মণ্ডল আসিল। তাহার সর্বাঙ্গে চুণ কালি মাখা।]

পরাণ॥ বাবারে বাবা, জমিদারের গোমস্তা তো নয় একেবারে সাক্ষাৎ যমদূত। তা তুই শালা যমদূত—আমিও শালা শিব।

অর্জুন॥ এই বুঝি মেলা থেকে ফিরছো?

পরাণ॥ ফিরেছি তো অনেকক্ষণ! বাড়ীতে ঢুকতে যাচ্ছি, অমনি দেখি যমদূত দাঁড়িয়ে রয়েছে উঠোনে। থাকতো যদি ত্রিশূলটা শালাকে গয়ায় পাঠাতুম আজ।

অর্জুন ॥ সারা গায়ে চুণকালি মেখে ভূত সাজতে তোমার লজ্জাও করে না!

পরাণ ॥ ভিটে মাটি খুইয়েছি—শ্মশানে-মশানে আমার বাস—আমার আবার লজ্জা! গাজনের মেলায় সারাদিনভোর শিবের নৃত্য নেচেছি। প্রণামী পেয়েছি। আজ কতো রোজগার শুনবি? পাঁচ টাকা। হ্যাঁরে, নগদ পাঁচ টাকা। কী দেশরে বাবা! চাষবাস করো,—জমিদার, মহাজন লুটে খাবে। শিব সেজে ব্যোম-ভোলানাথ হয়ে গাঁজায় মারো দম, সেই ব্যাটারাই এসে ভক্তিভরে পায়ের ধুলো নেবে,—কাঁড়ি কাঁড়ি পয়সা দেবে আর বলবে—"ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর কর বাবা।" নে বাবা, এই পাঁচটা টাকা নে। তোর মুখখানির দিকে আমি আর তাকাতে পারিনা বাবা। আমি আবার যাচ্ছি।

[অর্জুনকে টাকা দিয়া পরাণ বাহিরে চলিয়া গেল। অর্জুন টাকা কয়টি হাতে লইয়া ভাবিতে লাগিল।]

অর্জুন ॥ পাঁচটাকা। এখনো দশ টাকা জোগাড় করতে হবে। কিন্তু কী করে হবে! (খানিক ভাবিয়া) দুর্গা—দুর্গা—

[দুর্গা অন্তরালেই দাঁড়াইয়াছিল। ডাক শুনিয়া সে বাহিরে আসিল।]

দুর্গা ॥ কী গো? জমিদারের লোক এসে কী বলে গেল?

অর্জুন ॥ সর্বনেশে ব্যাপার। কাল ভোরে জমিদার-সেরেস্তায় পনেরো টাকা দাখিল করতে না পারলে এ ভিটেটুকুও থাকবে না।

দুর্গা ॥ আড়াল থেকে দেখেছি, শুনেছি। বাবাতো পাঁচ টাকা দিয়ে গেলেন, ও দিয়ে থামানো যায় না?

অর্জুন ॥ না না, তা তারা শুনবে না। তোদের নিয়ে গাছতলাতে গিয়েও দাঁড়াতে পারবো না। আজ রাতে টাকা চাই-ই। শোন—(কী বলিতে গিয়ে অর্জুন বলিতে পারিল না) থাক।

দুর্গা ॥ বুঝেছি। বিয়ের পর তোমার দেওয়া সোনার সেই চুড়িজোড়া চাইছো তো?

অর্জুন ॥ হ্যাঁ, দে। আমি আবার তোকে গড়িয়ে দোব।

দুর্গা ॥ না। সে আমি দিতে পারবো না। বরং গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াবো, তবু না।

অর্জুন ॥ তবু না?

দুর্গা ॥ হ্যাঁ, তবু না। গাছতলায় গিয়ে বরং দাঁড়ানো যায়, কিন্তু পেটের ভাতওতো চাই। ভাতের অভাবে সব শুকিয়ে কুঁকড়ে মারা যাবে, সেতো আমি দেখতে পারবো না। চুড়ি জোড়া যদ্দিন আমার আছে, আমার সেই ভাবনাটা নেই। চুড়ি আমি হাতছাড়া করবো না।

অর্জুন ॥ হুঁ। লক্ষ্মণ কোথায়?

দুর্গা ॥ পড়তে গেছে।

অর্জুন ॥ এতো রাতেও ইস্কুল?

দুর্গা ॥ ওদের তো তাই হয়।

অর্জুন ॥ ওর খাসীটা কোথায়? বেঁধেছ?

দুর্গা ॥ বেঁধেছি। কিন্তু না, ও খাসীও আমি তোমায় বেচতে দেবো না। ও খাসী বেচলে লক্ষ্মণ আমার বাঁচবে না। দেখছো তো, খাসীটা ওর প্রাণ।

অর্জুন ॥ বেশ, থাক। তোর সখের জিনিষ বেচতে পারবো না, ছেলের সখের জিনিষ বেচতে পারবো না,—তা' যখন পারবো না, তখন নিজের সখের জিনিষটাই বেচবো।

[অর্জুন ছুটিয়া ভিতরে চলিয়া গেল এবং পরক্ষণেই একটি ক্ল্যারিওনেট লইয়া আসিয়া বাহিরে ছুটিয়া যাইবে, এমন সময়ে দুর্গা ডাকিল—]

দুর্গা ॥ ওগো, শোনো, শোনো—

[অর্জুন ফিরিয়া দাঁড়াইল।]

অর্জুন ॥ কি?

[দুর্গা ছুটিয়া গিয়া অর্জুনের হস্তস্থিত ক্ল্যারিওনেটটি ধরিল।]

দুর্গা ॥ এটাও তুমি বিক্রি করতে পারবে না। আম দেবো না। তোমার বাঁশীর বাজনা শুনে খুসী হয়ে জমিদারবাবুর মেজোছেলে তার নিজের এতো দামী

এই কলের বাঁশীটা তোমায় বখশিস্ দিয়েছিলেন। এতো যে দুঃখ কষ্ট তাও ভুলে থাকি, যখন সকল কাজের শেষে—দিনের শেষে—ঘরে বসে তুমি এটা বাজাও।

অর্জুন ॥ (দুর্গাকে ঠেলিয়া দিয়া) থাক্ হয়েছে। লোকে বলে, পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ী! তোমার হয়েছে তাই।

[অর্জুন চলিয়া গেল। দুর্গা পাষাণ মূর্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।]

চতুর্থ দৃশ্য

রতনবাঈজীর তাঁবুর অভ্যন্তর। কাল—রাত্রি। রতনবাঈ স্নানান্তে আয়না সম্মুখে রাখিয়া প্রসাধন করিতেছিল। সহচরী যমুনা তাহার চুল বাঁধিয়া দিতেছিল। এমন সময় জহর তাঁবুর বাহির হইতে হাঁকিল—

জহর ॥ দিদিমণি, আসতে পারি?

রতন ॥ (যমুনাকে) ঢং ভ্যাখ যমুনা। আসতে না বললে যেন আসবে না।

যমুনা ॥ যা বলেছো। নিষ্ঠা দেখে বাঁচিনা।

জহর ॥ (বাহির হইতে) না, না বাইরের লোক সঙ্গে রয়েছে কিনা।

[রতন ও যমুনা সংযত হইয়া বসিল।]

রতন ॥ বাইরের লোক নিয়েইতো আমাদের কারবার, ঘরের লোক আর কোথায় পেলাম? এসো ভাই, এসো—

[রতন ও যমুনা অভ্যর্থনা করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। অর্জুনকে সংগে লইয়া জহর, মানিক ও হুয়া ভিতরে আসিল। রতনবাঈ অর্জুনকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাহার দোসরদের প্রতি বিস্মিতদৃষ্টি হানিল।]

রতন ॥ (অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া) ইনি কিনি? এতো রাতে বাঁশী হাতে —ব্যাপার কী?

হুয়া ॥ ইনি হলেন গিয়ে অর্জুন কিষাণ—এ গাঁয়ের তানসেন।

অর্জুন ॥ না, না, তানসেন-টানসেন কিছুই নই। আমি মাটি কোপাই, চাষ করে খাই। মাঝে মাঝে একটু-আধটু গান-বাজনা করি। আপনিই তো রতনবাঈ?

রতনবাঈ ॥ কেন? আমার নাচ দেখনি তুমি?

অর্জুন ॥ নাচ দেখতে পয়সা লাগে। আমার তা নেই।

জহর ॥ তা নেই। কিন্তু ওই ক্ল্যারিওনেটটাতো বেশ বাগিয়েছ বাবা।

অর্জুন ॥ না, না, চোরাই মাল নয়।

[সকলে হাসিয়া উঠিল]

অর্জুন ॥ বিশ্বাস করুন—আমি বলছি—আমার বাঁশের বাঁশীর বাজনা শুনে খুসী হয়ে জমিদারবাবুর মেজোছেলে এটা আমায় বখশিস্ করেছেন।

রতন ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমারা বিশ্বাস করছি। কেন করবো না? কিন্তু এতো রাতে এখানে কেন?

অর্জুন ॥ এই বাঁশীটা আপনাকে কিনতে হবে।

[রতনবাঈ-এর দোসরগণ ও যমুনা একযোগে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

অর্জুন ॥ আপনারা হাসছেন। জানেন না আপনারা—কী দায়ে পড়ে এই বাঁশীটা আপনাদের কাছে এতো রাতে বিক্রি করতে এসেছি। দোহাই আপনাদের—এই বাঁশীটা নিন্।

জহর ॥ আরে ব্যাটা বেল্লিক, পাগলামির আর যায়গা পাওনি? আমি ভেবেছিলাম বাঁশীটা এনেছে বাঈজীকে প্রেজেণ্ট দিতে। যেমন আজ সকালে আর এক মোড়লের পো বাঈজীর নাচ দেখে খুসী হয়ে আমাকে তার ছ' ব্যাটারী টর্চটা দিয়ে গেল। ভালো চাওতো বাপু, বাঁশীটা রেখে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

অর্জুন ॥ না, তা পারবো না।

মানিক ॥ পারবোনা বললেই হোলো? বেরোও—বেরোও—

রতন ॥ (হঠাৎ চটিয়া গিয়া) এই থামো। এসব কী হচ্ছে? যাও তোমরাই বেরিয়ে যাও।

[দোসরত্রয় দমিয়া গেল ও চলিয়া গেল।]

রতন ॥ (অর্জুনের প্রতি) আমাকেই কিনতে হবে? কিন্তু আমার তো ক্ল্যারিওনেটের দরকার নেই।

অর্জুন ॥ আমার টাকার খুব দরকার। আর এ বাঁশীটা খুব ভালো—আমি জোর গলায় বলছি।

যমুনা ॥ নাও দিদি—অতো করে বলছে!

রতন ॥ (মৃদু হাসিয়া) নিজের জিনিষ সবাই তো ভালো বলে।

অর্জুন ॥ না, না, তা নয়, সত্যিই ভালো বাঁশী—ভারী মিষ্টি আওয়াজ।

রতন ॥ বটে—কী করে বুঝবো?

[অর্জুন বাজাইতে সুরু করিল। বাঈজী পাকা লোক, বাজনা শুনিয়া কিছুক্ষণেই সে বুঝিল, এ বিদ্যায় সে সত্যই পারদর্শী। তাই এই নবাগত দরিদ্র শিল্পীর প্রতি তাহার মনটা দরদে ভরিয়া উঠিল।]

রতন ॥ থাক্‌, আর বাজাতে হবে না।

[অর্জুন বাজনা থামাইল।]

রতন ॥ ওইটুকু বাজনাতেই বুঝেছি, সত্যি খুব ভাল বাঁশী। আরো ভালো তোমার হাত। বাঁশী আমি নিচ্ছি—সেই সঙ্গে তোমাকেও আমি চাই।

অর্জুন ॥ (সাশ্চর্যে) আমাকে!

রতন ॥ হ্যাঁ, তোমাকে। তুমি না হলে জমবে না।

অর্জুন ॥ তার মানে?

রতন ॥ মানেটা তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। বসো।

[রতন যমুনার কানে কানে কি বলিলে যমুনা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।]

রতন ॥ আচ্ছা, তারপর বল দেখি তোমার বাঁশীটার কত দাম ?

অর্জুন ॥ বললুম তো, ওটা আমি কিনিনি। জমিদার বাবুর মেজো ছেলে আমায় বখশিস্ করেছেন।

রতন ॥ বেশ, আমি কুড়ি টাকা দেবো।

অর্জুন ॥ কুড়ি! এতো!

রতন ॥ (ব্যাগ হইতে টাকা বাহির করিয়া) হ্যাঁ,—নাও।

অর্জুন ॥ (বিস্মিত হইয়া) না—মানে—এতো টাকা আপনি কেন দেবেন ?

[বাঈজী নিকটে আসিয়া অর্জুনের হাত ধরিয়া টাকাগুলি তাহার মুঠার মধ্যে গুঁজিয়া দিল।]

রতন ॥ কেন ? তোমার বাঁশী সত্যি খুব ভালো—আরো ভালো তোমার হাত। আর—(হাসিয়া) সবচেয়ে ভালো তুমি।

অর্জুন ॥ (হতভম্ব হইয়া) আমি! আপনি—

রতন ॥ হ্যাঁ, তোমাকে আমি চাই। মনে হচ্ছে তোমাকে না পেলে আমার নাচ আর জমবে না।

অর্জুন ॥ (বিমূঢ়ের মত) আমিতো আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

রতন ॥ বেশ, আমি তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুমি বাজনা ধরো—আমি নাচি।

[রতনবাঈ নাচিতে সুরু করিল। অর্জুন বাঁশী বাজাইতে শুরু করিল। অর্জুনের বাঁশীর সহিত রতনবাঈজীর নাচ এক অপূর্ব রস সৃষ্টি করিল।]

রতন ॥ (নাচ শেষ করিয়া) চমৎকার! চমৎকার!! কথায় বলে গোবরে পদ্মফুল! তুমি তাই।

অর্জুন ॥ কী বাজিয়েছি জানিনা—আমার জ্ঞান ছিল না।

রতন ॥ (অর্জুনের কাছে আসিয়া) আমারও জ্ঞান ছিল না। (অর্জুনের পাশে বসিয়া) এবার বুঝতে পেরেছো তো তোমার বাঁশীর সংগে আমার নাচ কী রকম জমবে।

[এমন সময় যমুনা খাবারের থালা ও জলের গেলাস লইয়া আসিয়া অর্জুনের সম্মুখে রাখিয়া পুনরায় ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।]

রতন ॥ নাও—খেয়ে নাও।

[অর্জুন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল।]

রতন ॥ ওকী! হাত গুটিয়ে বসে রইলে যে? খাও।

[অর্জুন টাকা কয়টি ট্যাঁকে গুঁজিয়া খাইতে চেষ্টা করিল। কিছুপরে রতন কহিল।]

রতন ॥ কী ভাবছো ওস্তাদ?

অর্জুন ॥ এতো ভালো খাবার আমি জীবনে খাইনি, আমি দেখিইনি কোন দিন।

রতন ॥ কী আর ভালো খাবার! এখানে কীইবা জোটে। কলকাতায় এসো—দেখবে—খাবার কাকে বলে।

অর্জুন ॥ কলকাতা! সেই ছোটবেলায় একবার গিয়েছিলুম। ওরে বাবা—কি মস্ত সহর!

রতন ॥ যাবে?…আমার সংগে যাবে?

অর্জুন ॥ তোমার সঙ্গে! কলকাতা! না, না, আমি বাড়ী চললাম বাইজী। এসব আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

[অর্জুন ভাবিল ইহা কি স্বপ্ন! পরক্ষণেই মনে হইল, হয়ত সে বুঝিতে ভুল করিয়াছে।]

অর্জুন ॥ না, না, না—বিশ্বাস হচ্ছে না।

রতন ॥ কী বিশ্বাস হচ্ছে না?

অর্জুন ॥ এই—এই সব কিছু। [অন্যদিকে মুখ ফিরাইল]

রতন ॥ আমার দিকে তাকাও তো।

[অর্জুনের হাত ধরিয়া তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।]

রতন ॥ এবার বল—এখনো কি বিশ্বাস হচ্ছে না?

অর্জুন ॥ (অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হইয়া) না—না—

রতন ॥ কী?

অর্জুন ॥ না, না আমায় ছেড়ে দাও—আমায় ছেড়ে দাও—

[অর্জুন উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রতন অবাক হইয়া তাহার গতিপথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অর্জুন মণ্ডলের কুটির প্রাঙ্গণ। কাল-প্রভাত। নিকটবর্তী একটি খোঁটায় খাসীটি বাঁধা রহিয়াছে। দুর্গা খাসীটিকে ঘাস খাওয়াইতেছিল, এমন সময় অর্জুন বাহির হইতে আসিল। তাহাকে দেখিয়া দুর্গা বলিল—

দুর্গা ॥ সারাদিন কোথায় থাকো বলেও যাও না। বামুন ঠাকুর দুবার এসে ঘুরে গেলেন।

অর্জুন ॥ দুবার কেন, দুশোবার আসতেন। বাবা মারা গেছেন, ব্যাটাদের আনন্দ যেন আর ধরে না। যতো সব শকুনের দল। পথে দেখা হয়েছিল, আমি বলে দিয়েছি, বাবার শ্রাদ্ধ-টাদ্ধ আমি করবো না।

দুর্গা ॥ সে কী ! শ্রাদ্ধ না করলে চলে ?

অর্জুন ॥ শ্রাদ্ধতো করতে বলছো, কিন্তু টাকা কই দুর্গা ? বেঁচে থাকতে কেউ এসে পাশে দাঁড়ায়নি। মরে গেলে কিন্তু সবাই শ্রাদ্ধের ফলার খেতে চায়। বাপের শ্রাদ্ধ আমার শ্রাদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুর্গা ॥ কিন্তু একটা কিছু করতে হবে তো ?

অর্জুন ॥ আসল শ্রাদ্ধ আমি সেরে ফেলেছি। বাবার ইচ্ছা ছিল সাবেক ভিটেয় দেহ রাখেন। সে ইচ্ছা তার মেটাতে পারিনি। তাই যেদিন বাবা মারা গেলেন, সেদিনই রাতে চুপি চুপি তার চিতার ছাই আমাদের সাবেক ভিটেতে মুঠি মুঠি ছড়িয়ে দিয়েছি। মরে গিয়েও যদি বুড়োর চোখ থাকে বুড়ো তা দেখেছে। শ্রাদ্ধই যদি বলো, আমিতা করে ফেলেছি।

[বহির্দ্বারে বাঈজীর মোসাহেবগণের কণ্ঠের ছড়া শোনা গেল—]

মোসাহেবগণ ॥ (সমস্বরে) আমাদের চাই একটা পিসী—না হয় একটা মাসী—নিদেন একটা খাসী।

অর্জুন ॥ ও বাবা ! এরা আবার কারা !

জহর ॥ (নেপথ্য হইতে) এটা কি অর্জুন কিষাণের বাড়ী ?

[মোসাহেবগণ ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলে তাহাদিগকে দেখিয়া দুর্গা ঘোমটা টানিয়া তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল।]

অর্জুন ॥ তা তোমরা—আপনারা হঠাৎ ?

মানিক ॥ আরে ওস্তাদ, তোমার ব্যাপার কী বলতো ! একদিন সেই ঝড়ের মতো দেখা দিয়েই ডুমুরের ফুল ব'নে গেলে যে ?

ছয়া ॥ বাঈজীর কাছে আর আমরা মুখ দেখাতে পারি না। কেবলি বলে, খুব লোক এনে দিয়েছিলে যা হোক।

জহর ॥ বাঈজীর মনে কী যে রং ধরিয়ে এলে বাবা, সেতো দেখছি ঘষলে ওঠে না, ধুলেও যায় না। বাইজীতো পাগল ! আজ নিজে বেরিয়েছে তোমাকে ধরতে।

মানিক ॥ কী যা-তা বলছিস ! না ওস্তাদ, বাঈজী এসেছে তোমাদের

গ্রামে ঐ বুড়োশিবের মন্দিরে পূজো দিতে। সেই ফাঁকে আমরা বেরিয়েছি একটু খানা দানার যোগাড়ে।

জহর ॥ হ্যাঁ বাবা। তোমাদের এই পোড়াদেশে এসে যে পেট একেবারে গড়ের মাঠ হয়ে গেল বাবা!

মানিক ॥ ভালো-মন্দ কিছুই জুটছে না।

হুয়া ॥ না মাছ, না মাংস। কী নিরিমিষ দেশরে বাবা!

জহর ॥ আচ্ছা, এদেশে তোমরা কী সবাই বিধবা বাবা?

মানিক ॥ তা বিধবাই যদি বাবা, তাহলে একটু ক্ষীর, একটু সর, একটু রাবড়ী—এই মাসী-পিসীরা যা খান, যা খাওয়ান—

হুয়া ॥ আরে রেখেদে তোর মাসী-পিসী। সামনে এমন পুরুষ্টু খাসী। আহা-হা, জিভে জল আসছে গো!

জহর ॥ তা খাসা খাসী। বুঝলে ওস্তাদ, বাঈজী ভারী খুশী হবে।

মানিক ॥ খেতে পাচ্ছে না কিনা। ভাত একেবারে মুখে রুচছে না।

অর্জুন ॥ ওটা হোল আমার ছেলে লক্ষ্মণের খাসী। নিজে না খেয়ে ওকে খাওয়ায়। খাসীতো নয়, প্রাণ।

হুয়া ॥ তা বটে! তা বটে! তবে কিনা—

জহর ॥ ওঃ ছাখো, আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি। বাঈজী তোমাকে ডেকেছে ওস্তাদ।

অর্জুন ॥ আমাকে!

মানিক ॥ নয়তো কাকে? কার জন্যে এই এক হাঁটু কাদা ভেঙে এই ভূত সেজে এখানে এসেছি বাবা—সে কি পীরু মণ্ডল না কিষ্টু সাঁওতাল?

হুয়া ॥ মানে বুঝলে কিনা ওস্তাদ, বাঈজী তোমাকে দেখে, এই যাকে বলে গিয়ে, ফেঁসেছে!

অর্জুন ॥ ছিঃ কি যে বলো!

জহর ॥ ও বাবা, দর বাড়ানো হচ্ছে।

অর্জুন ॥ না, না তবে কিনা—

মানিক ॥ গানও জমছে না—নাচও জমছে না। তুমি ওস্তাদ বাঁশী না বাজালে বাঈজীর আর মন উঠছে না।

জহর ॥ তুমি না গেলে কী হবে জানো ওস্তাদ? বাঈজী আমাদের মুখ দর্শন করবে না। খাসীটা নিয়ে চলো। বাঈজীকে বাঁচাও—আমাদের বাঁচাও।

অর্জুন ॥ না, না, এখন নয়।

মানিক ॥ এখন নয়! তবে কখন?

অর্জুন ॥ আচ্ছা সে হবে 'খন।

হুয়া ॥ আর যদি না যাও, তাহলে ভাই বুড়ো শিবের মন্দির থেকে বাঈজীকে না হয় এখানেই ডেকে নিয়ে আসি।

অর্জুন ॥ না, না, এখানে নয়। আমি তোমাদের তাঁবুতেই যাবো—আজ রাত্রে।

জহর ॥ শুধু হাতে যেওনা কিন্তু,—মানে,—(খাসীটার দিকে চাহিল।)

অর্জুন ॥ আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে'খন।

মানিক ॥ দেখো ভাই—ওস্তাদকা বাত, হাতীকা দাঁত। নড়ন চড়ন না হয়। তবে চলহে চল, আমরা কেটে পড়ি।

হুয়া ॥ বাঈজীর পূজো এতোক্ষণ বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে। এই ছাখো ওস্তাদ, তোমার সঙ্গে কথায় কথায় ঠাকুরের পেসাদটা বোধ হয় মাঠে মারা গেল। বলিনা—বরাতটা হয়েছে একেবারে গড়ের মাঠ—গড়ের মাঠ—

মোসাহেবগণ ॥ (সমস্বরে)

আমাদের চাই একটা পিসী—
না হয় একটা মাসী—
নিদেন একটা খাসী।

[মোসাহেবগণ ছড়া কাটিতে কাটিতে চলিয়া গেলে, অর্জুন একবার পা টিপিয়া ঘরের ভিতরে গেল। কিন্তু ক্ষণপরেই আবার বাহিরে আসিয়া চারিদিক একবার দেখিয়া লইয়া খাসীটির বাঁধন খুলিতে

লাগিল। এমন সময় হঠাৎ দুর্গা কলসী কাঁখে বাহিরে আসিয়া উক্ত দৃশ্য দেখিয়া বলিল—]

দুর্গা ॥ একী! খাসীটাকে খুলছো কেন?

[অর্জুন চমকিত হইল—ধরা পড়ার উপক্রমে চোর যেমন চমকাইয়া ওঠে।]

অর্জুন ॥ ও হ্যাঁ। তোমার বাঁধনটা আলগা হয়েছে দুর্গা, হ্যাঁ এসে ত্যাখো।

[খাসীটির নিকট হইতে দূরে সরিয়া আসিল।]

অর্জুন ॥ খাসীটাকে বাঁধো। এমন করে বাঁধো যাতে চোরে খুলে নিতে না পারে।

দুর্গা ॥ চোর?

অর্জুন ॥ হ্যাঁ চোর। বাঈজীর ওই লোকগুলো—বাঈজী নিজে—তুমি জানো না, তুমি জানো না—আমি জানি।

[এমন সময় হাতে পুঁথি পুস্তক লইয়া লক্ষ্মণ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল—]

লক্ষ্মণ ॥ বাবা—বাবা—মা, কে এসেছে ত্যাখো।

[লক্ষ্মণ পুঁথি-পুস্তক ছুড়িয়া দিয়া ছুটিয়া বাহিরে গিয়া যাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিল—দেখা গেল, তিনি রতন বাঈজী।]

অর্জুন ॥ একী! তুমি—আপনি—এখানে?

রতন ॥ বুড়োশিবের মন্দিরে পূজো দিতে এসেছিলাম। কে যেন বলছিল এই পথেই আপনার বাড়ী। ইস্কুলের ছেলেরা ফিরছিলো—জিজ্ঞেস করতেই আপনাদের লক্ষ্মণ পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো।

লক্ষ্মণ ॥ মা, মা, তুমি কী! বসতে দাও। কে ইনি জানো? (মায়ের মাথা টানিয়া নীচু করিয়া কানে কানে) রতনবাঈ—কলকাতার সবচেয়ে বড় বাঈজী।

রতন ॥ (হাসিয়া দুর্গার প্রতি) না দিদি আমি তেমন কোন বাঘ-ভালুক নই।

দুর্গা ॥ আপনি যেই হোন্—অতিথি। আমাদের দেবতা।

[লক্ষ্মণ অধিকতর তৎপর। সে ইতিমধ্যে ঘরের মধ্য হইতে একটা হাতভাঙা চেয়ার আনিয়া ফেলিয়াছে এবং পরক্ষণেই ছুটিয়া আর একটি ছোট বেঞ্চিও আনিয়া ফেলিল।]

অর্জুন ॥ বসুন।

[দুর্গা গিয়া রতনের হাত ধরিল।]

দুর্গা ॥ আসুন।

[রতন বেঞ্চির উপর বসিতে গেল। লক্ষ্মণ চীৎকার করিয়া উঠিল—]

লক্ষ্মণ ॥ না, না, এই চেয়ারটাতে বসুন।

অর্জুন ॥ না, না, ওই হাতভাঙা চেয়ারটার চেয়ে এই বেঞ্চিই ভাল।

লক্ষ্মণ ॥ না, না, বাবা তুমি জানো না।

দুর্গা ॥ ইস্কুলে ওদের শিখিয়েছে যে।

রতন ॥ হ্যাঁ খোকা, আমি তোমার চেয়ারেই বসব।

[রতন হাসিয়া চেয়ারে বসিল।]

রতন ॥ আপনারা বসুন।

লক্ষ্মণ ॥ (মায়ের কানে কানে) মা, চা।

দুর্গা ॥ (হাসিয়া) হ্যাঁ বাবা, ওঁরা সহুরে লোক। চা-ই দোব—আনছি।

রতন ॥ না দিদি, চা তো দুবেলাই খাচ্ছি। আপনি বরং আমায় ঠাণ্ডা এক গেলাস জল দিন।

লক্ষ্মণ ॥ মা, তুমি যা করতে হয় কর। আমি চট্ করে একটা ডাব পেড়ে নিয়ে আসি।

[লক্ষ্মণ ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহিরে ছুটিল।]

রতন ॥ না, না, সেকি! ওই ছেলে গাছে উঠবে?

দুর্গা ॥ পাড়াগেঁয়ে ছেলে—হামেশাই উঠছে। ভয় নেই, আপনি বসুন। আমি আসছি।

[দুর্গা ভিতরে চলিয়া গেল।]

রতন ॥ দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো।

অর্জুন ॥ ওরা যে বললে, তা কী সত্যি? সত্যিই কী তুমি আমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলে?

রতন ॥ নইলে তো তুমি যেতে না। সেই যে এলে আর তো গেলে না!

অর্জুন ॥ যেতে চাইলেই কী যেতে পারি? আমার চাষবাস আছে, স্ত্রী-পুত্র আছে—ভাত জোটে না—নাচ দেখবো!

রতন ॥ চাষবাসে ভাত না জুটলে সে চাষবাসে লাভ?

অর্জুন ॥ তোমার নাচ দেখলে ভাত জুটবে?

রতন ॥ (হাসিয়া) জুটবে। নাচের সঙ্গে মিঠে সুরে বাঁশী বাজালে তা জুটবে বৈকি।

অর্জুন ॥ তার মানে—চাকরী করতে বলছো তোমার?

[দুর্গা রেকাবীতে কিছু ফল ও নাড়ু লইয়া আসিল। তাহা দেখিয়া রতন বলিল—]

রতন ॥ এই যে দিদি, এসেছেন। কিন্তু এতো সব কি এনেছেন?

অর্জুন ॥ গরীবের ঘরের খুদকুড়ো—আবার কী? খেতে পারবেন কিনা জানি না।

রতন ॥ (রেকাবী হাতে লইয়া) না, না, সেকী! নাড়ু, মোয়া—কী খুব সব! এ তো আমার কাছে রাজভোগ। কলকাতায় এসব পাবো কোথায়? (দুর্গাকে) টাকা দিলেও মিলবে না—জানেন? তাই ওঁকে বলছিলাম, কলকাতায় সব আছে—শুধু খাঁটি জিনিষ নেই।

অর্জুন ॥ তাইতো কলকাতাকে ভয় করি। সব মেকী। তুমি যাও বৌ, এক বাটি খাঁটি দুধ নিয়ে এসো তো।

রতন ॥ আনুন, তাতে 'না' বলবো না।

দুর্গা ॥ আনছি।

[দুর্গা ভিতরে চলিয়া গেল।]

রতন ॥ না, বৌটী তোমার মন্দ নয়। এই লোভেই বুঝি ভাত না জুটলেও এখানে পড়ে আছো, না ?

অর্জুন ॥ তোমার নাচ দেখে ভাত জুটবে ?

রতন ॥ (যাদুকরীদৃষ্টিতে) জুটবে। আবার বলছি, নাচের সঙ্গে মিঠে সুরে বাঁশী বাজালে শুধু ভাত জুটবে না, ঘি-ভাত জুটবে।

অর্জুন ॥ তার মানে—চাকরী করতে বলছো তোমার ?

রতন ॥ ভালোবেসে যদি না আসো, তবে তোমাকে টাকা দিয়ে মাইনে করেই রাখতে হয় ওস্তাদ।

অর্জুন ॥ কলকাতার এতো বড়ো নামকরা বাঈজী তুমি—পাড়াগেঁয়ে এক চাষীর বাঁশী তোমার ভালো লাগলো—এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বল ?

রতন ॥ ভালো না লাগলে মাইনে করে রাখতে চাইছি ? অবিশ্বাসের কী আছে ওস্তাদ ? আমার সঙ্গে চল কলকাতায়। তোমার হাতে যাদু আছে ওস্তাদ। আর তোমার চোখে আছে মধু। তুমি যাদুকর।

[রতন অর্জুনের হাত ধরিতে গেলে অর্জুন হাত সরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।]

অর্জুন ॥ না, না, অমন করে তুমি ব'লো না। কী করে আমি যাবো ? আমার দুর্গা—আমার লক্ষ্মণ—ওরা যে আমার মুখ চেয়েই থাকে। আর, ওদের আমি বুঝতে পারি—কিন্তু তোমাকে আমি বুঝি না বাঈজী।

[একবাটী দুধ লইয়া দুর্গা ভিতর হইতে আসিল।]

দুর্গা ॥ একী ! আপনি যে কিছুই মুখে দেননি !

রতন ॥ খোকা কিরুক। (অর্জুনকে) আপনি একটু দেখুন না। গাছে উঠেছে, আমার কেমন ভয় করছে।

অর্জুন ॥ না, না, ভয়ের আবার কী ?

দুর্গা ॥ তা একটু দেরী হচ্ছে বৈকি। আর খোকা না এলে উনি যখন খাবেন না, তুমি যাও।

[অর্জুন বাহিরে গেল।]

দুর্গা ॥ আপনি খেতে থাকুন, ওরা এখনি আসবে।

রতন ॥ পূজার প্রসাদ খেয়েছি কিনা, এখন বেশী কিছু খেতে পারবো না। এই সরখানা খাবো, আর খাবো লক্ষ্মণের ডাবের জল। তাই বলে ছেড়েও যাবো না কিছু। বেঁধে নিয়ে যাবো সঙ্গে। পূজার প্রসাদের চেয়ে এ আমার কিছু কম নয়।

দুর্গা ॥ আপনি অতো বড় বাঈজী, আমরা এতোটা আশা করিনি।

রতন ॥ বাঈজী আমি কতো বড় জানি না, কিন্তু এই পাড়াগাঁয়ে এতো বড় বাজিয়ে পাবো, এ আশা আমি করিনি কোনদিন। সত্যি, আপনার স্বামীর মতো মিঠে সুর তুলতে কলকাতায় খুব বেশী ওস্তাদকে দেখিনি।

দুর্গা ॥ কিন্তু সেতো শেষ হয়ে গেছে।

রতন ॥ কেন?

দুর্গা ॥ বাঁশীটা গেছে।

[লক্ষ্মণ ও অর্জুন বাহির হইতে আসিল। উভয়েরই হাতে কয়েকটি ডাব।]

রতন ॥ ওমা, একী!

অর্জুন ॥ দেখুন—ছেলের কাণ্ড দেখুন।

দুর্গা ॥ দেরী দেখে এইটেই আমার মনে হচ্ছিল। নিন্, এইবার সুরু করুন।

রতন ॥ এসো খোকা, তুমিও কিছু খাবে এসো।

লক্ষ্মণ ॥ না, না, আমি খাবো না, আপনি খান। আমি ততক্ষণ ডাবটা কেটে নিয়ে আসি।

[লক্ষ্মণ ছুটিয়া ঘরের দিকে গেল।]

রতন ॥ ধন্যি ছেলে! ও কি ক্ষেপে গেল?

অর্জুন ॥ গোটা মুল্লুক যার নাচ দেখে ক্ষেপে গেছে, তাকে পেয়েছে ও নিজের বাড়ীতে। তাই একটু ক্ষেপে যাবে বৈকি।

[বাঈজীর সঙ্গীগণ বাহির হইতে হাঁকিল—]

জহর ॥ ওহে, অর্জুন কিষেণ, শুনলুম বাঈজী এখানে। আমরা আসছি।

[উহারা ভিতরে প্রবেশ করিল। উহাদিগকে আসিতে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া দুর্গা ভিতরে গেল।]

রতন ॥ খুব আক্কেল যা হোক তোমাদের! আমায় একা মন্দিরে বসিয়ে রেখে তোমরা সবাই উধাও হ'য়ে গেলে!

মানিক ॥ তোমার জন্য একটা খাসী খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। খাসী না পেলে তো তোমার মুখে ভাত উঠবে না। আর কদিন ভাত না খেয়েই বা থাকবে?

হুয়া ॥ কী দেশরে বাবা! এতো বড়ো গাঁয়ে একটা ভালো খাসী খুঁজে পেলাম না।

জহর ॥ এক ওস্তাদের ওই খাসীটা ছাড়া—

রতন ॥ না, না, ও খাসী নয়।

[লক্ষ্মণ গেলাসে করিয়া ডাবের জল লইয়া আসিল।]

মানিক ॥ তা ওস্তাদের এখানে দেখছি বেশ জমিয়ে নিয়েছো। কিন্তু ওদিকে যে শ্যামপুরের জমিদারের এ সময় আসার কথা আছে তোমার তাঁবুতে।

রতন ॥ তাও তো বটে। (সরখানি শেষ করিয়া) আচ্ছা তাহলে চলি ওস্তাদ।

লক্ষ্মণ ॥ কিন্তু এই যে ডাব—(রতন উহা পান করিল।)

বারে, এসব যে কিছু খেলেন না?

[ঘোমটা মাথায় দুর্গা থালায় পান লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।]

হুয়া ॥ ওসব উঁরা খাননা। উনি যা খান, তা তোমার আছে লক্ষ্মণ। ওই খাসীটা দেবে? ভাল মাংস এখানে না পেয়ে উনি ভাত খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন।

জহর ॥ এমনি না দাও বিক্রী করো না।...

লক্ষ্মণ ॥ বাবা—

অর্জুন ॥ দিয়ে দে লক্ষ্মণ। অতিথি চাইছেন, দিয়ে দে।

[দুর্গার হাত হইতে পান সমেত থালাটি পড়িয়া গেল। সকলে চমকাইয়া উঠিল।]

হুয়া ॥ আহা, অতো গুলো পান পড়ে গেল!

মানিক ॥ রাখো তোমার পান। ওস্তাদ খাসীটা যখন দিয়েছে, একটা রাজ্য দিয়ে দিয়েছে হে!

[মানিক ছুটিয়া গিয়া খাসীটি খুলিয়া লইল।]

রতন ॥ কিন্তু এমনি খাসীটা নেওয়া ভালো দেখাচ্ছে না ওস্তাদ।

অর্জুন ॥ খবরদার, দাম-টামের কথা মুখে এনো না। তুমি অতিথি—আমি যত গরীবই হইনা কেন, আমিও মানুষ—অতিথির সম্মান করতে আমি জানি।

জহর ॥ মানুষ! আমি বলবো তুমি আজ আমাদের দেবতা। নাও চল—চল—শ্যামপুরের জমিদার চলে না যায়।

রতন ॥ আসি ওস্তাদ—আসি দিদি—নাচ দেখতে আসবেন। ওহে, তোমরা ওদের তিনখানা পাশ দিও।

হুয়া ॥ সে আর বলতে—

[সকলে খাসীটি লইয়া চলিয়া গেল। উহারা চলিয়া যাওয়া মাত্র লক্ষ্মণ ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অর্জুন ছুটিয়া আসিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল।]

অর্জুন ॥ চুপ! চুপ!

দুর্গা ॥ ছাড়ো। ও কাঁদবে না। আমি কাঁদব না। তুমি ভেবো না।

[লক্ষ্মণ চুপ করিয়া গেল। যবনিকা পড়িয়া গেল। যবনিকা পড়িয়াই আবার উঠিয়া গেল। দেখা গেল, দুর্গা দাওয়ায় বসিয়া একটা ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিতেছে। ঘরের ভিতর হইতে অর্জুন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ দুর্গার দিকে চাহিয়া রহিল, পরে বলিল—]

অর্জুন ॥ আচ্ছা তোমার ব্যাপার কী বলতো ? আজ সারাদিন তুমি আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলছো না—লক্ষ্মণও আমায় দেখে কেমন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে—কী হয়েছে তোমাদের ? (দুর্গা নীরবে কাজ করিয়া যাইতেছে দেখিয়া একটু পরে) হোক বাঈজী, তবুতো অতিথি। তুমিই বল দেবতা। তাকেই দিয়েছি। (দুর্গা নীরব দেখিয়া খানিক অগ্রসর হইয়া) ওরা কলকাতার লোক—কতো নামজাদা লোক, বড় মুখ করে খাসীটা চাইলে, না দিয়েই বা কি করি .বল ? (দুর্গা নীরব। অর্জুন তাহার নিকটে বসিয়া নরম সুরে বলিল—) ও খাসী আমাদের জন্য নয় দুর্গা ! যাদের খাবার তারাই খাক্। (দুর্গা পূর্ববৎ নীরব) আচ্ছা এক কাজ করলে হয়না ? লক্ষ্মণ বাড়ী ফেরার আগেই আর একটা খাসী কিনে আনলে হয় না ? রাজার মতো ওই রকম আর একটা পুরুষ্টু খাসী, কী বল দুর্গা ?

দুর্গা ॥ (অর্জুনের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে) তুমি মালিক, ইচ্ছে হয় দাও, ইচ্ছে হয় কেনো—আমি কি বলব ! তোমার যা খুসী করো।

অর্জুন ॥ তা নয় তো কী ? আম্মর যা খুশী তাই করবো—কাউকে আমি কৈফিয়ৎ দোব না। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কৈফিয়ৎ ? কেন কী দোষ আমার ? (গলার স্বর এক পর্দা চড়াইয়া) না হয় খাসীটাই ওদের দিয়েছি, তাই বলে কী এমন অপরাধ করেছি যে ঘেন্নায় তোমরা কেউ আমার সঙ্গে কথা কইছো না ? (একটু পরে) এত দুঃখ কষ্ট—এতো অভাবের সঙ্গে আমি লড়াই করছি কিসের জন্য ? সে কী শুধু :তোমাদের মুখ চেয়ে নয় ? কিন্তু তোমরা আমার মুখ চাইবে না ! (উত্তেজিত ভাবে) তবে কেন—কেন তোমারা আমাকে এই ভাবে সাজা .দিচ্ছো ? (দুর্গা তথাপি নীরব দেখিয়া) তোমরা আমায় ছোট মনে করলেই কি আমি ছোট ? না, না, তা নয়। আমি অতো ছোট নই। গুণী বলে আমাকেও অনেকে হাত ধরে টানাটানি করে কিন্তু গাঁয়ের যোগী ভিখ্ পায়না—সে কথাতো আর মিথ্যে নয়। (দুর্গা নীরব।) তুমি আমার সঙ্গে কথা কইবে না ?

দুর্গা ॥ কী কথা বলবো ? যারা তোমায় গুণী বলে, তারা তোমার গুণের দাম দিয়েছে ? যে টাকায় পেটের ভাত হয়, তা যদি না দেয়, তোমার গুণের দাম কি ?

অর্জুন ॥ সে তুমি বুঝবে না—তুমি বুঝবে না।

দুর্গা ॥ বেশ—বুঝব না।

অর্জুন ॥ বেশ, বুঝো না। যে বোঝে, যে বুঝতে চায় আমি তার কাছেই যাচ্ছি।

দুর্গা ॥ বেশতো যাও। কিন্তু আমি বলবো বৌ ছেলের মুখে ভাত দিতে না পেরে তুমি পালাচ্ছো—তুমি পালাচ্ছো।

অর্জুন ॥ (দুর্গার দিকে রুখিয়া গিয়া) কী ? এতো বড় কথা তুই বললি আমায় ? (কিন্তু তখনই সংযত হইয়া) না, তোকে মারব না। রোজগারের টাকা পাঠিয়ে তোকে চাঁদির জুতো মারবো,.সেই দিন বুঝবি, আজ তুই আমায় কতো বড়ো কথা বলেছিস্।

[অর্জুন ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

রতনবাঈ-এর তাঁবুর অভ্যন্তরভাগ। রতনবাঈ একখানা নিধুবাবুর টপ্পা গাহিতেছে। তাহার ইয়ার সহকর্মিগণ তাহা উপভোগ করিতেছে।

যে দিকে চাই সেই পাই
দেখিতে তোমারে।
কি জানি কি গুণে ভুলালে নয়নে
তোমার বিহনে, না দেখি কাহারে ॥

যখন থাকি শয়নে

তোমারে দেখি স্বপনে,

পুনঃ জাগরণে, নয়নে নয়নে থাকি সেই মনে,

কি হলো আমার এ।

[গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল—]

হুয়া ॥ খানা তৈরী মেমসাব।

ইয়ারগণ ॥ হুর্‌রা! হুর্‌রা!!

মানিক ॥ আর কেন? এবার গা তোল সখি!

রতন ॥ কিন্তু আমার যে এখনও ক্ষিদে পায়নি।

জহর ॥ ক্ষিধে পায়নি কি সখী? অর্জুন মণ্ডলের অমন পুরুষ্ট খাসী—আমার তো দেখেই ক্ষিধে চন্‌চন্ করে উঠলো। গান শোনবারও তর সইছিল না।

হুয়া ॥ না, না, সে হয় না বাঈজী। দুখানা হাড় চিবলেই দেখবে, পেটে আগুন জ্বলে উঠবে।

মানিক ॥ না, না, বাঈজী—(হুয়াকে দেখাইয়া) ওই যে লোকটা—আমিতো বলি অকর্মার ঢেঁকী—চাটি মেরে তাড়িয়ে দাও। তবে হ্যাঁ, ও আবার যা জানে, তা আর কেউ জানে না, এমন মাংস কেউ রাঁধতে জানে না—কেউ না। আজ যা রেঁধেছে—(জিভে জল আসিলে কোনমতে সামলাইয়া) ওঠো, ওঠো—

[বাঈজী উঠিতে ছিল, এমন সময়ে অর্জুন হঠাৎ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—]

সকলে ॥ আরে এসো, এসো, দোস্ত এসো।

জহর ॥ এতো রাতে—ব্যাপার কি?

মানিক ॥ খাসীটা ফেরৎ নিতে আসোনি তো?

রতন ॥ আঃ! থামো।

জহর ॥ তা বাঈজী, ঠিক সময়েই এসেছে। আমিও ভাবছিলুম। খাসীটা এতো করে পুষেছিলো, মাংসটা খাবে না? একবার ডাকলে হতো!

হুয়া ॥ ওস্তাদ কি আমাদের পর, যে ডাকতে হবে? প্রাণের টানে এসেছে ভাই, প্রাণের টানে এসেছে। নাও এখন সব চল। মাংস জুড়িয়ে যাচ্ছে।

রতন ॥ তোমরা যাও! আমাদের দুজনের খাবার এখানে পাঠিয়ে দাও।

হুয়া ॥ ও—বুঝেছি।

সকলে ॥ বেশতো! বেশতো!

মানিক ॥ ক্ষিধেটা এতক্ষণ লাগেনি কেন, এখন বোঝা গেল সখি।

[বাঈজীর প্রতি সহাস্য কটাক্ষ হানিয়া সকলে চলিয়া গেল।]

রতন ॥ তোমায় আমি বুঝিনা! এই পায়ে ঠেলছো—আবার এই আসছো।

অর্জুন ॥ পায়ে ঠেলার মানুষ তুমি নও। আমার কথা ধরোনা বাঈজী—আমি ভাবি এক, করি এক।

রতন ॥ দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো।

[অর্জুন বসিলনা দেখিয়া রতন বলিল—]

রতন ॥ আমরা কাল চলে যাচ্ছি। আর হয়তো দেখা হবে না। এসো, বসো।

[অর্জুন বসিল।]

রতন ॥ আমায় তুমি ভুলে যেও।

অর্জুন ॥ ভুলতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু পারলাম না।

রতন ॥ না, না, তুমি আমাকে ভুলে যাও! তোমার ঘর আছে, সংসার আছে, বৌ আছে, সোনার চাঁদ ছেলে আছে, তাই তুমি আমাকে ভুলে যেও—ভুলে যেও।

অর্জুন ॥ রতনবাঈ—রতনবাঈ—তুমি বলছো আমার সব আছে। কিন্তু রতনবাঈ, তুমি জানোনা, আমার কিছু নেই—কিছু নেই। কেন নেই জানো? আমার টাকা নেই। যার টাকা নেই তার কিছু নেই—কিছু নেই। বাড়ী ফেরবার কোন মুখ নেই। স্ত্রীর কাছে গিয়ে দাঁড়াবো, ছেলেকে বুকে নেবো,

এ অধিকারও আজ আমি হারিয়েছি। আজ আমি তাদের ভুলতে চাই। হ্যাঁ, আমি তাদের ভুলতে চাই—বিশ্বাস করো, তাদের আমি ভুলতে চাই। আর তাদের ভুলতে চাই বলে তোমাকে চাই।

[এমন সময়ে দুই প্লেট মাংস ও রুটি লইয়া হুয়া আসিল।]

রতন ॥ (অর্জুনকে) আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে'খন। (হুয়াকে) যা ঘ্রাণ বেরিয়েছে, বুঝছি সত্যই ভালো রেঁধেছো।

হুয়া ॥ না ওস্তাদ, খাসীটা তোমার সত্যিই ভালো ছিলো। আর সেটা দিয়েওছিলে খুব ভালো মনে। রান্নাটা তাই এতো জমেছে। ওরা তো সব গোগ্রাসে গিলছে।

[হুয়া প্লেট দুটি দুইজনের সামনে আগাইয়া দিল।]

হুয়া ॥ লজ্জা করো না ওস্তাদ। মাংস যদি লাগে, চাইবে।

রতন ॥ না, না, লজ্জা কি। (হুয়াকে) যাও এবার, তুমি গিয়ে খাও। দেরী করলে দেখবে তোমার ভাগও উপে গেছে।

হুয়া ॥ আমার খাওয়া চাখতে চাখতে। গুরুর কৃপায় মাংস রেঁধে নিজে কোনদিন ঠকিনি। আচ্ছা আসি।

[হুয়া চলিয়া গেল।]

রতন ॥ একী! হাত তুলে বসে রইলে যে? খাবে না?

অর্জুন ॥ তুমি খাও। আমি খেতে পারবো না।

রতন ॥ তুমি না খেলে আমি খেতে পারি?

অর্জুন ॥ ও—আচ্ছা—খাচ্ছি। খাবো না! নিশ্চয় খাবো।

[উভয়ে খাওয়া স্বরু করিল।]

রতন ॥ না, মাংসটা সত্যিই বেশ হয়েছে।

[অর্জুন কোনও উত্তর দিল না। সে একটা হাড় রুদ্রমূর্ত্তিতে চিবাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। হাড়ের সঙ্গে যেন তাহার যুদ্ধ চলিল। চোখমুখ তাহার বিকট হইয়া উঠিল।]

রতন ॥ হ্যাঁ। এ হাড় চিবিয়ে সুখ আছে। খাসীটা তোমার সত্যিই বড় ভালো ছিল।

[অর্জুন আগের মতোই বিকটভাবে হাড় চিবাইতে ছিল। রতনের এ কথায় হঠাৎ তাহার কণ্ঠ হইতে একরূপ অদ্ভুত শব্দ শোনা গেল। রতন চীৎকার করিয়া উঠিল—]

রতন ॥ কী হোল, কী হোল ওস্তাদ ?

অর্জুন ॥ (কষ্ট সহকারে) হাড়টা আমার বুকে বিঁধে গেছে।

[মুখভঙ্গী বিকৃত হইয়া উঠিল।]

রতন ॥ য়্যাঁ, সে কী ! (ব্যস্ততার সহিত) জল—জল—তোমরা শীগ্‌গির এদিকে এসো—তোমরা শীগ্‌গির এদিকে এসো !

অর্জুন ॥ না, না, কাউকে ডাকতে হবে না। হাড়টা নেমে গেছে।

তৃতীয় দৃশ্য

পরদিন সকাল। অর্জুন মণ্ডলের বাড়ীর সম্মুখস্থ পথ। নকুল ছুটিয়া আসিয়া নেপথ্যে লক্ষ্য রাখিয়া লক্ষ্মণকে তারস্বরে ডাকিতে লাগিল—

নকুল ॥ লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ, শীগ্‌গির আয়। বাঈজীর দলের সঙ্গে তোর বাবা কলকাতায় যাচ্ছে। দেখবিতো শীগ্‌গির আয়। তোর মাকে নিয়ে আয়।

[ছুটিয়া লক্ষ্মণ আসিল, তৎপশ্চাতে আসিল দুর্গা, তৎপশ্চাতে আসিল রুক্মিণী ও আরো দু'একজন বৌ-ঝি।]

লক্ষ্মণ ॥ বাবা চলে যাচ্ছে ! কোথায় যাচ্ছে ?

নকুল ॥ চলে যাচ্ছে কি, চলে গেল—বাঈজীর দলের সঙ্গে কলকাতায়। ওই—ওই ছাখ, গাড়ীগুলো এখনো—এখনো দেখা যাচ্ছে।

লক্ষ্মণ ॥ সেকী! বাবা চলে যাচ্ছে? (দুর্গার প্রতি চাহিয়া) মা! (পরক্ষণেই বাবার দিকে ছুটিতে গেল) বাবা—বাবা—

[দুর্গা তাহার হাত খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিল।]

দুর্গা ॥ না বাবা, পিছু ডাকতে নেই।

লক্ষ্মণ ॥ বাবা চলে গেল! আমাদের কিছু না বলে চলে গেল?

দুর্গা ॥ (সবাইকে শুনাইয়া) আমাকে বলে গেছেন। যাচ্ছেন কলকাতায়। টাকা রোজগার করতে শ'য়ে শ'য়ে। বাঈজী বলেছে অত বড় বাজিয়ে কলকাতাতেও বেশী নেই। তবু যেতে চায়নি। আমি বলেছি—তবেই না গেল।

রুক্মিণী ॥ তাতো গেল, কিন্তু ফিরবে তো?

দুর্গা ॥ তোমার কর্তা হলে কি করতেন জানিনে দিদি, ওঁকে আমি জানি—ওঁকে ভুল বুঝবোনা আমি।

নকুল ॥ কিন্তু এমন করে চাষবাস ফেলে গাঁ ছেড়ে চলে গেল!

দুর্গা ॥ চাষবাসে পেটের ভাত হয়েছে? তোমার হচ্ছে? হলো না বলেই ও চলে গেল। আমাকে ছেড়ে দিতে হলো।

লক্ষ্মণ ॥ এবার তাহলে আমরা দুবেলা পেটভরে খেতে পাবো মা?

দুর্গা ॥ হ্যাঁ বাবা, চল—

[লক্ষ্মণকে লইয়া গৃহাভ্যন্তরে চলিল।]

রুক্মিণী ॥ সাতজন্ম না খেয়ে মরবো, তবু সোয়ামীকে এমন করে বাঘিনীর মুখে ঠেলে দিতে পারবো না আমি। কেউ পারবে না।

দুর্গা ॥ (ফিরিয়া) তুমি পারো না, তোমরা পারো না; কিন্তু আমি পারি—আমি পারি দিদি!

[লক্ষ্মণকে লইয়া দুর্গা চলিয়া গেল।]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতায় বাঈজীর ঘর। কাল—সন্ধ্যারাত্রি। বাঈজীর নাচ ও গানের আসর। অর্জুন বাঁশী বাজাইতেছে। কয়েকজন ইয়ারবন্ধু বাঈজীর নাচ গান উপভোগ করিতেছে।

চল সখী যাই যমুনা তীরে
ঘন বরণ ঘন উদয় মনেতে।
না দেখি নয়ন, করিছে রোদন,
কি করে এখন লোক লাজেতে ॥
অজ্ঞান কলঙ্ক যার,
দেখিলে কি থাকে তার,
লোক কলঙ্কেতে, কি করে তাহাতে,
মন যে সঁপিল সেই রূপেতে ॥

(নিধুবাবু)

এমন সময় হন্তদন্ত হইয়া হুয়া প্রবেশ করিল।

হুয়া ॥ এই, থামো, থামো। চুনীলালবাবু এসেছেন।

রতন ॥ যাঃ, সে তো কোন সাধুর পাল্লায় পড়ে বিবাগী হয়ে বৃন্দাবনে গেছে। চালাকি হচ্ছে, না?

হুয়া ॥ গেছে—আবার এসেছে। ছোট গলিতে গাড়ী ঢুকতে দেরী হচ্ছে এই যা। নইলে এতক্ষণ—(বাহিরে ঘনঘন হর্ণের শব্দ) ওই শোনো।

[তৎক্ষণাৎ কক্ষে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। রতনবাঈ বিছানাপত্র

গোছগাছ করিতে ইঙ্গিত করিয়া নিজে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি প্রসাধন কার্য সারিয়া লইল এবং হুয়াকে আদেশ দিল—]

রতন ॥ (হুয়াকে) যা নিয়ে আয়।

[হুয়া চলিয়া গেল]

অর্জুন ॥ লোকটা কে ?

রতন ॥ মস্ত বড় জমিদার—ছোটখাটো একটা রাজা। তুমি ওস্তাদ একটু দূরে দূরেই থেকো।

অর্জুন ॥ কেন বলতো ?

রতন ॥ ওরা হলো সব সহুরেলোক, আর তুমি এতোদিন কলকাতায় রয়েছো—এখনো সেই গেঁয়ো হয়েই রইলে। (অন্যান্যের প্রতি) আর বিপদ ভ্যাখো। দিন বুঝে আজই আবার চাকরটার অসুখ হলো! কে দেবে পান-তামাক, খাবার-টাবারগুলোই বা আনবে কে ?

মানিক ॥ কেন? আমরা আছি, অর্জুন আছে। সবাই মিলে চালিয়ে নেবো—কী বলো অর্জুন ?

[অর্জুন অনেকটা ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। [হুয়ার সহিত চুনীলালবাবু আসিলেন। কলিকাতার সৌখীন কাপ্তেন বলিতে যাহা বুঝায় চুনীলালবাবু তাহাই। বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, তবু একটু বিশেষত্ব আছে, উহা বৃন্দাবনের প্রভাবে মাথায় শিখা ও কপালে তিলক। রতনবাঈ দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে সাদরে বসাইল।]

চুনীলাল ॥ রাধারমণ দয়া করুন। কুশলতো ?

রতন ॥ আর কুশল? কেমন লোক আপনি? বলা নেই, কওয়া নেই, চলে গেলেন!

চুনীলাল ॥ বলা নেই, কওয়া নেই, আবার এলামওতো। সবই রাধারমণের ইচ্ছা। তা দেখছি, আসরটী বেশ জাঁকিয়ে বসেছো। এরা সব কারা ?

রতন ॥ একটা অপেরা পার্টি খুলেছি।

চুনীলাল ॥ অপেরা পার্টি ? সেটা আবার কী ?

রতন ॥ আপনি চলে গেলেন, পেটের দায়ে নাচ গানের একটা দল করে বায়না নিয়ে এখানে সেখানে ঘুরে মরছি।

চুনীলাল ॥ রাধারমণের ইচ্ছায় গিয়েছিলাম, রাধারমণের ইচ্ছায় ফিরে এলাম। আর ফিরে যখন এলাম, রাধারমণের ইচ্ছাটা বেশ বোঝা যাচ্ছে, ওরা থাকবে না, চলে যাক।

রতন ॥ (ইয়ারগণের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া) তা আজ রাতও হয়েছে, তোমরা এখন এসো।

ইয়ারগণ ॥ হঁা—তা—আচ্ছা।

[সকলেরই যাইবার উপক্রম। যাইবার সময়ে জহর অর্জুনকে টানিতে লাগিল।]

রতন ॥ না, না, ওকে আবার নিয়ে যাচ্ছো কেন? ওতো বাড়ীর লোক।

চুনীলাল ॥ বাড়ীর লোক মানে?

রতন ॥ মানে বাড়ীর কাজকর্মের লোক।

চুনীলাল ॥ চাকর?

রতন ॥ (হাসিয়া) এ দুনিয়ায় আমরা সবাই চাকর—সেই রাধারমণেরই। হ্যাঁ, তোমরা এসো।

[সকলে চলিয়া গেল।]

অর্জুন ॥ আমি?

রতন ॥ তুমি কিছু ভালো পান, আর অম্বুরী তামাক নিয়ে এসো—ওই হরেকেষ্টর দোকান থেকে। বলো চুনীলালবাবু এসেছেন। (অর্জুন দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া) আঃ—যাও না।

অর্জুন ॥ ও হরেকেষ্ট-টেষ্ট আমি জানি না। ও আমি পারবো না।

চুনী ॥ কে হে তুমি? হরেকেষ্ট জানো না, যে নামে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পাগল হন? লোকটা কে গা?

অর্জুন ॥ আজ্ঞে, আমি অর্জুন মণ্ডল। (রতনকে দেখাইয়া) ওঁর নাচের সঙ্গে বাঁশী বাজাই।

রতন ॥ তা বাজায়। খুব মিঠে হাত। (অর্জুনকে) কিন্তু পান-তামাক না হলে গানের আসর জমে না। আনোতো। (ইঙ্গিতে) যাও ওস্তাদ! হরেকেষ্টর দোকান—এই সামনের দোকান—আনোতো?

[অনিচ্ছাসত্ত্বেও অর্জুন যাইতে বাধ্য হইল।]

চুনী ॥ এ চীজটি কোত্থেকে আমদানী হলো গো?

রতন ॥ বলবো'খন। মাথায় একটু ছিট্ আছে। কিন্তু এইবার তুমি বলো দেখি, কী করে আমায় ছেড়ে যেতে পারলে? অমন করে পালিয়ে?

চুনী ॥ তা না হয় বলবো'খন। কিন্তু মাথায় ছিট্ আছে এমন লোক নিয়ে তোমার ঘরকন্না! ওরে বাবা, কোনদিন বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে যে। না, না, হয় ওকে তাড়াও, না হয় আমি উঠছি।

রতন ॥ তাতো এখন বলবেই। পায়ে ঠেলে চলে গেলে। একবার ভেবে দেখলে না আমার কী গতি হবে—কোথায় গিয়ে আমি দাঁড়াবো,—দুমুঠো ভাতের জন্যে কার কাছে হাত পাতবো। তাই না আজ এমনি সব লোকের সঙ্গে আমার ঘরকন্না। এটা আমার দোষ, না? মাথা থেকে পাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমায় আজ দুষছো, কেন আমি পাঁকে পড়ে আছি। দোষ তোমার নয়, আমার কপালের।

[রতন ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।]

চুনীলাল ॥ এই কান্না—এই কান্না—বৃন্দাবনেও আমায় রেহাই দেয়নি রতন। কতোরাত স্বপ্নে শুনেছি তোমার এই কান্না, আমার ঘুম ভেঙে গেছে। বুঝলুম রাধারমণের ইচ্ছা নয় তোমায় ছেড়ে আমি বৃন্দাবনে থাকি। নইলে ঘুম ভাঙে কেন? সবাই ঘুমোয়, আমি ঘুমুতে পারি না কেন? তাই চলে এলাম। সবই রাধারমণের ইচ্ছা।

[অর্জুন পান-তামাক লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।]

রতন ॥ আহা, এখানে নিয়ে এলে কেন? ভাখো, হরির মা হয়তো এতক্ষণে বাজার থেকে ফিরেছে। তাকে দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে এসো।

অর্জুন॥ তবে তুমি এসো। কিছু কানে শোনে না। চেঁচামেচি করেও আমি তাকে কিছু বোঝাতে পারিনা।

রতন॥ আচ্ছা, তুমি বাঁশী বার কর। আমি আসছি।

[অর্জুনের হাত হইতে জিনিষপত্র লইয়া রতন চলিয়া গেলে অর্জুন বাঁশী বাহির করিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল।]

চুনীলাল॥ ওহে ওস্তাদ! তোমার মাথায় নাকি একটু ছিট্ আছে?

অর্জুন॥ আজ্ঞে কর্তা তা বলতে পারেন। এই বাঁশীর ছিট্। বংশীবদন হয়েছি কি আমার জ্ঞান থাকে না;

চুনীলাল॥ ও বাবা! বলো কী?

অর্জুন॥ আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তা। আপনি না হয় জমিদার রাজা-গজা মানুষ! কিন্তু আমারও কিছু কম ছিল না। বৌ ছিল দুর্গা—দুর্গা প্রতিমারই মতো! ছেলে ছিল লক্ষ্মণ—যেন সেই রামায়ণেরই লক্ষ্মণ! তা ছিট্ আমাদের সবারই আছে। ছিট্ না থাকলে তুমি যাও বৃন্দাবনে, আর আমি আসি কলকাতায়।

চুনীলাল॥ (হাসিয়া) বাঃ! এতো বেশ বলছো! তুমি তো দেখছি গুণীলোক-হে।

[রতন রেকাবে করিয়া পান লইয়া আসিল।]

রতন॥ গুণী লোক বলতে! গুণী লোক বলেইতো পাড়াগাঁ থেকে ওকে ধরে নিয়ে এসেছি। (বলিতে বলিতে পানের রেকাবীটি চুনীলালের সম্মুখে রাখিল।) ধরোতো ওস্তাদ।

[রতনবাঈ গান ধরিল।]

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥

দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভালো ॥
এ সব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি ॥

(চণ্ডীদাস)

[গানের শেষদিকে রতনবাঈ গাহিতে গাহিতে ভাবাবেগে চুনীলালের গলা জড়াইয়া ধরিল। অর্জুন ইহাতে বিষম চটিয়া গিয়া বাঁশী রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।]

অর্জুন ॥ কী হচ্ছে? কী হচ্ছে এসব? গাইতে হয় গাও। এ ঢলাঢলিতে আমি নেই—এ ঢলাঢলিতে আমি নেই।

[অর্জুন রাগিয়া ঝড়ের মতো বাহির হইয়া গেল। চুনীলাল ও রতন অবাক হইয়া তাহার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

গণেশ মণ্ডলের বাড়ীর অন্দর প্রাঙ্গণ। কাল—মধ্যাহ্ন! ক্রুদ্ধা রুক্মিণী গণেশ মণ্ডলকে মত্তাবস্থায় ধরিয়া টানিতে টানিতে বাহির হইতে লইয়া আসিল।

রুক্মিণী ॥ ফের যদি আবার তাড়ির দোকানমুখো হবে, তাহলে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।

গণেশ ॥ ভাখ রাঙাবৌ, আমি তোর সোয়ামী, মুখ সামলে কথা বলিস।

রুক্মিণী ॥ সোয়ামী না হাতী। কাজের মধ্যে তো রস খেয়ে মাতলামো করা। ক্ষেত-খামার যে সব গেল।

গণেশ ॥ যাক্—চুলোয় যাক্।

রুক্মিণী॥ বটেরে মিন্‌সে—

[গণেশকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল।]

গণেশ॥ (তাহা ঠেকাইয়া) স্তাপ্‌ রাঙাবৌ, বেশী বাড়াবাড়ি করবিতো দোস্ত অর্জুনের মতো আমিও সহরে চলে যাবো।

রুক্মিণী॥ (অঙ্গভঙ্গী সহকারে) আঁ্যা, তুমি যাবে? কোথায় যাবে গো? ইস্‌ মুরোদ। ঠাকুরপোর মতো তেজ আছে নাকি তোমার? সে হ'লো গিয়ে একটা মরদের মত মরদ। তোমার মুরোদ আমার জানা আছে। যত লাফালাফি এই ঘরের কোনে।

[এমন সময়ে বাহির হইতে মহাজনের ডাক শোনা গেল।]

মহাজন॥ ওহে গণেশ মণ্ডল, বাড়ী আছো?

রুক্মিণী॥ এই নাও, মহাজন বাড়ী এসে হাজির। এখন ঠ্যালা সামলাও। জানি, এ গয়নাগুলো আর আমার গায়ে থাকবে না।

[রুক্মিণী ভিতরে চলিয়া গেল। গণেশের নেশা ছুটিয়া গেল। সে কোনরকমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—]

গণেশ॥ (জড়িত কণ্ঠে) দেবো মশায়, দোবো। সুদেআসলে দেবো, এই মাসেই দেবো। পরিবারের সামনে আর গালমন্দ করবেন না মশায়।

মহাজন॥ পরিবার? পরিবার আবার এখানে কোথায়?

গণেশ॥ ও মশায়, আপনি দেখছেন না। আমি দেখছি। আছেন—আছেন। আড়'লে গিয়ে দুচোখ দুশো চোখ হয়েছে আর দুকান হয়েছে দুশো কান। কী চীজ্‌ নিয়ে ঘর করি জানেন না তো মশায়। এখন মানে মানে সরে পড়ুন। (ঘর হইতে বাসন পতনের শব্দ শোনা গেল।) ওই শুনুন—ওই শুনুন। সুরু হয়ে গেছে। দুখানা বাসন ভাঙলো। এবার কার মাথা ভাঙবে ঠিক নেই।

[ইঙ্গিতে চলিয়া যাইবার জন্য গণেশ মহাজনকে কাকুতি-মিনতি জানাইল।]

মহাজন॥ ওরে বাবা! তা যাচ্ছি। কিন্তু এই মাসেই—মনে থাকে

যেন। কথার খেলাপ হলে আর বাড়ী আসবো না। যাবো একেবারে আদালতে। (মহাজন চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় দুর্গা তথায় আসিয়া দাঁড়াইল।) এই যে লক্ষ্মণের মা, তোমাকেও খুঁজে এসেছি। বাড়ী ছিলে না।

দুর্গা ॥ আমিও আপনাকে খুঁজছি, বাড়ী গিয়ে আপনাকে পাইনি।

মহাজন ॥ আমাকে খুঁজছো? পাওনা টাকাগুলো দেবে বুঝি? অর্জুন বুঝি টাকা-কড়ি কিছু পাঠিয়েছে?

দুর্গা ॥ না কর্তা, টাকা-কড়ি এখনও কিছু আসেনি। আপনার বাড়ীতে রোজই ধান ভানছি, কিন্তু আপনার গোমস্তা মজুরী দেয় না। আমার কী করে চলে বলুন?

মহাজন ॥ কি করে চলবে সে তোমার সোয়ামী জানে। ধানভানার মজুরীতে তারই দেনা শোধ হচ্ছে। মানুষটার পেটে পেটে যে এতো শয়তানি ছিল তা কে ভেবেছিল? এমন বৌকে লাথি মেরে বাঈজীর হাত ধরে ড্যাং ড্যাং করে বেরিয়ে গেল। অমন সোয়ামীর মুখে আগুন।

দুর্গা ॥ আপান থামুন। চাষবাসে কিছু থাকে না দেখেই তিনি রোজগার করতে গেছেন।

মহাজন ॥ রোজগার না হাতী। গিয়ে কি কচ্ছেন, সে আমি জানি। তা তোমার পেটের ভাত হয় না, লক্ষ্মণটাকে বসিয়ে রেখেছো কেন? আমার ক্ষেত-খামারে কাজে লাগিয়ে দাও না—দুপয়সা পাবে'খন।

দুর্গা ॥ না, তা হবে না। সে ইস্কুলে পড়ছে। এবার তিন টাকা জলপানি পেয়েছে।

মহাজন ॥ লোকে বলে, গরীবের ঘোড়া রোগ। তোমাদের হয়েছে তাই। তা যাও, জলপানিই খাও। চলি—

[মহাজন চলিয়া গেল।]

গণেশ ॥ (মহাজনের উদ্দেশে চাপা গলায়) শালা!

[অনেকদিনের পুঞ্জীভূত রোষ ও ঘৃণা গণেশের এই একটী কথা "শালা"র মধ্যে প্রকাশিত হইল। ছুটিয়া রুক্মিণী আসিল।]

রুক্মিণী ॥ (গণেশের প্রতি) যত তেজ আড়ালে। সামনে একেবারে কেঁচোটী। (দুর্গাকে দেখাইয়া) ওই মানুষটা মেয়ে মানুষ হোয়েও কেমন দুকথা শুনিয়ে দিলে। সত্যি হোক মিথ্যে হোক্ শোনালে তো।

দুর্গা ॥ মিথ্যে কী বললাম ভাই ?

রুক্মিণী ॥ এই যে তুমি বলে বেড়াও লক্ষ্মণের বাবা তোমাকে বলে-কয়ে সহরে গেছেন। বলে গেলে তুমি তাকে যেতে দিতে ? তোমাকে আমি চিনি না ? বাব্বা ! আমার চোখে ধুলো দেবে তুমি ? সে অনেক দেরী। যাক্… …হঠাৎ গরীবের ঘরে হাতীর পা পড়লো যে।

দুর্গা ॥ আমার বড়ো বিপদ ভাই।

রুক্মিণী ॥ অর্জুন ঠাকুরপো বোধ হয় কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পাঠিয়েছে। রাখবার জায়গা পাচ্ছ না,—এইতো ?

গণেশ ॥ পাঠাবে আমি জানতাম। ওস্তাদ লোক, সহরে গেছে। বাঁশীর সুরে কলকাতার গঙ্গায় জোয়ার-ভাঁটা খেলছে। শয়ে শয়ে টাকা আসছে। আওয়াজ হচ্ছে, ঠন্—ঠন্—ঠন্—ঠন্—ঠন্—ঠন্।

[দুই আঙুল দিয়া টাকা বাজাইবার ইংগিত করিল।]

রুক্মিণী ॥ (রাগিয়া) থামো। (দুর্গার প্রতি) নেশাখোর হাঁদারামকে নিয়েতো আর পারি না ভাই। বলো ভাই—কী তোমার দরকার ? হাতের কাজ ফেলে এসেছি।

দুর্গা ॥ ঘরে আমার আজ চাল বাড়ান্ত ভাই। ছেলেটা না খেয়ে ইস্কুলে গেছে। ফিরে এসে কি খাবে জানি না।

গণেশ ॥ বেশ তো বৌঠান নিয়ে যাও। আহা, কচি ছেলেটা সারাদিন উপোস করে থাকবে ! (রুক্মিণীকে) এই দিয়ে দে—দিয়ে দে।

রুক্মিণী ॥ ইস্ দরদ কতো। যেন গোলা গোলা ধান রয়েছে,—চাইলেই পাওয়া যায়। ওর ছেলে উপোস করে রয়েছে তো আমি কী করবো ? এমনি না পারে, ভিক্ষে করে খাওয়াক। আবার বড়মুখ করে বলা হয়—সোয়ামীকে সহরে রোজগার করতে পাঠিয়েছে।

গণেশ॥ কেন মিছে বকছিস্ বৌ? নিতান্ত দায়ে পড়েই এসেছে। সেরখানেক চাল দিয়ে দিলেই তো হয়।

রুক্মিণী॥ কেন দেবো? চিনিতো ওকে, ভাঙবে তবু মচ্‌কাবে না। কেন? দুগাছা সোনার চুড়ি, খুব কম করে এক ভরি—এখনোতো রয়েছে।

গণেশ॥ হ্যাঁ রয়েছে। থাকলে তোর দুয়ারে এসে হাত পাততো? দিবিনে দিবিনে, বাজে বকিস্ নে।

রুক্মিণী॥ বাজে বকছি আমি? গরব করে বলেনি আমায়, বিয়ে হতে না হতেই ঠাকুরপো তিলজলার জমিটা বেচে সোহাগ করে ওকে দুগাছা চুড়ি দিয়েছিল? বলেছিলো এ না হলে তোমায় মানায় না দুগ্‌গো। সেদিনও তো বলেছে, না খেয়ে মরবে, তবু সেই সোহাগের চুড়ি ও বের করবে না—বেচবে না। যতো সব বড়ো বড়ো কথা—সোয়ামী রোজগার করতে গেছে। কোথায় গেছে—কেন গেছে সে আমরা জানি। আগ ডোম বাগ্‌ডোম গল্প করলেই তো লোকে বিশ্বাস করবে না।

[দুর্গা একবার নিঃশব্দে রুক্মিণীর মুখের দিকে তাকাইয়া চলিয়া গেল।]

রুক্মিণী॥ ওমা, চলে গেলেন। তেজ দেখে আর বাঁচিনে।

গণেশ॥ কেন তেজ করবে না? একদিন ওরও দিন ছিল। কিন্তু তুই যে করে ওকে ফিরিয়ে দিলি, আমি অবাক হচ্ছি। দুধের ছেলে লক্ষ্মণ,—তার মুখের দিকেও তুই চাইলিনে। ছেলের মা তো নস্, তাই তুই পারলি।

রুক্মিণী॥ (কাঁদিয়া ফেলিয়া) তুই এতো বড়ো কথা আমায় বললি? এতো বড়ো কথা তুই আমায় বললি? ছেলের মা নই বলেই তো আজ আমার এত দুঃখ।

[রুক্মিণী ফুঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভিতরে গেল।]

গণেশ॥ রুক্মিণী! শোন্—শোন্—

[পিছনে পিছনে গেল।]

তৃতীয় দৃশ্য

অর্জুন মণ্ডলের বাড়ীর প্রাঙ্গণ। কাল—অপরাহ্ণ। স্বর্ণকারকে সঙ্গে লইয়া দুর্গা বাহির হইতে আসিল।

দুর্গা ॥ স্যাকরা মশায়, আপনি এখানে বসুন। আমি এখনি আনছি।

[দুর্গা ভিতরে চলিয়া গেল। স্বর্ণকার দাওয়ায় বসিল। কিছুপরেই দুর্গা ভিতর হইতে দুই গাছা সোনার চুড়ি লইয়া আসিয়া উহা স্বর্ণকারের হাতে দিল।]

দুর্গা ॥ এই নিন্।

স্বর্ণকার ॥ (চুড়ি দুই গাছা নাড়িয়া দেখিয়া) হ্যাঁ, এ-তো আমারই হাতের কাজ। বিয়ের বছরে অর্জুন তিলজলা জমিটা বেচে দিলে। আমি বললুম কাজটা কি ভাল করলে ? লক্ষ্মী বেচলে ! হেসে বললে, জমি থাকবে না খুড়ো। যাবে মহাজনের গর্ভে। বরং আমার লক্ষ্মীর গায়ে উঠুক—তবেই থাকবে।

দুর্গা ॥ আর থাকলো না খুড়ো। তাঁর দেওয়া এই প্রথম জিনিষটা যখের ধনের মত আগলে রেখেছিলাম এদ্দিন কিন্তু আর পারলাম না।

স্বর্ণকার ॥ তাইতো, কী যে হলো, কোথায় যে গেলো। উচ্ছন্নে গেছে।

দুর্গা ॥ না, না, তা যায়নি। আমাকে সে ভুলতে পারে না—পারে না, না। রোজগার করতেই গেছে, টাকাও একদিন পাঠাবে। কিন্তু আমি আর চালাতে পারছি না। এটা রেখে কত টাকা আমায় দিতে পারেন আপনি ?

স্বর্ণকার ॥ তা গোটা পঞ্চাশেক কেন দিতে পারবো না ?

দুর্গা ॥ না, না, তাতে তো আমার হবে না। শ'খানেক টাকা আমার চাই।

স্বর্ণকার ॥ তবে মা এটা তোমায় বেচতে হয়।

দুর্গা ॥ হ্যাঁ, আমি বেচবো। (হঠাৎ স্বর্ণকারের হাত দুটি চাপিয়া ধরিয়া) কিন্তু একথা কেউ যেন জানে না।

স্বর্ণকার ॥ ছিঃ মা! এসব কথা কি আমরা কাউকে বলি। এর কথা তাকে, তার কথা একে বললে কি আমাদের ব্যবসা চলে? সে তুমি ভেবো না। আমার সঙ্গে দোকানে এসো। ওজন করে, দাম কষে, এখুনি টাকা দিচ্ছি।

দুর্গা ॥ চলুন আমি ঘরটা বন্ধ করে আসছি। না থাক। স্কুল থেকে লক্ষ্মণের আসার সময় হয়েছে। খোলাই থাক্। আর কী বা আছে! আমার সব গেছে—সব গেছে।

[স্বর্ণকারের সঙ্গে দুর্গা বাহিরে চলিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে কলাপাতা চাপা দিয়া ভাতের থালা তরকারির বাটী লইয়া অতি সন্তর্পনে রুক্মিণী আসিল।]

রুক্মিণী ॥ মণ্ডল গিন্নী! মণ্ডল গিন্নী! (খানিকটা আগাইয়া গিয়া)ওমা, সব গেল কোথায়! ঘরের দরজা খোলা, অথচ কেউ নেই! (এদিক ওদিক চাহিয়া) লক্ষ্মণ,—ও লক্ষ্মণ! ইস্কুলের বই টইও তো দেখছি না। তবে এখন আসেনি।

[ভাত-তরকারী দাওয়ায় নামাইয়া রাখিয়া রুক্মিণী একটী পিঁড়ি টানিয়া লইয়া বসিল। বাহির হইতে লক্ষ্মণের গলা শোনা গেল।]

লক্ষ্মণ ॥ মা! মা! শীগ্‌গির খেতে দাও। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।

[বই খাতা হাতে লক্ষ্মণ ছুটিয়া আসিল।]

রুক্মিণী ॥ মা বাড়ী নেই।

লক্ষ্মণ ॥ (চমকাইয়া উঠিয়া) বাড়ী নেই! এখন খাবো কি? জানো, মা খেয়ে ইস্কুলে গিয়েছি।

রুক্মিণী ॥ (হাসিয়া) সে জন্তেই তো বসে আছি বাবা। তোর জন্তে খাবার ঢাকা দিয়ে, আমাকে বসিয়ে রেখে গেছে তোর মা।

লক্ষ্মণ ॥ (খুসী হইয়া) তাই বল।

[রুক্মিণী ঢাকা তুলিয়া সযত্নে থালা সাজাইয়া লক্ষ্মণকে খাইতে দিল। খাইতে বসিয়া লক্ষ্মণ হাসিমুখে সানন্দে কহিল—]

লক্ষ্মণ ॥ দেখেছো মাসী, মা আজ রেঁধেছে কতো, যেন নেমন্তন্ন।

রুক্মিণী ॥ তা আর রাঁধবেনা? তোর বাবা শ'য়ে শ'য়ে টাকা পাঠাচ্ছে। তোদের তো এখন পোয়াবারো।

লক্ষ্মণ ॥ আমার বাবা কী যে সে লোক ভেবেছো? বাবা কল্‌কাতায় কলের বাজনা বাজায়।

[ক্ষুধার তাড়নায় লক্ষ্মণ গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল।]

রুক্মিণী ॥ (কিছু পরে) হঁ্যারে, মাছের ঝোলটা কী আজ খুব ঝাল লাগছে?

লক্ষ্মণ ॥ নাঃ খুব ভালো হয়েছে। আমার মায়ের মতো কেউ ভালো রাঁধতে পারে না।

[এমন সময় বাহির হইতে দুর্গা আসিল। প্রবেশ পথেই সে লক্ষ্মণের কথা শুনিতে পাইয়া বলিল—]

দুর্গা ॥ না, পারে না! একী!

[প্রথমে একটু অপ্রস্তুত হইলেও, পর মুহূর্তেই রুক্মিণী নিজেকে সামলাইয়া লইল।]

রুক্মিণী ॥ নাও গো, এইবার তোমার ছেলেকে খাওয়াও। আমি সামনে থাকলে হয়তো আবার ছেলের খাওয়া হবে না।

[দুর্গার প্রতি রোষকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া রুক্মিণী চলিয়া গেল।]

লক্ষ্মণ ॥ মা আজ খুব ভালো রেঁধেছো তো? এই ছাখ একটা ভাতও পড়ে নেই।

দুর্গা ॥ ভাত? কোথায় পেলিরে?

লক্ষ্মণ ॥ বারে, তুমি ভাত ঢাকা দিয়ে রুক্মিণী মাসীকে বসিয়ে রেখে গেছো, আবার বলছো—ভাত কোথায় পেলি?

[দুর্গা এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝিল। দেখা গেল তাহার চোখে জল ও মুখে হাসির রেখা।]

দুর্গা ॥ রুক্মিণী মাসী বললে বুঝি ?

লক্ষ্মণ ॥ হঁ্যা, বললে তো। (উঠিয়া গিয়া মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া) মা, বাবা বুঝি টাকা পাঠিয়েছে ? তাই এতোসব তোমার রান্নাবান্না আজ।

দুর্গা ॥ না বাবা এখনো পাঠান নি। তবে পাঠাবেন, শীগ্‌গিরই পাঠাবেন। এই আজ কালই আসবে দেখো।

লক্ষ্মণ ॥ টাকা নিয়ে নিজে কেন তিনি আসবেন না মা ? আমি যে জলপানি পেয়েছি, তা কি তিনি একবার এসে দেখবেন না ?

দুর্গা ॥ কেন আসবেন না ? নিশ্চয়ই আসবেন। ভালো ছেলে বলে তোমার নাম যখন চারিদিকে আরও ছড়িয়ে পড়বে, তখন তিনি না এসে পারবেন ?

লক্ষ্মণ ॥ বাবার নাম চারিদিকে খুব ছড়িয়ে গেছে, না মা ? সেদিন খবরের কাগজে পড়ছিলাম, লাট-সাহেবের বাড়ীতে গানের জলসা হয়েছিল। আচ্ছা মা, সে জলসায় বাবার নিশ্চয়ই ডাক পড়েছিলো—কি বল ?

দুর্গা ॥ কি জানি বাবা। তা পড়তেও পারে।

লক্ষ্মণ ॥ আচ্ছা মা, বাবা আমায় চিঠি লেখেন না কেন ?

দুর্গা ॥ হয়ত সময় পান না বাবা।

লক্ষ্মণ ॥ এতো টাকা রোজগার করছেন শুনি—টাকা পাঠান না কেন ?

দুর্গা ॥ তোমার বাবাকে তুমি জানো না ? কারুর দুঃখ তিনি সইতে পারেন না। রোজগার হয়তো করছেন, সেই সঙ্গে দান-ধ্যানও করছেন। এখানে যখন এতো টানাটানি—ভাত জুটতো না, তখনও আধপেটা খেয়ে নকুলকে, হাবুলকে—এদেরতো সব খাইয়েছেন।

লক্ষ্মণ ॥ কিন্তু মা, বাবা যদি কিছু টাকা পাঠাতেন, আমাদের ক্লাসের ওই রমেনকে, ওই রামকে ধরে এনে দেখাতাম, আমার বাবা যে কতো বড় সে কথা সত্যি কি না।

দুর্গা ॥ থাক্ বাবা, লোকের কথায় কি আসে যায়। আমার শুধু একটা আশা বাবা, তুমি তোমার বাবার চেয়েও বড় হও।

লক্ষ্মণ ॥ তুলসীতলায় প্রণাম করতে হরি ঠাকুরকে রোজই আমি বলি মা আমার বাবা এতো বড়—আমিও যেন বড় হই।

দুর্গা ॥ হবে বাবা। নিশ্চয়ই হবে।

[পুত্রকে বুকে টানিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।]

চতুর্থ দৃশ্য

সদরের ডাকঘরের সম্মুখস্থ পথের ধারে একটি গাছের তলায় গাদা-গাদি ভীড়ের মধ্যে বসিয়া এক বৃদ্ধ মনি-অর্ডার-লেখক নিজ কর্মে রত। চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম্য নিরক্ষর লোকের এই ধরণের কাজের একমাত্র নির্ভর উক্ত ব্যক্তির অনুগ্রহ। কিন্তু এই অনুগ্রহ করিতে যাওয়ারও যে কি ঝকমারী, তাহা আজ মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছে লেখকটি।

লেখক ॥ কতো টাকা ?

প্রেরক ॥ পাঁচ সিকে।

লেখক ॥ কে পাবে ?

প্রেরক ॥ যজ্ঞেশ্বর মোহান্তি.

লেখক ॥ কি বললে ? বানান করে বল বাপু।

প্রেরক ॥ বানানই যদি করতে পারবো, তবে পয়সা খরচ করে আপনাকে দিয়ে লেখাবো কেন মশাই ?

লেখক ॥ উঃ। গ্রামের নাম ?

প্রেরক ॥ বজ্রডম্বুরা।

লেখক ॥ ওরে বাবা। পোষ্টাফিস ?

প্রেরক ॥ ত্র্যম্বকেশ্বর।

লেখক ॥ এই মেরেছে। কে পাঠাচ্ছে ?

প্রেরক ॥ পুণ্ডরীকাক্ষ কুণ্ডু।

[লেখক মহাশয়ের ধৈর্য এবার সীমা অতিক্রম করিল।]

লেখক ॥ (ভঙ্গী করিয়া) পুণ্ডরীকাক্ষ কুণ্ডু! হবে না বাপু, এ চার পয়সার কর্ম নয়।

প্রেরক ॥ তা বেশ, দু আনাই নেবেন—আপনি লিখুন।

লেখক ॥ নামটা আবার বল।

প্রেরক ॥ পুণ্ডরীকাণ্ড কুণ্ডু।

লেখক ॥ পুন্‌-ড-রি-কা-খ্‌—এই যা নিবের দফা গয়া।

প্রেরক ॥ কিন্তু কুপন যে এখনো লেখা হোলো না ?

লেখক ॥ আর হবেও না। এই পাঠাতে হয় পাঠাও, নয়তো আর কাউকে দিয়ে লেখাও।

প্রেরক ॥ আবার কাকে পাই বলুন তো ? আমরা গাঁয়ের লোক সহরে এখানে কাকেই বা চিনি বলুন ?

লেখক ॥ অতো শতো জানিনে। কেটে পড় বাবা, কেটে পড়। যত্তো সব উঃ।

প্রেরক ॥ কাকে আবার পাই।

[ক্ষুণ্নমনে চলিয়া গেল। হঠাৎ লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল দুর্গা। সে কখন আসিয়া ঐখানে দাঁড়াইয়া আছে; লেখকের সম্মুখে আসিয়া বলিল—]

দুর্গা ॥ আমারটা লিখে দিন না!

লেখক ॥ দাঁড়াও, নিবটা বদলে নিই। যা বানানের ঠেলা—বাবারে বাবা। (কলমের নিব বদলাইয়া লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়া) কতো টাকা ?

দুর্গা ॥ একশো।

লেখক ॥ কে পাবে?

দুর্গা ॥ দুর্গামণি দাসী।

লেখক ॥ এইবার ঠিকানা—কার বাড়ী?

দুর্গা ॥ লিখুন লক্ষ্মণ মণ্ডলের বাড়ী।

লেখক ॥ না! আজ দেখছি দিনটাই খারাপ। কোন্ পাড়া?

দুর্গা ॥ উত্তর পাড়া।

লেখক ॥ গ্রামের নাম?

দুর্গা ॥ কল্যাণপুর।

লেখক ॥ পোষ্টাফিস?

দুর্গা ॥ শ্যামনগর।

লেখক ॥ কে পাঠাচ্ছে?

[দুর্গা নীরব]

লেখক ॥ কে পাঠাচ্ছে—তার নামটা বল।

দুর্গা ॥ লিখুন— (থামিল)

লেখক ॥ বল।

দুর্গা ॥ অর্জুন মণ্ডল।

লেখক ॥ কুপনে কী লিখবে?

দুর্গা ॥ আপনি লিখে দিন।

লেখক ॥ লিখবোতো আমি, কিন্তু কী লিখবো—বল না?

দুর্গা ॥ সে অনেক কথা। আপকে শুনতে হবে—আপনাকে লিখে দিতে হবে—আপনার পায়ে পড়ি।

লেখক ॥ সে কী মা? ব্যাপার কী? আচ্ছা বল।

দুর্গা ॥ এখানে অনেক লোক। আপনি দয়া করে একটু ওদিকে চলুন—আড়ালে আপনাকে সব কথা বলবো।

লেখক ॥ বেশ, চল।

[লেখক ও দুর্গা চলিয়া গেল। অন্যান্য লোকেরা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল।]

১ম লোক ॥ নাও হলো তো।

২য় লোক ॥ ও বুঝলে না? আড়ালে গিয়ে কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলে বেচারীর মজুরীটা মারবে।

১ম লোক ॥ সে আমি দেখেই বুঝেছি। মেয়েমানুষের ব্যাপারই আলাদা। চল দেখি ওদিকে আর কেউ লিখছে কিনা।

২য় লোক ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই যে আর একজন।

[সেই দিক লক্ষ্য করিয়া উভয়ে চলিয়া গেল।]

পঞ্চম দৃশ্য

অর্জুন মণ্ডলের বাড়ীর সম্মুখস্থ পথ। সময়—দ্বিপ্রহর। কল্যাণপুরে সপ্তাহে মাত্র একদিন শ্যামনগর ডাকঘর হইতে পিওন আসিবার নিয়ম। ঐ দিন এই নির্দিষ্ট স্থানে গ্রামের লোকেরা তাহার অপেক্ষা করে। বিশেষ দরকার না হইলে পিওনের প্রতি বাড়ী যাওয়ারও বড়ো একটা দরকার হয় না। আর বিশেষতঃ গ্রামটীও চাষীপ্রধান বলিয়া গ্রামবাসীর নিত্য চিঠিপত্র লিখিবার ও পাইবার সম্ভাবনাও খুবই কম থাকে। কিন্তু আজ গ্রামের বনমালী বিশেষ একটা চিঠির প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে—কখন পিওন আসিবে। আজ একমাস হইল তাহার 'ইস্ত্রী' সেই যে তাহার ভায়ের বাড়ী গিয়াছে, আর তাহার পৌছানো খবর দিবার নামটিও নাই। সেই চিঠি পড়িয়া শুনাইবার লোকও তাহার এখানেই মজুত।

বনমালী ॥ না। পিওন মহারাজের এখনো দেখা নেই। আসবিতো বাপু হপ্তায় একদিন। —তা একটু সকাল সকাল আয়।

হারু ॥ ব্যাপার কি হে বনমালী? ডাক্-পিওনের জন্যে একেবারে ছট ফট্ করছো যে।

বনমালী ॥ ছট্ ফট্ করবো না? তুই বলিস কী হারু? আজ একমাস হলো গেছে—

হারু ॥ কে?

বনমালী ॥ কে আবার! আমার মূলধন—আমার ইস্ত্রী। আজ একমাস হলো—সেই যে তার ভাইএর বাড়ী গেছে, তার পৌছনো খবরটুকুও দেবার নামটি নেই। ভালোয় ভালোয় পৌছলো কিনা, সেখানে কেমন আছে, কবে আসবে—এইসব খবর জানবার জন্যে মনটা ছটফট্ করবে না? কী বলো হে দাশু?

দাশু ॥ হাঁা, তা করবে বৈকি!

রাখাল ॥ তারওপর যে সে ইস্ত্রী নয়, দ্বিতীয় পক্ষের ইস্ত্রী! শিবরাত্রির সলতে। কেমন? ঠিক নয় কি বনমালী দা?

বনমালী ॥ যা, যা, ফাজলামো করিস্‌নি রাখাল। এখন মন-মেজাজ ভালো নেই। (দাশুকে) ছাখো দাশু, আজ নিশ্চয়ই চিঠি আসবে,—আমার মন বলছে। চিঠিটা এলে তুমিও পড়িয়ে শুনিয়ে দিও ভাই। আমার বিদ্যের দৌড় তো জানো।

দাশু ॥ আচ্ছা, আচ্ছা, আগে আসুক না তোমার চিঠি। পড়ে শুনিয়ে দেবে 'খন। কিন্তু আমার কথাটা যেন মনে থাকে। আজ দু'দিন হরি-মটর চলছে! (হঠাৎ) ওই যে এসে গেছে, এসে গেছে—

বনমালী ॥ (উৎফুল্ল হইয়া) এঁ্যা! এসে গেছে?

[গ্রাম্য ডাক-পিওন আসিল। তাহার হাতে একগোছা চিঠি, কাঁধে ব্যাগ। তাহার পিছনে পিছনে একদল কৌতূহলী বালক-বালিকাও আসিল।]

রাখাল ॥ আমার চিঠি আছে ?

পিওন ॥ কী নাম ?

রাখাল ॥ রাখাল মণ্ডল।

পিওন ॥ না। (রাখাল চলিয়া গেল।)

বনমালী ॥ দোহাই মা কালি !···আমার আছে ?

পিওন ॥ কি নাম ?

বনমালী ॥ শ্রীবনমালী দাস।

পিওন ॥ নেই।

বনমালী ॥ (হতাশভাবে) নেই ?

[বনমালী হতাশভাবে ধপাস্ করিয়া পথেই বসিয়া পড়িল।]

দাশু ॥ আরে, আরে বসে পড়লে যে ?

বনমালী ॥ আজও চিঠি এলো না দাশু। এতোকরে বলে দিলুম, বাপের বাড়ী পৌছেই চিঠি দেবে। কি জানি কেমন আছে।

দাশু ॥ কেন মিছে ভাবছো ? ভালই আছে। ওঠো দেখি—বাড়ী চলো। আবার আসছে হপ্তায় দেখা যাবে।

[বনমালীকে উঠাইয়া লইয়া দাশু চলিয়া গেল। হারু উক্ত দৃশ্য উপভোগ করিতে লাগিল।]

পিওন ॥ আচ্ছা, এ গাঁয়ে দুর্গামণি দাসী কে—লক্ষণ মণ্ডলের বাড়ী ?

হারু ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে। কেন বলতো ভাই ?

পিওন ॥ টাকা এসেছে।

হারু ॥ টাকা ! টাকা কে পাঠিয়েছে ?

পিওন ॥ অর্জুন মণ্ডল।

হারু ॥ কত টাকা ?

পিওন ॥ একশো টাকা।

হারু ॥ ওরে বাবা ! একশো টাকা অর্জুন মণ্ডল পাঠিয়েছে ? সত্যি সত্যি পাঠিয়েছে ?

পিওন ॥ সত্যি নয়তো কি মিথ্যে? তা লক্ষণ মণ্ডলের বাড়ী তুমি চেনো নাকি?

হারু ॥ চিনি মানে? আরে এইতো বাড়ী। তুমি দাঁড়াও আমি লক্ষণকে ডাকছি।

[হঠাৎ গণেশ সেখানে আসিয়া হাজির।]

হারু ॥ এই যে গণেশ ভাই, শুনছো ব্যাপার?

গণেশ ॥ কি?

হারু ॥ আরে অর্জুন সত্যি সত্যিই বউকে টাকা পাঠিয়েছে। এক নয়—দশ নয়—একশো টাকা।

গণেশ ॥ (আশ্চর্য্য হইয়া) তাই নাকি! বল কী হে?

হারু ॥ পেত্যয় না হয় তো জিজ্ঞেস্ কর। এই তো পিওন সাহেব দাঁড়িয়ে।

[হারু খানিকটা গিয়া লক্ষণকে ডাকিতে লাগিল—]

হারু ॥ লক্ষণ! লক্ষণ! আরে তোর বাবা তোর মাকে একশো টাকা পাঠিয়েছে। এই যে পিওন এসেছে—ও লক্ষণ—

[লক্ষণ বাহিরে আসিল।]

হারু—তোর মাকে ডাক্ শীগ্‌গির—ডাক্ ডাক্—

[লক্ষণ উৎফুল্লচিত্তে ছুটিল।]

হারু ॥ গণেশ ভাই। এমন জবর খবরটা আমি গাঁয়ের সবাইকে জানাই গিয়ে।

[হারু দ্রুতপদে চলিয়া গেল। লক্ষণ দুর্গাকে লইয়া আসিল।]

লক্ষণ ॥ মা, মা। ঐ দেখ বাবা সত্যিই টাকা পাঠিয়েছে।

গণেশ ॥ আরে বাবা, দোস্ত যে টাকা পাঠাবে তা আমি আগেই গাঁ শুদ্ধ লোককে বলে রেখেছি।

পিওন ॥ তোমারই নাম দুর্গামণি দাসি?

গণেশ ॥ হ্যাগো, হ্যাঁ।

পিওন ॥ ঠিক জানো?

গণেশ ॥ বারে! পাশের বাড়ীতে থাকি। আর অমি জানবো না. এখনও সে পেটে পড়েনি বাবা যে ভুল হবে।

পিওন ॥ তোমার নাম?

গণেশ ॥ হেঁ—হেঁ—শ্রীগণেশ চন্দ্র দাস।

পিওন ॥ তোমায় সাক্ষী হতে হবে।

গণেশ ॥ আলবাৎ হবো।

পিওন ॥ লিখতে পারো?

গণেশ ॥ লেখা? না পিওন বাবা, ও সব অভ্যেস্ নেই—আসে না। তা শিখছি একটু একটু—ওই রাঙা বৌএর কাছে।

পিওন ॥ হুঁ। তাহলে দেখছি—আঙ্গুল দেখি। উঁহু, বুড়ো আঙ্গুল।

[গণেশের টীপসই লওয়ার পর দুর্গার উদ্দেশ্যে পিওন বলিল—]

পিওন ॥ দুর্গামণি দাসী, তোমার টিপসই লাগবে এইখানে। এই—হুঁ। আর এই খানে।

[দুর্গার টিপসই লওয়ার পর পিওন ব্যাগ হইতে টাকা বাহির করিয়া দুর্গার হাতে গুনিয়া গুনিয়া একশো টাকা দিল। খানকয়েক দশ টাকা-পাঁচটাকার নোট ও খানকয়েক এক টাকার নোট।]

পিওন ॥ এই হোলো একশো টাকা।

গনেশ ॥ কোথায় আছে? কেমন আছে? (নেপথ্যের উদ্দেশ্যে) রাঙাবৌ, একবার এসোনা, এদিকে।

[পিওন কুপন ছিঁড়িয়া গণেশের হাতে দিয়া চলিয়া গেল। রুক্মিণী আসিয়া গণেশের হাত হইতে উহা লইয়া পড়িতে স্বরু করিল। তাহার এই পড়ার ধরণ দেখিয়া বুঝা গেল তাহার বিদ্যার দৌড় বেশী দূর নয়।]

রুক্মিণী ॥ (পড়িতে লাগিল) "আমার দুর্গামণি। (রুক্মিণীর ভ্রু কুঞ্চিত হইল) মেলায় মেলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। তাই সময়মত টাকা পাঠাইতে পারি নাই। আজ একশত টাকা পাঠালাম। তোমার জন্তে মনটা বড়ই হহ

করে। (মুখ নাড়া দিল) আমার লক্ষ্মণ ভালো আছে তো? কলিকাতায় ফিরিয়া বাসা করিতে পারিলেই তোমাদের লইয়া আসিব। আমার খুব নাম হইয়ছে, বেতন আরও বাড়িবে। তুমি আমার ভালোবাসা জানিবে। তোমারই অর্জুন।"

[শেষ কথাটী পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রুক্মিণী দুর্গার পানে কটাক্ষ হানিয়া পুনরায় মুখনাড়া দিল।]

গণেশ ॥ তবে চললুম রাঙাবৌ।

রুক্মিণী ॥ কোথায় গো!

গণেশ ॥ দোস্তর কলকাতার বাসায়। টাক ডুমাডুম্ ডুম—

[গণেশ নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল।]

রুক্মিণী ॥ (দুর্গাকে) আমাদের ভাই আজ মিষ্টিমুখ করাতে হবে।

দুর্গা ॥ হ্যাঁ! হ্যাঁ, তা হবে বইকি! লক্ষ্মণ, যাতো বাবা মিষ্টি কিনে আন্।

[লক্ষ্মণকে টাকা দিয়া উপস্থিত বালক-বালিকাগণকে বলিল—]

দুর্গা ॥ সন্ধ্যে গড়ালে তোমরা সব এসো।

লক্ষ্মণ ॥ আসবে সব।

বালক বালিকাগণ ॥ মিষ্টি খাবোরে—সন্ধ্যে বেলা মিষ্টি খাবোরে—

[বালক-বালিকাগণ নাচিতে নাচিতে লক্ষ্মণের সহিত চলিয়া গেল।]

রুক্মিণী ॥ সত্যি, মানুষকে চিনতে যে কতো ভুল হয়, আজ তা বুঝছি। তুই ভাই, আমাকে মাপ কর।

দুর্গা ॥ সন্ধ্যেবেলা এসো—কেমন?

রুক্মিণী ॥ (দুর্গার চিবুকটী নাড়িয়া দিয়া) আচ্ছা লো, আচ্ছা, আনন্দ যে আর ধরেনা দেখছি।—

[রুক্মিণী চলিয়া গেলে দুর্গা হাতের টাকাগুলির দিকে একবার চাহিল। তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।]

দুর্গা ॥ কিন্তু একী লজ্জা, আজ আমার একী লজ্জা!

[দুর্গা চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় বিপরীত দিক হইতে লক্ষ্মণের সহিত মহাজন ও গোমস্তা দুর্যোধন আসিয়া উপস্থিত হইল।]

মহাজন ॥ এই যে লক্ষ্মণের মা। (দুর্গা থমকাইয়া দাঁড়াইল) শুনে আমিও খুব খুশী হয়েছি। অর্জুন যে এমনি একটা বড় কিছু করবে—তা' আমি জানতাম। শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়। একি শুধু তোমার একবার মাথা উঁচু হয়েছে—আজ আমাদের এই গাঁটা উজ্জল হয়ে গেল। কী বল দুর্যোধন?

[মহাজন গোমাস্তাকে ইসারা করিল।]

দুর্যোধন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, তাতো বটেই। তা, লক্ষ্মণের মা, কথায় বলে, শত্রুর শেষ আর ঋণের শেষ রাখতে নেই। তাই বলছিলাম কি, হাতে যখন টাকা এসে পৌঁছেচে, অন্তত আমাদের পাওনা সুদটা শোধ করে দাও।

মহাজন ॥ তা দেবে, তা দেবে। হাতে টাকা থাকলে এদেশে কেউ জমিদার-মহাজনকে ফাঁকি দেয় না। দুর্যোধন, হিসেবটা বের কর।

[দুর্যোধন দপ্তর বাহির করিয়া হিসাব দেখাইতে যাইতেছিল দুর্গা তাহাকে বাধা দিয়া কহিল—]

দুর্গা ॥ থাক্ কতো টাকা—তাই বলুন।

দুর্যোধন ॥ কুড়োবা কুড়োবা কুড়োবা লিজ্জে—তা শ' খানেক টাকা হ'লে হালের সুদটা মিটে যায়।

দুর্গা ॥ লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ ॥ মা!

দুর্গা ॥ তোমার হাতের টাকা দিয়ে দাও।

লক্ষ্মণ ॥ দিয়ে দেবো?

দুর্গা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ—

[লক্ষ্মণের হাত হইতে টাকা কাড়িয়া লইয়া সবনোটগুলো মহাজনের সম্মুখে ছুঁড়িয়া দিল। দুর্যোধন বিনা বাক্যব্যয়ে ওইগুলি কুড়াইতে লাগিল।]

দুর্গা ॥ ওগো, শুধু একটা নোট আমায় ভিক্ষে দাও। আজ একমাস গরুগুলোকে পেট ভরে খাওয়াতে পারিনি। যেমন করে পারি তোমাদের দেনা শোধ করবো—আজ শুধু একটা নোট ভিক্ষে চাইছি।

মহাজন ॥ ইস্! নিজেদের পেটে ভাত জোটে না, আবার গরুর জন্যে দরদ কতো! চলে এসো দুর্যোধন, চলে এসো।

[মহাজন ও গোমস্তা চলিয়া গেল। উহাদের গমন পথের দিকে একবার দেখিয়া লইয়া লক্ষ্মণ বলিল—]

লক্ষ্মণ ॥ ওরা মানুষ নয় মা, ওরা চামার, ওরা কসাই। চল মা, বাড়ীতে চল।

[দুর্গা কোনও কথা বলিতে পারিল না। লক্ষ্মণকে লইয়া চলিয়া গেল।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

কলিকাতায় রতন বাঈজীর ঘর। রতনবাঈ ও তাহার ইয়ারগণ আলোচনায় রত। অর্জুনও সেখানে উপস্থিত আছে।

জহর ॥ কাজটা কী ভালো হচ্ছে বাইজী? আমাদের এতোগুলো লোকের যাহোক তবু কিছু জুটছিল একসঙ্গে। বলা নেই, কওয়া নেই আমাদের ফেলে তুমি বৃন্দাবনে চললে।

রতন ॥ ভাত-কাপড় দিয়ে চিরদিন তোমাদের পুষতে হবে এমন কোনও দাসখৎ লিখে দিয়েছি কী আমি?

মানিক ॥ না, তা লিখে দাওনি বটে, কিন্তু ওই চুনীলালবাবু যেদিন তোমাকে পায়ে ঠেলে চলে গিয়েছিলো, তোমার ভাত-কাপড়ও আর যখন ভাল করে

জুটছিল না, তখন এই শর্মাদের কাছে কেঁদে বলেছিলে,—তোমরা একটা কিছু কর ভাই, আর তো চলে না।

ছয়া ॥ আমাদের যার যা কিছু ছিল, বৌ-ছেলেকে বঞ্চিত করে—তাদের এরকম পথে বসিয়ে—তোমা'কে নিয়ে নাচের এই দল গড়লাম আমরা। মেলায় মেলায় ঘুরে দলের সুখ্যাতিও হলো ঢের, টাকাও এলো বেশ। আজ চুনীবাবুর এককথায় তুমি আমাদের এমনি করে লাথি মেরে চলে যাচ্ছো! এটা কি উচিৎ হচ্ছে?

রতন ॥ না, না, তোমরা চটছো কেন ভাই? একটা লোক আমার জন্যে অমন ঘর-সংসার ছেড়ে আমার হাত ধরে তীর্থ করতে যেতে চাইছে। কোন্ প্রাণে আমি তাঁকে 'না' বলবো ভাই?

জহর ॥ তীর্থই বটে!

মানিক ॥ বিষয়-সম্পত্তি ছেড়েই বটে! কাকে কী বোঝাচ্ছো বাঈজী।

অর্জুন ॥ ঘর-সংসার ছেড়ে ওই লোকটা যাচ্ছে? ওদের অবার ঘর-সংসার! ঘর-সংসার ছেড়ে এসেছি আমি। দুর্গার মতো বউ, লক্ষ্মণের মত ছেলে—

রতন ॥ থাক্ থাক্ আর মড়াকান্না কাঁদতে হবে না। রোজই ঐ এককথা—বৌ-ছেলে ছেড়ে কে তোমাকে আসতে বলেছিল?

অর্জুন ॥ তা ঠিক, তুমি আমায় মানা করেছিলে—আমি তোমার হাতে পায়ে ধরে চলে এসেছিলাম। তাদের ভুলতে চেয়েছিলাম। তাদের ভুলেছি। কোন খোঁজখবর নিইনি তাদের এতদিন—এতকাল। তাদের কাছে দাঁড়াবার আর মুখ নেই। না, না, তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো। যেখানেই যাও, আমায় তুমি সঙ্গে নাও। আমার আর দাঁড়াবার কোন পথ নেই।

রতন ॥ আচ্ছা, আমি ওঁর কাছে তোমাদের সবার কথাই আবার বলে দেখবো। এও তো হতে পারে, দলটা চালু রাখার জন্যে বেশ কিছু মোটা টাকা হয়তো উনি তোমাদের দিয়ে যেতে পারেন।

জহর ॥ তবে তাই-ই ভাখো। মন্দের ভালো—কী বল? বড়লোকের খেয়াল,—বলা তো যায় না, আবার যদি পায়ে ঠেলেন, তবু যা হোক্ তুমি এখানে আবার দাঁড়াতে পারবে—ভেসে যাবে না।

হুয়া ॥ মানে,—মানে, আমরা তোমার একটা জমিদারী হয়ে থাকবো।

রতন ॥ বেশ। তোমরা তাহলে এখন এসো ভাই। ওঁর আসবার সময় হয়েছে। উনি এসে একা আমায় চান—বোঝতো?

সকলে ॥ আচ্ছা—আচ্ছা—

জহর ॥ ওই জমিদারীর কথাটা যেন মনে থাকে।

[ইয়ারগণ চলিয়া গেল।]

রতন ॥ তুমি যাও ওস্তাদ। আমার কাছে আর কেউ থাকে উনি তা সইতে পারেন না।

অর্জুন ॥ আমি—আমিও থাকতে পারবো না তোমার কাছে?

রতন ॥ হ্যাঁ। উনি মালিক, আমি কি করবো বল।

অর্জুন ॥ মালিক, উনি ত তোমার মালিক, আর—আর আমি—তোমার কেউ নই? তোমার গানের আসরেও কি আমার দরকার হবে না?

রতন ॥ না। এখানকার কোন লোক উনি আমার সঙ্গে নেবেন না। বলেন, বৃন্দাবনে বাজিয়ের অভাব নেই।

অর্জুন ॥ উনি যা খুশী বলুন। তুমি কি আমাকে সঙ্গে নিতে চাও না রতনবাঈ?

রতন ॥ উনি না চাইলে, আমিই বা কোন সাহসে চাই?

অর্জুন ॥ তবে কোন সাহসে তুমি আমার ঘর সংসার ভেঙে দিয়েছো? কেন তুমি আমাকে আমার স্বর্গ থেকে ছিনিয়ে এনেছো?

রতন ॥ থামো! তার আসবার সময় হয়েছে। এভাবে চেঁচামেচি করো না। তুমি চলে যাও!

অর্জুন ॥ না, না, জবাব চাই। তুমি জবাব দাও।

রতন। একটা গেঁয়ো ভূত! সে আবার জবাব চায়! জবাব দিচ্ছি,—তোমাকে এনেছিলাম, কারণ আমার একটা চাকরের দরকার ছিল।

অর্জুন। চাকর! আমি তোমার চাকর?

[রুদ্রমূর্তিতে অর্জুন রতনবাঈএর গলা টিপিয়া ধরিল। সে বজ্রমুষ্টি এতো দৃঢ় হইল, রতনবাঈএর কণ্ঠ হইতে অস্ফুট আর্তনাদ ছাড়া আর কিছুই বাহির হইল না। অর্জুন যখন বজ্রমুষ্টি ছাড়িয়া দিল, রতনবাঈ ভূতলে পড়িয়া গেল।]

সপ্তম দৃশ্য

অর্জুন মণ্ডলের বাড়ীর প্রাঙ্গন। কাল—বৈকাল। প্রাঙ্গনে একটি ছোটখাটো সভা বসিয়াছে। সভাপতি মিষ্টার চৌধুরী, মহকুমা হাকিম। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শ্রীরাখহরি দাস, মহাজন শ্রীযুধিষ্ঠির সামন্ত, এবং গ্রামের মাতব্বরগণ বেঞ্চি, চেয়ার-টুল ইত্যাদিতে আসীন, এস. ডি. ওর পাশে দণ্ডায়মান লক্ষ্মণ। ইহা ছাড়া গ্রামের চাষী এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত। গ্রামের এম. ই. স্কুলের মাষ্টার মহাশয় রহিয়াছেন। লক্ষ্মণ মণ্ডল মাইনর পরীক্ষায় সমগ্র বিভাগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করায় তাহাকে অভিনন্দন করার উদ্দেশ্যেই এই সভার আয়োজন।

রাখহরি। মাননীয় সভাপতি মহাশয়, শ্রদ্ধেয় জমিদার মহাশয়, কল্যাণপুর মাইনর স্কুলের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয়গণ এবং উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী, মাননীয় মহকুমাধিপতি—এস. ডি. ও. সাহেব তাঁহার সহস্র আবশ্যকীয় কার্য ধূলায় নিক্ষেপ

করিয়া আমাদের এই দীনহীন অভাগা গ্রাম কল্যাণপুরে শুভ পদার্পণ করিয়া, বলিবার-ভাষা-নাই এইরূপ কৃতজ্ঞতা-পাশে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন। (ঘন ঘন করতালি।) চেয়ার নাই, বেঞ্চি নাই—একরকম গাছতলাতেই বসিয়া আমাদের গ্রামের মাইনর স্কুলে কোনও রকমে টিঁকিয়া ছিল। স্কুলটির প্রাণ মৃত্যুর পূর্বে ধুকধুক করিতেছিল, এমন সময়ে এমন একটি কাণ্ড ঘটিয়া গেল যাহাতে আজ কল্যাণপুর এম,ই, স্কুলটি যেন শ্মশান হইতে লম্ফ দিয়া উঠিয়াছে। ঘটনাটি এই যে, এই স্কুলেরই ছাত্র, শ্রীমান লক্ষ্মণ মণ্ডল মাইনর পরীক্ষায় সুবিশাল প্রেসিডেন্সি বিভাগের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তিলাভ করিয়াছে।

(ঘন ঘন করতালি)

ইহাতে সমস্ত গ্রামের, সমস্ত ইউনিয়নের বুক দশ হাত হইয়াছে, শ্রীমান এখন সদরের জিলা স্কুলের বোর্ডিংএ থাকিয়া স্কুল ফাইনাল পড়িবে। তাহাতে যাহা খরচ লাগিবে, মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি তাহাতে নস্যি। কাজেই মহকুমাধিপতি—এস, ডি, ও বাহাদুরের বাসনা অনুযায়ী কল্যাণপুর ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি হিসাবে আমি এককালীন তিনশত টাকা, গ্রামের জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এককালীন দুই শত টাকা এবং গ্রামের মহামহিম ধনী মহাজন শ্রীযুধিষ্ঠির সামন্ত মহাশয় এককালীন একশত টাকা দান করিয়া মাননীয় মহকুমধিপতি—এস, ডি, ও বাহাদুরের শ্রীকরকমলে তুলিয়া দিতেছি। তিনি এইবার তাঁহার মহতী ইচ্ছা পূরণ করুন।

(ঘন ঘন করতালি। রাখহরি বসিয়া পড়িল। জমিদার লাফাইয়া উঠিল।)

জমিদার॥ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট রাখহরি দাসের এই প্রস্তাব—তার নাম কি এই হোল গিয়ে—আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি—লক্ষ্মণ মণ্ডল—তার নাম কি এই হোল গিয়ে—আমাদের মুখোজ্জ্বল করেছে। কিন্তু তাহার পিতা বর্তমানে থাকিলেও—তার নাম কি এই হোল গিয়ে—নেই। সেদিকে দেখতে গেলে মাননীয় মহকুমা মালিক আজ—তার নাম কি এই হোল গিয়ে—এক কথায় অধম তারণ হোলেন। জয় মহকুমা মালিক কী জয়। (সকলের জয়ধ্বনি।)

মহকুমা হাকিম ॥ সমবেত ভদ্রমণ্ডলী। আপনারা জয়ধ্বনি করে আমাকে লজ্জাই দিচ্ছেন। এ জয় আমার নয়, এ জয় আপনাদেরই গ্রামের এই কিশোর বালক—লক্ষ্মণ মণ্ডলের। (লক্ষ্মণকে) লক্ষ্মণ, সত্যি সত্যিই তুমি আজ গ্রামের মুখোজ্জ্বল করেছো। আশা করি, একদিন তুমি দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। আমি তোমার পারিবারিক কাহিনীও অবগত হয়েছি। শুনেছি তোমার পিতাও একজন গুণী লোক। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, উপযুক্ত পিতার তুমি উপযুক্ত পুত্র হও, দীর্ঘজীবন লাভ কর। (ঘন ঘন করতালি।) এই নাও লক্ষ্মণ, ছয় শত টাকা। তোমার মার হাতে দিও। আমি শুনেছি, তিনি কি কষ্ট করে তোমাকে মানুষ করছেন। আমি শুনেছি, স্কুলের মাষ্টারমহাশয়েরা তোমাকে কতোভাবে সাহায্য করেছেন। আজ গ্রামের সদাশয় ব্যক্তিরাও তোমাকে সানন্দে এই অর্থ সাহায্য করে তোমার উচ্চ শিক্ষার পথ প্রশস্ত করে দিলেন। এজন্য তাঁদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আমার ট্রেণের সময় হয়ে গেছে। এইখানেই আজকের এই সভার কাজ শেষ হলো। নমস্কার, জয় হিন্দ্।

[মহকুমা হাকিম উঠিয়া দাঁড়াইয়া চলিলেন। জনতা তাঁহার পিছনে পিছনে চলিয়া গেল। টাকার থলিটি হাতে লইয়া লক্ষ্মণ দাঁড়াইয়া রহিল। পিছনে দুর্গা আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার গায়ে হাত দিলে লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিল—]

লক্ষ্মণ ॥ মা! মা!

[লক্ষ্মণ টাকার থলিটি মায়ের পায়ের তলায় রাখিয়া মাকে প্রণাম করিল। দুর্গা টাকার থলিটি তুলিয়া লক্ষ্মণের শিরচুম্বন করিল।

অষ্টম দৃশ্য

সন্ধ্যা। দেখা গেল, তুলসী মঞ্চে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলিতেছে। তাহারই সম্মুখে অর্জুনের পরিত্যক্ত খড়ম জোড়াটি রাখিয়া দুর্গা ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিতেছে। প্রণাম শেষে খড়মজোড়া তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই আধো-আলো-অন্ধকার পরিবেশের মধ্যে নিশাচরের মতো নিঃশব্দে দুর্গার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল অর্জুন।

অর্জুন ॥ দুর্গা।

দুর্গা ॥ (চমকিয়া উঠিয়া) কে ?

[মুখ ফিরাইয়া দেখিল অর্জুন, তখনই সংযত হইয়া খড়মজোড়াটী তুলসীমঞ্চের নীচে রাখিয়া অর্জুনের মুখোমুখি দাঁড়াইল।]

দুর্গা ॥ তুমি ! এদ্দিনপর—তুমি !

অর্জুন ॥ (চাপা গলায়) চুপ, আস্তে।

দুর্গা ॥ কেন ? কি হয়েছে ? ওগো, তোমার এমন চেহারা কেন ?

অর্জুন ॥ আছে, কারণ আছে। লক্ষ্মণ কোথায় ?

দুর্গা ॥ বাড়ী নেই। পাড়ার গুরুজনদের প্রণাম করতে গেছে।

অর্জুন ॥ হঠাৎ ?

দুর্গা ॥ বলছি, কিন্তু তুমি ঘরে এসো—

অর্জুন ॥ না—না। তুমি বল।

দুর্গা ॥ মাইনর পরীক্ষায় সে এই মুলুকের মধ্যে প্রথম হয়েছে মাসে মাসে পাঁচটাকা বৃত্তি পাবে। সে যাতে সহরে পড়তে পারে, সে জন্য হাকিম আজ তোমার বাড়ী এসে পাড়ার লেকেদের কাছ থেকে ছশো টাকা তুলে দিয়ে গেছে। লক্ষ্মণ কাল যাবে সহরে পড়তে। একী ভাগ্যের কথা—আজ তুমি এলে। তোমার আশীর্বাদ আজ ও পাবে।

অর্জুন ॥ আশীর্বাদ! জানিনা আমার আশীর্বাদের কোন দাম আছে কিনা? তবুও আশীর্বাদ করছি, ও যেন আমার মতো কোনদিন গরীব না হয়। গরীব বলেই তোমার মতো স্ত্রী, লক্ষ্মণের মতো ছেলে থাকতেও তোমাদের নিয়ে আমি ঘর করতে পারিনি।

দুর্গা ॥ থাক্ আজ সে কথা। আজ তোমার ছেলে আমাদের সকল দুঃখ

অর্জুন ॥ আমার দুঃখ কেউ ঘোচাতে পারবে না দুর্গা। আজ সব কথা একসঙ্গে মনে পড়ছে। চাষীর ঘরে বাবার দেনা ঘাড়ে নিয়েই জন্মেছিলাম। চেয়েছিলাম পৃথিবীর কাছে—দু'বেলা দু'মুঠো ভাত আর পরণে খান দুই কাপড়—মাথার উপর একটু চালা, একটা হাল, দুটো বলদ আর বিঘে দুই মাটী। সে কী খুব বেশী চেয়েছিলাম, বেশী চেয়েছিলাম দুর্গা? বছরের পর বছর রোদে পুড়েছি, জলে ভিজেছি—জমিদার মহাজনের পাওনা মেটাতে। এত করেও কারুর কোন পাওনা আমি মেটাতে পারিনি। শুধু হারিয়েছি—শুধু হারিয়েছি। জোতজমি, বাড়ীঘর, বাপের স্নেহ, স্ত্রীর ভালবাসা,—ছেলের সেবা—সব কিছু আমি হারিয়েছি।

দুর্গা ॥ কিছু হারাওনি। ছেলে যখন আছে, সব আছে—আবার সব হবে। তুমি ঘরে গিয়ে বস, আমি তাকে ডেকে আনছি।

অর্জুন ॥ না, না, তাকে ডেকো না। তার কাছে আমি এমুখ দেখাতে পারব না।

দুর্গা ॥ সেকী! কেন?

অর্জুন ॥ পুলিশ—পুলিশ আমার পিছু নিয়েছে।

দুর্গা ॥ পুলিশ! কেন কি করেছ তুমি?

অর্জুন ॥ বাঈজী—

দুর্গা ॥ বাঈজী? বাঈজী কী?

অর্জুন ॥ আমি তাকে খুন করেছি।

[দুর্গা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিল। বাহির প্রাঙ্গণে লক্ষ্মণ ও তাহার একজন সাথীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

লক্ষ্মণ ॥ তুই ভাই দাঁড়া, আমি এখনি মাকে বলে আসছি।

দুর্গা ॥ ঐ আসছে—।

[অর্জুন চকিতে আত্মগোপন করিল। পরক্ষণেই লক্ষ্মণ আসিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মাকে ডাকিল—]

লক্ষ্মণ ॥ মা, মা! জমিদার বাড়ীতে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম। গিন্নি-মা কিছুতেই ছাড়বেন না। বলেন, কার্তিকের সঙ্গে খেতে হবে! তিনি নিজে বসে খাওয়াবেন, আমি বললাম মাকেতো আমি বলে আসিনি। তিনি বললে আসবো। তিনি বললেন, তাই এস বাবা। কার্তিককে আবার সঙ্গে দিয়েছেন। যাবো মা?

দুর্গা ॥ তিনি আদর করে খাওয়াচ্ছেন, সে হবে তোমার আশীর্বাদ। কেন যাবে না বাবা, তুমিতো আজ শুধু আমাদের নও—গোটা গাঁ আজ তোমাকে বুকে তুলে নিয়েছে। সবাই তোমাকে আশীর্বাদ করছে।

লক্ষ্মণ ॥ তা করছে, কিন্তু বাবার আশীর্বাদ পেলাম কই মা?

দুর্গা ॥ বোকা ছেলে তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছো বলেই আজ এতো আশীর্বাদ পাচ্ছো!

লক্ষ্মণ ॥ কিন্তু তাঁর পায়ে মাথাটী রেখে একটীবার প্রণাম করতে পারবো না মা?

দুর্গা ॥ কেন পারবে না বাবা? এইতো তাঁর খড়ম রয়েছে। প্রণাম কর বাবা। তিনি যেখানেই থাকুন, তোমার প্রণাম পাবেন।

[লক্ষ্মণ খড়মে প্রণাম করিতে করিতে বলিল—]

লক্ষ্মণ ॥ বাবা! তুমি যেখানেই থাকো, আমার প্রণাম নাও। তুমি আমাদের এমন করে ভুলে থেকো না বাবা, তুমি ফিরে এসো।

কার্তিক ॥ (বাহির হইতে) লক্ষ্মণ ভাই, রাত হয়ে যাচ্ছে।

লক্ষ্মণ ॥ (উঠিয়া) যাচ্ছি ভাই। আসি মা!

[লক্ষ্মণ ছুটিয়া চলিয়া গেল।]

দুর্গা ॥ (আর্তকণ্ঠে) ওগো তুমি এসো। আমি ওকে ডাকি। তুমি এসে একটীবার ওকে বুকে নাও।

[চকিতে অর্জুন আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল।]

অর্জুন ॥ না, না, না, আমি খুনী। অমন ছেলেকে বুকে নেবার, আশীর্বাদ করবার কোন অধিকার আমার আজ নেই দুর্গা। ভেবেছিলাম আছে। তাই ধরা দেবার আগে তোমাদের কাছে পালিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এসে দেখলাম, তোমরা আমাকে দেবতার আসনে বসিয়েছো। ধরা তাই আমি দিতে পারবো না—তোমাদের কাছেও না, পুলিশের কাছেও না। গরীব হওয়ার পাপে আমার এ সংসার ভেঙে খান খান হয়ে গিয়েছিলো। দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু জল করে সেই ভাঙা সংসারকে তুমি সোণার সংসার করে তুলেছো। আমি পালাই দুর্গা। এখানে ধরা পড়লে তোমার সাজানো সংসার আবার ভেঙে যাবে। বাপ হয়ে আমি ভেঙেছি—মা হয়ে তুমি গড়েছো। কিন্তু এবার ভাঙলে তুমিও আর গড়তে পারবে না দুর্গা।

[নতমুখে দুর্গা শুনিতেছিল, এবার স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল—]

দুর্গা ॥ দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

অর্জুন ॥ তুমি!

দুর্গা ॥ হ্যাঁ, আজ লক্ষ্মণ সব পেয়েছে, কিন্তু তুমিতো কিছুই পেলে না জীবনে। আমি কি শুধুই লক্ষ্মণের মা? আমি তোমার স্ত্রী—অনেক দুঃখের পর ফিরে পেয়েছি তোমাকে। আর তোমায় হারাতে পারবো না—তোমার সুখ-দুঃখই আমার সুখ-দুঃখ!

অর্জুন ॥ কিন্তু দুর্গা, পাপ—আমি পাপ করেছি। জীবনে কিছুই তোমায় দিইনি, আজ শুধু আমার পাপের ভাগই কি তোমায় দেব? না দুর্গা আমি পারব না। আমি যাই— [অর্জুন চলিয়া যাইতেছিল।]

দুর্গা ॥ শোনো—শোনো, একটু দাঁড়াও।

[অর্জুন থামিল।]

অর্জুন ॥ (দুর্গাকে গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া প্রণাম করিতে দেখিয়া) 'না' বলবোনা। তোমার এই পরশটুকুই আমার জীবনের শেষ পরশ—শেষ পাথেয়।

[দুর্গা প্রণাম করিয়া উঠিলে অর্জুন ঘুরিয়া দাঁড়াইল। সে চলিয়া যাইতে লাগিল দুর্গার দৃষ্টির বাহিরে—জীবনের বাহিরে। দুর্গা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—সে আজ অর্জুনের প্রিয়া নয়—অর্জুনের স্ত্রী নয়—অর্জুনের সন্তানের জননী—যে জননী সন্তানকে গড়িয়া তোলে—স্বামীর সংসার গড়িয়া দেয়।]

॥ যবনিকা ॥

মন্মথ রায়

আজব দেশ

[কিংবদন্তীমূলক কাল্পনিক নাটক]

প্রথম প্রকাশ :
দীপায়ন
(মাসিকপত্র)
১৯৪৬-৪৭

প্রথম অভিনয়
ক্যাজুয়াল আর্টিষ্টস্ : ক্যালকাটা
সেণ্ট জেভিয়ার হল : কলিকাতা
৫ই অক্টোবর : ১৯৪৮

বেতার নাট্য রূপায়ণ
অলইণ্ডিয়া রেডিয়ো
কলিকাতা কেন্দ্র:
৭ই জুন : ১৯৫০

পরিবর্ধিত সংস্করণ
রচনা-কাল :
১১-৪-৫৩ হইতে ১-৫-৫৩

প্রথম প্রকাশ :
উত্তরা
(মাসিক পত্র)
আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র
১৩৬০

পুনর্মুদ্রণ :
স্বদেশ
(সাপ্তাহিক পত্র)
শারদীয়া সংখ্যা
১৩৬১

আজব দেশ

বাঙলা সাহিত্যের
"পরশুরাম"
পরম শ্রদ্ধেয়
শ্রীরাজশেখর বসু
শ্রীকরকমলেষু
স্নেহধন্য
মন্মথ রায়

মহালয়া :
১৩৬৩
২২১সি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

হবুচন্দ্র গবুচন্দ্র

পরশুরাম

হবুচন্দ্রকে বললে রাজ্যের যত লোক—
হে মহারাজ ধর্মাবতার,
আমাদের আরজিটা শুনুন একবার,
গবু মন্ত্রীকে শূলে চড়াতে আজ্ঞা হ'ক।
ব্যাটা অকর্মণ্য ঘুষখোর,
পয়লা নম্বর চোর,
ওর জন্যে আমরা খেতে পরতে পাই না।
যদি না পারেন রাজার কাজ
তবে কি করতে আছেন মহারাজ?
চলে যান, আপনাকে আমরা চাই না॥

হাই তুলে বললেন হবুচন্দ্র,
এরা বলে কি হে গবুচন্দ্র?
গবু বললেন, আঃ কি জ্বালাতন,
দোষ ধরাই ওদের স্বভাব।
শিখেছেন তো তার জবাব,
আউড়ে দিন তোতা পাখির মতন॥

হেঁকে বললেন হবুচন্দ্র নরপতি,—
ওহে প্রজাবৃন্দ, শান্ত হও, ধৈর্য ধর,
না বুঝেই কেন চিৎকার কর,
তোমরা অবোধ ছেলেমানুষ অতি।
তোমাদের নালিশ মিথ্যে আদ্যন্ত,
স্বয়ং গবুচন্দ্র করেছেন তদন্ত।
তোমাদের কিঞ্চিৎ টানাটানি,
কিঞ্চিৎ এটা ওটা সেটা দরকার
আছে তা অবশ্যই মানি।
শীঘ্রই হবে তার প্রতিকার।
স্বর্গ থেকে আসছে মালী এক দল,
সঙ্গে নিয়ে কল্পতরুর বীজ,
ষাট বছরে ফলবে তার ফসল,
পাবে তখন হরেক রকম চীজ।
তদ্দিন বাপু সয়ে থাক চক্ষু মুদে,
বাজে খরচ কমাও,
দেদার টাকা জমাও,
আমার কাছে রাখ আড়াই পার সেণ্ট সুদে॥

৮।২।৪৬
১।১০।৫৬

'আজব-দেশে'র উদ্বোধনরূপে "পরশুরাম" তাঁহার এই গাথাটি আমার গ্রন্থে প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়া আমাকে ধন্য করিয়াছেন। মন্মথ রায়

১-১০-৫৬

আজব দেশ

প্রথম অঙ্ক

আজব দেশ। চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উৎসব। অপরাহ্ন। মন্দিরের চারিদিক ঘিরিয়া মেলা বসিয়াছে। বহুজন সমাগমে উচ্ছল এই উৎসব প্রাঙ্গন। যবনিকা অপসারণের পর দেখা গেল—প্রাঙ্গন-সংলগ্ন রাজপথে লোকজন আনাগোনা করিতেছে। মহিলারা শিব-মন্দিরে উপচারসহ উপস্থিত হইয়াছেন। রঙবেরঙের পোষাক পরিহিত নরনারীর দল মেলা দেখিয়া বেড়াইতেছে। মন্দিরের ভিতর হইতে শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। এমন সময় মন্দির প্রাঙ্গনে গাজনের সঙ্ প্রবেশ করিল। সঙের গানে আজব দেশের পরিচয় প্রকাশ পাইল।

(লোক সঙ্গীত) *

আমরা আজব দেশের অধিবাসী
মন্দ কিসে আছি!
খাই দাই আর ঠেসে ঘুমাই
হুজুগ পেলেই নাচি।
আমরা মন্দ কিসে আছি!

---

* গানটি শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দান।

হবু রাজার গবু মন্ত্রী দেশের কর্ণধার।
কত ধানে কত যে চাল,
ধার ধারিনা তার॥
বুদ্ধি পাছে যায় পালিয়ে,
(থাকি) নাক-কানেতে ছিপি দিয়ে
সাবধানেতেই ঘুরে বেড়াই,
কেবল হাঁচি পেলেই হাঁচি।
আমরা মন্দ কিসে আছি!
লেখাপড়া শেখার রেওয়াজ
নাই আমাদের দেশে
বিদ্যে হ'লেই নানা মতের
দল বাড়বে শেষে!
দল বাড়লেই হানাহানি—
আমরা সেটা ভালই জানি।
(তাই) আলোর বালাই নাই,
আঁধারেই খেলি কানা-মাছি।
সিদ্ধি-গাঁজায় দুঃখু ভুলে
(আছি) কৈলাসের কাছাকাছি।
বলো, মন্দ কিসে আছি।

[সবাই যখন গান শুনিতে মশগুল তখন কালো আবরণে ঢাকা একটি লোক চকিত সতর্ক পদক্ষেপে প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিল। চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল—কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে কিনা। তারপর খড়ি দিয়া জনতার অগোচরে দেওয়ালে কয়েকছত্র কি লিখিল। ইহার মধ্যে গীতরত সঙের প্রস্থান। আগন্তুক ত্বরিৎ হস্তে লেখা শেষ করিয়া পিছন ফিরিতেই কে একজন তাহাকে সম্ভাষণ করিল—]

লোকটি॥ তুমি! এই গাজনের মেলায়!

[লেখক ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়া তাহাকে চুপ করিতে বলিল এবং চোখের ইশারায় কি বলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। নবাগত লোকটি দেওয়ালের লেখাটির সামনে গিয়া দাঁড়াইল এবং পড়িল—"আলো চাই—আরো আলো।" সে লেখাটির সঙ্গে মিলাইয়া ছড়া কাটিতে লাগিল—]

লোকটি ॥ "আলো চাই—আরো আলো"

চারিদিকে বড়ই কালো।

ধিন্ তা ধিন্ ধিন্ ধিন্ তা ধিন্ ধিন্। (নৃত্য)

আলো চাই—আরো আলো,

চোখে তাই দেখছিনা ভালো

ধিন্ তা ধিন্ ধিন্ ধিন্ তা ধিন্ ধিন্। (নৃত্য)

গেল গেল ভাই সবই গেল

আলো চাই আরো আলো,

ধিন্ তা ধিন্ ধিন্ ধিন্ তা ধিন ধিন্। (নৃত্য)

আলো চাই আরো আলো,

দিন দুপুরে প্রদীপ জ্বালো।

ধিন্ তা ধিন্ ধিন্ ধিন্ তা ধিন্ ধিন্। (নৃত্য)

[ভীড় জমিয়া গিয়াছে। ভীড়ের মধ্য হইতে কার্তিক অগ্রসর হইয়া লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—]

কার্তিক ॥ হ্যাঁরে গন্শা, ব্যাপার কি বলতো ?

গণেশ ॥ দেখ বাবা, দেখ, দেওয়ালের লেখা দেখ।

[দেওয়ালের লেখার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।]

কার্তিক ॥ তাই তো! শিবমন্দিরের গায়ে খড়ি দিয়ে আঁচড় কেটে গেল কোন হতভাগা শুনি ? খুব রগড় করেছে বুঝি! দাও না ভাই পড়ে। আমাদের বিদ্যে তো জানো—'ক' অক্ষর—গোমাংস। কি বল হে তাল ?

তাল ॥ তা যা বলেছ কার্তিকদা। মুখ্যুসুখ্যু মানুষ—চোখ থেকেও অন্ধ। নিশ্চয়ই কোন গেঁজেল বুড়ো শিবকে নিয়ে ছড়া কেটেছে। কি বলিস বেতাল ?

বেতাল ॥ বেশতো বেশতো! কিন্তু তাই কি? আমাদের হবু রাজা কোন নতুন আদেশ জারী করেননি তো? পড় না, গণেশদা জোরে।

গণেশ ॥ (পাঠ করিল) "আলো চাই—আরো আলো।"

সকলে ॥ আলো!

নন্দী ॥ বোঝা গেল না তো।

গণেশ ॥ বোঝা গেল না তো? তবেই বুঝতে হবে এর একটা জোর মানে আছে। বুঝলে নন্দী?

ভৃঙ্গী ॥ (ব্যঙ্গ কণ্ঠে) হ্যাঃ রাখ, রাখ। অন্ধকারটা কোথায়, যে আলো চাই। কোন মানে হয়? পাগল না মাথা খারাপ।

বেতাল ॥ পাগলই হোক আর মাথা খারাপই হোক, কিন্তু হাতটা কার? লিখল কে?

তাল ॥ ওহে বুঝেছি। এ তবে তার কাজ।

নন্দী ॥ কার হে—কার?

তাল ॥ সে নাম মুখে এনে কি ফাঁসি যাব, না শূলে চড়ব।

গণেশ ॥ এই তো ভায়া বুঝেছ। আর যখন বুঝেছ, তখন চেপে যাও ভায়া চেপে যাও।

কার্তিক ॥ তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু আলো চাওয়ার ব্যাপারটা তো বুঝলাম না। ভাত কাপড় চাই—বুঝি।

নন্দী ॥ ঘর ঘরণী চাই—বুঝি।

বেতাল ॥ ছেলে পেলে চাই—বুঝি।

তাল ॥ গরু বাছুর চাই—তাও বুঝি।

ভৃঙ্গী ॥ খিদে পেলে খাই—তাও বুঝি।

সকলে ॥ (গণেশ ব্যতীত) কিন্তু "আলো চাই—আরো আলো"—এতো বুঝলাম না।

গণেশ ॥ কিষেণ পাগলার সঙ্গে দেখা হলেই সে বুঝিয়ে দেবে।

কার্তিক ॥ পথে এসো। তা হলে বল কিষেণ পাগলা আবার দেশে ফিরেছে?

তাল ॥ সাহস তো কম নয়! রাজার কানে যদি কথাটা একবার ওঠে (মাথা কাটিবার ইঙ্গিত করিয়া) তবে সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ঘ্যাচাং……

[মন্দিরের ভিতরে ঘণ্টাধ্বনি।]

গণেশ ॥ চুপ, চুপ। পূজো শেষ হলো।

[মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে পুরোহিত বাহিরে আসিলেন।]

নন্দী ॥ হাঁ, ঐ যে পুরুত ঠাকুর বাইরে এসেছেন।

ভৃঙ্গী ॥ চলো হে চলো—প্রসাদ পাবে চলো।

সকলে ॥ জয় বাবা বুড়ো শিব—দয়া করো বাবা।

[সকলে পুরোহিতের দিকে অগ্রসর হইল।]

পুরোহিত ॥ না, না, এ প্রসাদ তোমাদের নয়। তোমরা সরে দাঁড়াও—সরে দাঁড়াও।

কয়েকজন ॥ আমরা চৈত সংক্রান্তির উপোস করে আছি ঠাকুর।

পুরোহিত ॥ আরে শাস্ত্রে বলে চৈত সংক্রান্তিতে উপোস করতেই হয়।

তাল ॥ উপোস করলে পারণ করতে হয়—শাস্ত্রে তো সে কথাও বলে ঠাকুর।

সকলে ॥ (চীৎকার করিয়া) প্রসাদ দাও—প্রসাদ।

পুরোহিত ॥ রক্ষেশ্বর, রক্ষেশ্বর—হাঁ করে দেখছ কি? এদের সব হটাও। রাজবাড়ীতে মন্ত্রীবাড়ীতে সব প্রসাদ যাচ্ছে—বেটারা লুট করবে।

[মন্দিরের অভ্যন্তরে পুরোহিতের প্রস্থান। আরক্ষানায়ক রক্ষেশ্বর দণ্ডহস্তে "হটো-হটো"—ইত্যাদি বচনে লোকগুলিকে তাড়না করিয়া পথের দুই ধারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া দিল। মন্দির হইতে স্বর্ণথালে রক্তবস্ত্রে আবৃত প্রসাদ সম্ভার লইয়া বাহকগণ রক্ষীপরিবৃত হইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান জনতা তখন তাহাদের নিকট প্রসাদ ভিক্ষা করিতে লাগিল—]

নন্দী ॥ দাও বাবা—একটু প্রসাদ দিয়ে যাও।

ভৃঙ্গী ॥ দোহাই বাবা—দুটো খেতে দাও বাবা।

তাল ॥ একগুণ দিলে দশগুণ হবে বাবা। পায়ে পড়ছি বাবা!

গণেশ ॥ থামো সব। ভিখ্ মাঙ্‌তে লজ্জা করে না?

বেতাল ॥ পেটে ক্ষিধে—মুখে লাজ—চলে না তাই গণেশ।

[কিন্তু গণেশ তাহা শুনিল না। তাড়না করিয়া জনতা সরাইতে লাগিল।]

গণেশ ॥ হট্ যাও—হট্ যাও! হটো……

[প্রসাদ সম্ভার লইয়া বাহকগণ চলিয়া গেল।]

বেতাল ॥ ফোপর দালালি করে ভেবেছ প্রসাদের ছিটে ফোঁটা তুমি পাবে তোমার কপালেও অষ্টরম্ভা—জেনো গণেশ।

গণেশ ॥ মুখ সামলে কথা বলিস বেতাল। ছিটে ফোঁটাতে পেট ভরে না। আমার সর্দার বলে—মারি তো হাতি—লুটি তো ভাণ্ডার। তোদের মতো ভিক্ষে করব না, যদি পারি লুট করব।

[বাহির হইতে রক্ষী দলের পুনঃ প্রবেশ।]

রক্ষেশ্বর ॥ হট্ যাও—হট্ যাও। রাজা আসছেন—মন্ত্রী আসছেন—রাজকন্যা আসছেন। তোমাদের তো সাহস কম নয়। এখনো এখানে তোমরা দাঁড়িয়ে আছ!

কার্তিক ॥ আমাদের রাজা, আমাদের মন্ত্রী, আমাদের রাজকন্যা—আমরা দেখব না?

নন্দী ॥ রাজদর্শনে পুণ্য হয়। সারাদিন উপোস করেও তাই দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের তাড়াবেন না হুজুর।

রক্ষেশ্বর ॥ না না, তোমাদের এখানে থাকা চলবে না। এখন আরতি হবে—বাঞ্ছাপূরণ উৎসব হবে। অতি প্রয়োজনের মানুষ ছাড়া এখানে এখন কেউ থাকতে পারবে না। কোন বছরই তো তোমরা থাক না! এবার তো তোমাদের খুব সাহস দেখছি।

গণেশ ॥ পেটে ভাত না পড়লে সাহসটা বেড়ে যায় হুজুর।

রক্ষেশ্বর ॥ সাহসটা বড্ড বেশী বেড়েছে। এই, হটাও—হটাও।

[সদলবলে তাড়না করিয়া লোক গুলিকে হটাইয়া দিল। রাজপথ হইতে ঘোষকের প্রবেশ। তাহার ঢ্যাটরা শুনিয়া মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইল। সদলবলে পুরোহিত মন্দির প্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

ঘোষক ॥ চতুরদধি-সলিলবীচি-মেখলানিলীনগিরিসম্বীবতী বসুন্ধরাধীশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত হবুচন্দ্র ভূপ। তস্য মন্ত্রী শ্রীল শ্রীযুক্ত গবুচন্দ্র দাস। মহামান্যা ত্রিভুবন-বন্দিতা অশেষগুণালঙ্কৃতা-সর্বরত্ন বিভূষিতা পিতৃস্নেহধন্যা স্বজনসুখভাগিনী রাজকুমারী শ্রীমতী জয়ন্তী…

[রাজপথ হইতে রাজশোভাযাত্রা মন্দির প্রাঙ্গণে আসিতেছে। প্রথমে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে রাজপুরুষগণের প্রবেশ। তৎপর মন্ত্রী ও কন্যাসহ রাজার প্রবেশ। তাঁহাদের পশ্চাতে আসিল সখীবৃন্দ। জয়ন্তী সখীবৃন্দ সহ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। রাজাও যাইতেছিলেন, কি মনে হওয়ায় হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেলেন।]

হবু ॥ পুরোহিত মশাই—দাঁড়াও। একটা কথা আছে।

পুরোহিত ॥ জয়োস্তু মহারাজ। কি কথা?

হবু ॥ বছর বছর চৈত্ত সংক্রান্তিতে তোমার এই বুড়ো শিবের মন্দিরে রাজপরিবারের সবাই সোনা দানা প্রণামী দিয়ে মনে মনে যে যা চায়, বুড়োশিব বছরের মধ্যে তাই দেন। গেল বছর আমি চেয়েছিলাম—"দোহাই বাবা বুড়ো শিব—আমার প্রজাগুলো বড় চেঁচায়—ওদের সব বোবা করে দাও।" কিন্তু কই, ব্যাটারা তো বোবা হলোই না, বরং গলার জোর ওদের এত বেড়ে যাচ্ছে যে, আমার কুম্ভকর্ণী ঘুমও ভেঙে যাচ্ছে। কৈফিয়ৎ দাও পুরুত মশাই।

পুরোহিত ॥ আজ্ঞে মহারাজ, বুড়োশিব স্বপ্নে আমাকে এর কারণ বলেছেন। প্রজারা সব বোবা হলে—আপনি কথা কইতেন কার সঙ্গে মহারাজ?

হবু ॥ আরে কথা কইবার লোকের আমার অভাব? গবু রয়েছে, জয়ন্তী মা রয়েছে—একপাল কর্মচারী রয়েছে। রাতদিন বকর বকর করছে। কথা কইবার লোকের আমার অভাব? না, গাঁজা খেয়ে খেয়ে বুড়োশিবের বুদ্ধিটাও খোঁয়া হয়ে গেছে।

পুরোহিত ॥ আজ্ঞে মহারাজ, যারা আপনার সঙ্গে কথা কইবে বলছেন—আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন যে…তারাও আপনারই প্রজা। গবু আপনার প্রজা নয়? আমরা কে প্রজা নই বলুন? তা বুড়োশিব যদি আমাদের সবাইকে বোবা করে ছেড়ে দিতেন, আপনি কথা কইতেন কার সঙ্গে মহারাজ!

হবু ॥ গবু…

গবু ॥ মহারাজ…

হবু ॥ কতবার তোমায় বলেছি—এসো গাঁজাটা ধরি। তুমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছ। কিন্তু গাঁজা খেয়ে মহাদেবের বুদ্ধিটা কেমন খেলে—দেখলে? তবেই না বেঁচে গেছি। জয় বাবা—বুড়োশিব। খুব রক্ষা করেছ। গবু—আজ থেকে বুড়োশিবের গাঁজার বরাদ্দটা একটু বাড়িয়ে দাও। বছরে একমণ ছিল—মাসে একমণ করো। কি বল পুরুতমশাই?

পুরোহিত ॥ আশ্চর্য মহারাজ—বুড়োশিব স্বপ্নে আমাকে ঠিক এই প্রত্যাদেশই দিয়েছেন। বলেছেন—সিদ্ধি চাস্ তো—সিদ্ধি ধর—গাঁজা টান।

হবু ॥ ঠিক্ ঠিক্—ঠিক বলেছেন বুড়োশিব। সিদ্ধির চাষ বাড়িয়ে দাও। গাঁজার চাষ আরও বাড়াও। এ বছর আওয়াজ তোলো—"আরো সিদ্ধি ফলাও—গাঁজার চাষ বাড়াও।"

পুরোহিত ॥ জয় মহারাজ হবুচন্দ্রের জয়।

[পুরোহিত সানন্দে ভিতরে চলিয়া গেলেন। সপারিষদ রাজা মন্দিরে প্রবেশের জন্য অগ্রসর হইলেন। মন্দিরের বারান্দায় পা দিয়াছেন—এমন সময় হন্তদন্ত হইয়া রাজকর্মচারী লক্ষপতির প্রবেশ। তাহার পশ্চাতে এক মালবাহক বুড়োশিবের মানত—উপঢৌকন সম্ভার বহন করিয়া আনিল। লক্ষপতি আসিয়াই মন্দিরের সামনে নতজানু হইয়া যুক্ত করে প্রার্থনা জানাইল—]

লক্ষপতি ॥ জয় বাবা বুড়ো শিব—জয় বাবা ভূতনাথ। তোমার দয়ায় রাজসরকারে যাহোক একটা চাকরী হয়েছে। আর কিছু না হোক তোমার

কৃপায় চাকরীর এই তকমাটা এ বছর যদি বজায় থাকে বাবা—তবে আমার ঘি-ভাত মারে কোন শালা।

[বলিয়াই লক্ষপতি মন্দিরের সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল। মন্দিরে প্রবেশোদ্যত রাজা ইহার কথা শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।]

হবু॥ লোকটা কে হে গবু ?

[লক্ষপতি প্রণাম সারিয়া দাঁড়াইয়া দেখে রাজা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন। সে সসম্ভ্রমে দুই পা অগ্রসর হইয়া নতজানু হইয়া করজোড়ে রাজাকে নিবেদন করিল—]

লক্ষপতি॥ মহারাজের জয় হোক। আমি মহারাজ আপনার কীটানুকীট দাসানুদাস সেই নফর—লক্ষপতি চক্কোত্তি।

হবু॥ লক্ষপতি! লোকটাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না গবু। এ আবার কে লাখোপতি এলো হে।

গবু॥ লাখোপতি—না হাতি!

হবু॥ হাতি! এ আবার কেমন হাতি ?

লক্ষপতি॥ (গবুকে) না—না মামা। আর চুপ করে থেকোনা। মহারাজকে মনে করিয়ে দাও—আমি সেই 'যেমন তেমন চাকরী—ঘি ভাত।'

হবু॥ এ বলছে হাতি—ও বলছে ঘি ভাত! কৈফিয়ৎ দাও গবু, কৈফিয়ৎ দাও।

গবু॥ লোকটি সম্পর্কে আমার ভাগনে হয় মহারাজ। খুব বুদ্ধি। এত বুদ্ধি যে খেটে খেতে নারাজ। বাপ মা কদর না বুঝে দিল তাড়িয়ে।

লক্ষপতি॥ তখন মনে হলো বাপের বাপ—মায়ের মা—মহারাজের কথা। একদিন রাজপথে মহারাজের ঐ রাঙা পায়ে মাথা খুঁড়ে একটা চাকরী চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম একটা যেমন তেমন চাকরী—বলেছিলাম তাতেই হবে আমার ঘি ভাত।

হবু॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমার মনে পড়ছে। 'যেমন তেমন চাকরি—ঘি ভাত'—

তুমি বলেছিলে। তোমার কথা শুনে তো আমার চক্ষু ছানাবড়া! বলে কি! যেমন তেমন চাকরী—তাতেই ঘি ভাত!

গবু॥ মহারাজ কথাটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে চাকরী দিলেন—

হবু॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—মনে পড়েছে। হুকুম দিয়েছিলাম তোমার চাকরী—নদীর পাড়ে বসে সকাল থেকে সন্ধ্যে নদীর ঢেউ গুনতে হবে। মাইনে যেন কত বলেছিলাম?

লক্ষপতি॥ আজ্ঞে আপখোরাকী বিনে মাইনেতেই আমি লেগেছিলাম, মহারাজ।

[হবু হাসিয়া উঠিলেন।]

হবু॥ তা যেমন তেমন একটা চাকরী দিয়েছি তো। কিন্তু ঘি ভাত জুটেছে কি?

লক্ষপতি॥ আপনার আশীর্বাদে রাজতকমাটা যখন একবার পেয়েছি মহারাজ, তখন ঘি, ভাত আমার মারে কে? দু' ঝুড়ি সিদ্ধি, তিন ঝুড়ি পেস্তা-বাদাম, আর দু' ঝুড়ি মিষ্টি—নিয়ে এসেছি বুড়োশিবের পূজো দিতে। ঘি ভাতের আর কোন সন্দেহ আছে মহারাজ।

গবু॥ না, লোকটি কর্তব্যপরায়ণ আর তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন।

হবু॥ সোজা ভাষায় বলো গবু, সোজা ভাষায় বলো। সোজা ভাষায় কথা বলতে কি তোমাদের জিভ জড়িয়ে আসে? কথা বলবে—অথচ আমি রাজা হয়ে তার কোন মানে বুঝব না? (হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া) কৈফিয়ৎ দাও কি করে ঘি ভাত হলো।

লক্ষপতি॥ রাজ-তকমা মাথায় নিয়ে বন্দরে বসে ঢেউ গুনছি আর গুনছি—গুনছি আর গুনছি—সারাদিন পেটে একদানা ভাত পড়েনি। আপ-খোরাকী বিনে মাইনের চাকরী। মরীয়া হয়ে রাজকার্য চালাচ্ছি। এমন সময় বুড়ো শিবের দয়ায় কি দেখলাম? দেখলাম নদীর বুকে এক রাশ ধোঁয়া।

হবু॥ ধোঁয়া?

লক্ষপতি ॥ হ্যাঁ মহারাজ, জাহাজের ধোঁয়া।

হবু ॥ জাহাজ ?

লক্ষপতি ॥ হ্যাঁ মহারাজ বিদেশী এক বাণিজ্যজাহাজ। আপনার বন্দরের ঘাটে এসে লাগল। আর যায় কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে আমি জাহাজে গিয়ে—মালিকের উপর হুকুম জারি করলাম—এ জাহাজ তোমার গেল। মানে, রাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত হলো। যেই বলেছে 'কেন'—তার নাকের ডগায় তুলে ধরলাম আমার এই রাজতকমা। মালিকের চোখ তখন চড়কগাছ মহারাজ। কাঁদতে কাঁদতে বলে—অপরাধটা কি হলো ?

হবু ॥ কিন্তু আমিওতো বুঝছি না—অপরাধটা কি হলো। বাণিজ্য করতে জাহাজ এসেছে। বন্দরে ভিড়েছে এ তো ভাল কথা। অপরাধটা কোথায় ?

লক্ষপতি ॥ অপরাধ নয় ? মহারাজ আমাকে ঢেউ এর হিসাব রাখতে দিয়েছেন। জাহাজ এসে সে ঢেউ ভেঙে দিল—নদীর ঢেউ সব তচনচ হয়ে গেল। অপরাধ হলোনা মহারাজ ? হিসেবে একটা ঢেউ কম বেশী হলে—নদী নালা নিয়ে কত সব বড় বড় পরিকল্পনা—সব বানচাল হয়ে যাবে না ?

গবু ॥ তা তো বটেই—তা তো বটেই। মহারাজ, গভীর জলে মাছের চাষ বাড়াবার একটা বিরাট পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। মনে আছে তো মহারাজ ? কত ঢেউ এ গভীর জলে মাছ কতটা বাড়ে—এ একটা গবেষণার বিষয় মহারাজ।

হবু ॥ বটেই তো ! বটেই তো ! কিন্তু তাতে তোমার ঘি ভাত কি করে হয়—কৈফিয়ৎ দাও লাখু।

লক্ষপতি ॥ ভয়ে বলব—না নির্ভয়ে বলব মহারাজ ?

হবু ॥ (গবুকে দেখাইয়া) আরে ইনি হচ্ছেন তোমার মামা। আর আমি হচ্ছি জগতের মামা। ভয়টা তোমার কি ?

লক্ষপতি ॥ বলেছি তো মহারাজ। বন্দী হয়ে জাহাজের মালিকের চক্ষু উঠল কপালে। কয়েদ হয়ে থ'কলে—ব্যবসা বাণিজ্যের সমূহ সর্বনাশ। তাই তখন শুরু হলো, মহারাজ—ডান হাত বাঁ হাতের ব্যাপার। হাজার মোহর

পকেটে এসে গেল মহারাজ। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজও হয়ে গেল খালাস। বাণিজ্যের মত বাণিজ্য চললো—সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘি ভাতের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

হবু॥ (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) রাজকর্মচারী হয়ে এক হাজার মোহর তুমি ঘুষ নিয়েছ? রাজকর্মচারীর পক্ষে ঘুষ নেওয়া সাংঘাতিক অপরাধ—তা জানো?

লক্ষপতি॥ (করযোড়ে) জানাজানি হলেই অপরাধ। আর অভয় দিয়েছেন বলেই জেনেছেন মহারাজ।

হবু॥ তা বটে—তা বটে।

গবু॥ বরং—এই রাজকর্মচারীটি নির্ভয়ে সত্য কথা প্রকাশ করেছে ব'লে—ওকে আরও দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করে ওকে পুরস্কার দেওয়া উচিত মহারাজ।

হবু॥ তা ঠিক। আপ-খোরাকী বিনে মাইনেতে যে হাজার মোহর রোজগার করতে পারে—সে বড় সোজা পাত্র নয়। এমন তুখোড় লোককে তো এত ছোট কাজে রাখা যায় না মহামন্ত্রী। তার চেয়ে একে আমার রাজ-প্রাসাদের দেখাশোনার ভারটা দাও।

গবু॥ রাজ গৃহাধ্যক্ষ। খুব দায়িত্বপূর্ণ পদ।

হবু॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—লোকটার মগজ আছে। চুরি চামারিটা বেশ ভাল জানে মনে হচ্ছে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয় হে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়। রাজপ্রাসাদের চুরিটা এইবার যদি বন্ধ হয়।

লক্ষপতি॥ জয় মহারাজ—হবুচন্দ্রের জয়।

[লক্ষপতি এই ধ্বনি করিয়া মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। মন্দির অভ্যন্তরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।]

গবু॥ আরতির লগ্ন সমাগত। চলুন মহারাজ।

হবু॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ, চল—চল। আরতির পরেই তো বাঞ্ছাপূরণ উৎসব। এবার বুড়োশিবের কাছে যে কি চাইব—বুঝে উঠতে পারছিনা। এবার তোমার কি বাঞ্ছা গবু?

গবু॥ বাঞ্ছা কখনো প্রকাশ করতে নেই মহারাজ। তবে তা আর পূর্ণ

হয় না। বুড়ো শিবেরই বিধান। মনে মনে যা হোক একটা ভেবে নিন—চলুন।

[রাজা ও রাজপুরুষগণের মন্দিরাভ্যন্তরে প্রস্থান। পরক্ষণেই পূর্বের কালো আবরণধারী মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিল। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া খড়িমাটি দিয়া দেওয়ালের গায়ে আরো বড় বড় অক্ষরে লিখিল—"আলো চাই—আরো আলো।" কয়েকজন পথচারী প্রাঙ্গনের মধ্যে আনাগোনা করিলেও কেহই আবরণধারী লোকটিকে লক্ষ্য করিল না। রাজকুমারীর পাল্কীবাহক নিধু চীৎকার করিতে করিতে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল—]

নিধু ॥ পঞ্চা, ও পঞ্চা—গেলি কোথায়রে হতভাগা।

[অন্যতম বাহক চৈতন্যের প্রবেশ।]

চৈতন ॥ মিছে এত চেঁচাচ্ছিস কেন নিধে ?

নিধু ॥ এদিকে যে সর্বনাশ হয়ে গেল চৈতন, এবার বুঝি পাল্কী বইতে এসে শূলে চড়তে হয়।

[আবরণধারী লোকটি মন্দিরের দিকে তাকাইবার ভান করিলেও শিবিকা বাহকদের আলাপ একমনে শুনিতেছিল।]

নিধু ॥ রাজকুমারী এক্ষুনি মন্দির থেকে বেরুবেন। এদিকে আমরা তো মোটে তিনজন। পঞ্চাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

চৈতন ॥ কি সর্বনাশ !

নিধু ॥ হতভাগা পঞ্চার জন্য এবার বুঝি বিনা দোষে প্রাণটা যায় চৈতন দেখনা ভাই—ডাকাডাকি করে—জবাব দেয় কি না। পঞ্চা, ও পঞ্চা—তুই আমাদের ডোবালিরে পঞ্চা। আমাদের শূলে না চড়ানো পর্যন্ত তোর টিকি দেখা যাবেনারে হতভাগা। পঞ্চা, ও পঞ্চা……

চৈতন ॥ মিছে হাঁকাহাঁকি করে লাভ কি হবে শুনি ? বেটা গেঁজেল, কোথায় বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে। বয়ে গেছে তার রাজকুমারীর পাল্কী বইতে। তার

চেয়ে যদি বাঁচতে চাস তো এক কাজ কর।

[চৈতন নিধুর কানে কানে কি বলিল।]

নিধু॥ (উল্লসিতভাবে) সাবাস্ মতলব ঠাউরেছিস্! মাত্র, একটা দিনের তো কাজ। দাঁড়া। (নিধু আবরণধারী লোকটির কাছে গেল।) শুনছ? বলি—শুনছ? (আবরণধারী লোকটি তাকাইল।) একটা কাজ করবে ভাই? না—না শুধু হাতে করতে বলছি না। দুটো মোহর দেব তোমাকে।

চৈতন॥ কি করতে হবে—আগে তাই বল।

নিধু॥ বলছি—রয়ে সয়ে বলছি। তুই দেখ এ দিকে কেউ আসছে কি না।

[চৈতন একটু দূরে গেল—]

নিধু॥ (আবরণধারী লোকটির আরও কাছে গিয়া) রাজকুমারী মন্দির থেকে বেরিয়ে এক্ষুনি আমাদের পাল্কীতে চড়বেন। এদিকে আমাদের একটি সঙ্গী হাওয়া হয়ে গেছে। পাল্কী বইবার একজন লোকের অভাব। রাজা শুনতে পেলে হয় শূলে চড়াবেন—না হয় গর্দান নেবেন। তোমাকে ভাই আজ আমাদের সঙ্গী হতে হবে। হ্যাঁ—এমনি নয়—দু মোহর নগদ মজুরী দেব।

[নিধু দুইটি মোহর বাহির করিয়া আবরণধারী লোকটিকে দিতে গেল। লোকটি হাত দিয়া বারণ করিল।]

নিধু॥ বাঃ, কি রকম লোক তুমি! আচ্ছা আহাম্মক তো! একদিন একবার পাল্কী বয়ে দু' দুটো মোহর রোজগার—তাতেও তোমার মন উঠছে না! মন্দিরের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে কত রোজগার হয় শুনি?

[আবরণধারী লোকটি তথাপি নিরুত্তর।]

নিধু॥ শুনছ? আমাদের আর সময় নেই। কী—কালা না বোবা! মুখ দিয়ে যে কথা সরছেনা। চেহারা দেখে তো মনে হয় পাঁড় মাতাল। কী—টানবে নাকি দু'এক বোতল।

[আবরণধারী লোকটি মৃদু হাস্য করিল।]

নিধু॥ (গাঁজা বাহির করিয়া) এই নাও গাঁজা—নেশা কর। কোথায় লাগে

মদ! (লোকটি গাঁজা গ্রহণ করিল।) এইবার ওষুধে ধরেছে। যেমন মাছ তেমন টোপ ফেলতে হবে তো! এসো—শীগ্‌গির—

[রাজপথের দিকে উভয়ের দ্রুত প্রস্থান। গাজনের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। হরপার্বতীর সাজ মন্দিরাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিল। পশ্চাতে সপারিষদ রাজা ও সখিপরিবৃতা জয়ন্তী আসিয়া দাঁড়াইলেন। এবং তাঁহারা মন্দিরের বারান্দায় আসন গ্রহণ করিলেন। হরপার্বতীর সাজ বাদ্যকর সহ প্রাঙ্গনে নামিয়া নাচগান শুরু করিল।

— গান* —

ওলো একী তোর ভীমরতি।
কাটালি সন্ন্যাসিনী বেশে
তপফলে এই পেলি শেষে
(কেন) বরণ করলি বুড়ো পতি॥
যেমন তার রূপের ধটা
মাথায় দেখি তেমনি জটা
(আবার) সর্বঅঙ্গে ছাই মাখে
দেহ বেষ্টে সর্প থাকে
নেশার ঘোরে চক্ষু বুজে
কেমনে তোরে পেল খুঁজে
এখন কী হবে তোর গতি॥
স্বভাব যদি ভাল হোত
তাহলেও নয় বলা যেত
কোন গুণই নেই কো যে তার
কেমনে ফিরাবি তুই তার মতি॥

নৃত্য শেষে হরপার্বতী মন্দিরের অভ্যন্তরে চলিয়া গেল।]

---

* গীতরচয়িতা শ্রীনীরেন ভঞ্জের সৌজন্যে।

হবু ॥ দোহাই বাবা বুড়োশিব, দোহাই বাবা ভূতনাথ, দেশের মধ্যে সেরা আমাদের এই আজব দেশ। তোমার দয়ায় আজবদেশ দুনিয়ার মধ্যে যেন আজব হয়েই থাকে বাবা। মা জয়ন্তী, বুড়োশিবকে তোর কি মনোবাঞ্ছা জানালি মা? শিবের মত বর চেয়েছিস তো?

জয়ন্তী ॥ শিবের মত বর আমি চাইনে বাবা। রাতদিন সিদ্ধি খেয়ে ব্যোম্ ভোলানাথ হয়ে যিনি পড়ে থাকেন, তেমন বর ঐ পার্বতীরই থাক বাবা।

হবু ॥ এই সেরেছে—তবে কি রকম বর তুই চাইলি মা?

গবু ॥ সেটা প্রকাশ করলে মায়ের বাঞ্ছা অপূর্ণ থাকবে মহারাজ।

হবু ॥ তাও তো বটে—তাও তো বটে।

জয়ন্তী ॥ (গর্বিত ভঙ্গীতে) না বাবা আমার মনোবাঞ্ছা লুকোবার কোন কারণ নেই। আমি থাকতে চাই অপরাজিতা। জীবনে যেন কোনদিন কারো কাছে পরাজয় স্বীকার করতে না হয়—এই আমার বাসনা, এই আমার সাধনা, এই আমার প্রার্থনা।

গবু ॥ রাজসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধীকারিণী মা জয়ন্তী। তার পক্ষে এর চেয়ে বড় কামনা আর কিছু হতে পারেনা মহারাজ। হ্যাঁ—এ অহঙ্কার রাজকুমারী জয়ন্তীরই শোভা পায়।

[ইতিমধ্যে দেওয়ালগাত্রস্থিত 'আলোচাই—আরো আলো' লেখাটি জয়ন্তীর দৃষ্টিগোচর হওয়ামাত্র সে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।]

জয়ন্তী ॥ (পাঠ করিয়া) 'আলো চাই—আরো আলো'। মহারাজ, দেওয়ালের ঐ লেখাটি পড়েছেন? আপনি পড়েছেন মহামন্ত্রী?

হবু ॥ লেখা পড়ার মধ্যে আমি নেই মা। গবু, ব্যাপার কি দেখ।

গবু ॥ (পাঠ করিয়া) 'আলো চাই—আরো আলো'। তার মানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—কিষণচাঁদ আবার দেশে ফিরেছে।

জয়ন্তী ॥ কিষণচাঁদ! নামটা যেন শুনেছি মনে হচ্ছে।

গবু ॥ নাম শুনেছি। লোকটাকে আমরা কেউ চোখে দেখিনি।

হবু ॥ লোকটা ভগবান নাকি হে? নাম শুনি অথচ চোখে দেখিনে।

গবু॥ না—তা লোকটার বাহাদুরি আছে বলতে হবে। অনেক চেষ্টা করেও ধরতে পারিনি। রাজসরকার থেকে তাকে ধরার জন্য একহাজার মোহর পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। তাতেই সে পালিয়েছে। কিন্তু এখন দেখছি—সে আবার এসেছে। আবার সেই আওয়াজ তুলেছে—'আলো চাই—আরো আলো'।

হবু॥ লেকটা পাগল না ছাগল? এত আলো থাকতে আলো চাওয়ার কোনো মানে হয়! সূর্য আলো দিচ্ছে, চন্দ্র আলো দিচ্ছে, ঝাড় লণ্ঠন রয়েছে, প্রদীপের আলো রয়েছে, জোনাকী যে জোনাকী—সেও আলো দিচ্ছে—আবার আলো কি রে বেটাচ্ছেলে!

গবু॥ পাগল নয় মহারাজ—শয়তান। যা তা একটা ধূয়ো তুলে লোক ক্ষেপাবার মতলব।

জয়ন্তী॥ ঐ লেখা থেকেই বোঝা যাচ্ছে—সে আবার আজব দেশে এসেছে। শুধু আসেনি—'আরো আলো' চেয়ে রাজসরকারকে সে ব্যঙ্গ করছে। এ অবমাননা আমরা সইব না। মহারাজ, আপনি এখনি ঘোষণা করুন ঐ বিদ্রোহীকে যে বন্দী করে আনতে পারবে—এক হাজার নয়—পাঁচ হাজার মোহর তার পুরস্কার।

হবু॥ এখনই ঘোষণা কর গবু।

গবু॥ যথা আজ্ঞা মহারাজ। আসুন—সন্ধ্যা নেমে আসছে।

হবু॥ হ্যাঁ, চলো, চলো। এখনই প্রজারা চেঁচামেচি শুরু করবে—আলো চাই—আরো আলো। ওরে কে আছিস্? রাজকন্যার শিবিকা—

[সপারিষদ রাজার প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে শিবিকা লইয়া বাহকদের প্রবেশ। ইহাদের মধ্যে সেই কালোআবরণধারী লোকটিকে অন্যতম বাহকরূপে দেখা গেল। জয়ন্তী শিবিকায় আরোহণ করিলেন। বাহকগণের "হেঁইও—হেঁইও" শব্দে প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে ঢ্যাটরা সহযোগে ঘোষণা শোনা গেল—"বিদ্রোহী কিষণচাঁদকে ধরতে পারলে —পাঁচ হাজার মোহর পুরস্কার।" যবনিকা নামিতেছে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

রাজপ্রাসাদের মধ্যস্থ চত্বর। চত্বরের তিনপার্শ্বে বিরাট প্রাসাদের অংশসমূহ দেখা যাইতেছে। ডাহিনে ও বামে যাতায়াতের পথ রহিয়াছে। পথের পার্শ্বে রক্ষীগণ চিত্রবৎ দণ্ডায়মান। উত্তেজিতভাবে রাজকুমারী জয়ন্তীর প্রবেশ।

জয়ন্তী ॥ বাবা, বাবা—(রক্ষীরা সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। জয়ন্তী পশ্চাৎ ফিরিয়া দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে লক্ষ করিয়া—) বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? এস, ভিতরে এস।

[আগন্তুক দ্বিধাজড়িত চরণে ভিতরে প্রবেশ করিল। দেখা গেল—সে আর কেহ নহে—পূর্ববর্ণিত কিষণচাঁদ।]

জয়ন্তী ॥ (কিষণচাঁদকে) আমার সঙ্গে আসছ। তোমার সংকোচ কি—ভয়ই বা কি !

কিষণচাঁদ ॥ আমি—আমি সামান্য শিবিকা বাহক। আমাকে রাজপ্রাসাদে এনে অপরাধী করবেন না রাজকুমারী।

জয়ন্তী ॥ হতে পার তুমি বাহক। কিন্তু একথাও সত্য, তুমি বীর—মহাবীর। পাগলা হাতীর আক্রমণে আর সব বাহকরা পালাল—কিন্তু তুমি পাগলা হাতীর সঙ্গে একা লড়াই করেছ। আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছ। তুমি আমার জীবনদাতা। মহারাজের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। এস।

কিষণচাঁদ ॥ আমি প্রবেশ করব রাজঅন্তঃপুরে ?

জয়ন্তী ॥ নিঃসঙ্কোচে প্রবেশ করবে। আজ থেকে রাজপ্রাসাদে তোমার অবারিত দ্বার। আজ থেকে তুমি আমার শিবিকাবাহক নও—আজ থেকে

তুমি আমার দেহরক্ষী। সর্বক্ষণ তুমি আমাকে অনুসরণ করবে ছায়ার মতো।

কিষণচাঁদ ॥ রাজকুমারীর অসীম অনুগ্রহ। দায়িত্ব অতি গুরুতর। কিন্তু এ দায়িত্ব বহন করবার জন্যে রাজ্যের যে কোন প্রজা এগিয়ে আসবে।

জয়ন্তী ॥ না—তা আসে না। হাতীটা যখন রুখে এল, পথে কত প্রজাই তো ছিল, কেউ এগিয়ে এল? প্রজাদের মনে আজ বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছে কে এক কিষণচাঁদ। কোনদিন তাকে চোখে দেখিনি, কিন্তু স্পষ্ট দেখছি তার অসামান্য ক্ষমতা। পাঁচহাজার মোহর পুরস্কারের লোভেও কেউ তাকে ধরিয়ে দেয়না। সে এক আওয়াজ তুলেছে—'আলো চাই—আরো আলো', যার কোন মানে হয় না। আলোর অভাবটা কোথায়? কিন্তু কি আশ্চর্য—কেউ কথাটা তলিয়ে দেখছে না। অথচ তাই নিয়ে বিদ্রোহ হচ্ছে। এদের শায়েস্তা করতে হবে এস।

কিষণচাঁদ ॥ রাজকুমারী সত্যিই বলেছেন—আলোর অভাবটা কোথায়—কেউ তা তলিয়ে দেখছে না। চলুন।

[জয়ন্তী কিষণচাঁদকে লইয়া প্রাসাদাভ্যন্তরে চলিয়া গেল। পরক্ষণেই অপর পার্শ্ব হইতে মাথা বাহির করিলেন—য়্যাং ব্যাং ও চ্যাং পণ্ডিত।]

য়্যাং ॥ (রক্ষীর প্রতি) রক্ষীবর—যাঁরা গেলেন—ওঁরা কারা?

১ম রক্ষী ॥ রাজকুমারী জয়ন্তী।

২য় রক্ষী ॥ আর তাঁর নবনিযুক্ত দেহরক্ষী।

ব্যাং ॥ নারদ! নারদ! তাই এত তেজ! বীরদর্পে মেদিনী কাঁপিয়ে চলে গেলেন।

চ্যাং ॥ আমরা মহারাজের দর্শনপ্রার্থী।

১ম রক্ষী ॥ এখন মহারাজের দর্শন হবে কি না সন্দেহ।

২য় রক্ষী ॥ এখন এখানে মার্জার-তদন্ত পরিষদের সভা বসবে।

য়্যাং ॥ কে হে তুমি অর্বাচীন? জানো—আমরা কে?

ব্যাং ॥ উনিই স্বনামধন্য য্যাং পণ্ডিত।

য্যাং ॥ আর ইনি দেশবিখ্যাত ব্যাং পণ্ডিত।

ব্যাং ॥ (চ্যাংকে দেখাইয়া) আর ইনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চ্যাং পণ্ডিত।

য্যাং, ব্যাং, চ্যাং ॥ (সমস্বরে) এই আমরা তিনজনই হচ্ছি মার্জার তদন্ত পরিষদের সদস্য।

১ম রক্ষী ॥ মূর্খ বলেই আপনাদের মতো পণ্ডিতদের আমরা চিনতে পারিনি।

২য় রক্ষী ॥ মানে—আদার ব্যাপারী—বিদ্যার এত বড় সব জাহাজের খবর তাই আমরা রাখিনি। আমাদের দয়া করুন।—

১ম রক্ষী ॥ আমাদের ক্ষমা করুন। আপনারা আসন গ্রহণ করুন।

য্যাং ॥ মার্জার তদন্ত পরিষদের রায় চাট্টিখানি কথা নয়। গলদটলদ আছে কিনা—আর একবার দেখে নাও।

ব্যাং ॥ খুবই সমীচীন প্রস্তাব। গলদ যদি কিছু থাকে—এই ফাঁকে শুধরে নাও।

য্যাং ॥ (রায় পাঠ) "মার্জার দেখিতে যদিও নিরীহ গৃহপালিত প্রাণী—কিন্তু প্রাণীবিজ্ঞান মতে মার্জার মাংসাশী, স্তন্যপায়ী প্রাণী গোষ্ঠীর অন্যতম—যে প্রাণী গোষ্ঠীর প্রধান হইলেন সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি মহা হিংস্র মহাবলবান প্রাণী। ইতিহাসে বর্ণিত আছে দুই হাজার বৎসর পূর্বে মিশর দেশে মার্জারকে দেবতার আসন দেওয়া হইত—পূজা করাও হইত। গৌড়বঙ্গ প্রভৃতি দেশে ষষ্ঠি দেবীর বাহনরূপে মার্জার আজিও দুগ্ধ কদলী অর্ঘ্য পাইয়া থাকেন।

ব্যাং ॥ য্যাং পণ্ডিতের ভাষা খুবই জোরালো। কি বলহে চ্যাং?

চ্যাং ॥ লেখবার ক্ষমতা, তুমি ব্যাং—তোমারও নেই। আমি চ্যাং—আমারও নেই। ছড়া বেঁধেছে যে সব—শোননি? "বলতে ব্যাং, লিখতে য্যাং, বুঝতে চ্যাং।"

ব্যাং ॥ (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) চুপ, মহারাজ আসছেন।

[গবুচন্দ্র ও পারিষদগণসহ মহারাজ হবুচন্দ্রের প্রবেশ। সঙ্গে আসিল রাজগৃহাধ্যক্ষ লক্ষপতি।]

পণ্ডিতত্রয় ॥ জয়তু মহারাজ।

হবু ॥ এঁরা কারা মহামন্ত্রী?

গবু ॥ বেড়াল তদন্ত পরিষদের মাননীয় সভ্যবৃন্দ—য়্যাং পণ্ডিত, ব্যাং পণ্ডিত, চ্যাং পণ্ডিত।

হবু ॥ এরা—এরা বেড়াল!

[পণ্ডিতত্রয় পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলেন।]

য়্যাং ॥ বেড়াল! আমরা?

গবু ॥ না, না, আপনারা নন। মহারাজের সেই পীড়িত বেড়ালটা নিয়ে আপনারা তদন্ত করেছিলেন তো?

পণ্ডিতত্রয় ॥ আজ্ঞে।...

হবু ॥ ওহো—বুঝতে পেরেছি। সেই তদন্তের রায় লিখে এনেছেন।

য়্যাং ॥ হ্যাঁ মহারাজ।

হবু ॥ বেড়ালটা আমার রথের চাকার নীচে চাপা পড়ল কেন?

য়্যাং ॥ পূর্বজন্মে একটা অন্ধ ইঁদুর শাবককে দয়া ক'রে মারেনি—সেই পুণ্যে মহারাজ—এই জন্মে ঐ বেড়ালের এই সৌভাগ্য হলো।

হবু ॥ বাঃ—চমৎকার যুক্তি। সেই পুণ্যে আমার রথের চাকার নীচে পড়বার সৌভাগ্য হলো!

ব্যাং ॥ সৌভাগ্য নয় মহারাজ? চাপা পড়ে মরবার কথা—মরল না। অধিকন্তু মহারাজ তাকে সাদরে প্রাসাদে এনে অধ্যক্ষের হাতে তুলে দিলেন। দৈনিক এক মণ দুধ তার জন্যে পথ্য নির্দিষ্ট হলো। এ কি পুণ্যের ফল নয়?

হবু ॥ তা বটে। এক সপ্তাহ পরে প্রাসাদ-অধ্যক্ষ যখন খবর পাঠালেন —বেড়ালটার শরীর আরো রোগা হয়েছে—দৈনিক এক মণ দুধে কিছু হচ্ছে না— তক্ষুনি, দুধ সত্যি সত্যি বেড়ালের পেটে যাচ্ছে কিনা তা দেখবার জন্যে একজন

তত্ত্বধায়ক নিযুক্ত করলাম। কিন্তু হপ্তা শেষে দেখি—বেড়াল আরও কাহিল হয়ে পড়েছে। তখন আমার বুঝতে বাকি রইল না যে—রাজ্যে দুর্নীতি ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

চ্যাং॥ এ বিষয়েও আমরা তদন্ত করে দেখেছি মহারাজ।

ব্যাং॥ তত্ত্বাবধায়ক সাক্ষ্যে বলেছেন—চুরিচামারি করেও যে একছটাক দুধ খেতে পেতনা—সেই বেড়াল দৈনিক আধমণ দুধ সহ্য করতে না পেরে কঠিন উদরাময়ে আক্রান্ত হল। নাসিকা গ্রন্থির বিবর্ধন হল, কোকিল চক্ষু স্ফীত হতে স্ফীততর হতে লাগল।

হবু॥ আমি আপনাদের কথা ঠিক বুঝতে পারছি না পণ্ডিত।

চ্যাং॥ আজ্ঞে, এসব জটিল দেহতত্ত্বের কথা।

হবু॥ জটিল নিশ্চয়। নইলে কি, আবার আর এক হপ্তা পর বেড়াল মর মর হয়েছে শুনে, দুর্নীতি ঠেকাতে না পেরে, তাদের ওপর একজন পরিদর্শক বহাল করলাম।

গবু॥ মহারাজ যথার্থ পন্থাই অনুসরণ করেছিলেন। প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করাই বিচারকের ন্যায় ধর্ম।

হবু॥ কিন্তু পরিদর্শক বহাল করবার পর কাণ্ডকারখানা দেখে 'থ' বনে গেলাম। বেড়ালকে আর বেড়াল বলে চেনাই যায় না। হাড় বেরিয়ে পড়েছে —ব্যাটা মিউ মিউ বুলি পর্যন্ত ভুলে গেছে।

চ্যাং॥ তখন মহারাজ নিযুক্ত করলেন—আমাদের তিনজনের এই তদন্ত পরিষদ।

ব্যাং॥ আদ্য পান্ত পরীক্ষা করে, সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে, বিচার-বিশ্লেষণ করে—আমাদের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেছি।

য়্যাং॥ মহারাজের অনুমতি হলে আমি তা পাঠ করি।

হবু॥ কিন্তু তার আগে বেড়ালটিকে আমি দেখতে চাই এই—কে আছিস্। (রাজ ভৃত্যের প্রবেশ) আমার বেড়াল্‌ !

[রাজভৃত্যের প্রস্থান]

হবু॥ ভদ্রস্থপরিষদের সভ্যবৃন্দ! এই অবসরে আপনাদের নিকট আমি একটি স্বপ্নবৃত্তান্ত বলছি। অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য এই স্বপ্ন।

গবু॥ হিং-টিং-ছট্?

হবু॥ তার চেয়ে জটিল বলে মনে হচ্ছে মহামন্ত্রী। এক রাত্রে মনে হলো যেন আমার মাথায় কী যেন একটা গুরুভার। তবু সেটা মাথায় নিয়ে অন্ধকার রাতে একা আমি পালাচ্ছি।

চ্যাং॥ গুরুভার বহনই রাজধর্ম।

হবু॥ হবে। হঁ্যা, সাধারণ বোঝা বলতে যা মনে হয়—তা নয়। মনে হলো—যোজন ব্যাপী তার আকার—আমি যেন মাথায় বয়ে চলেছি। একা,—চুপিচুপি, অন্ধকার রাতে।

ব্যাং॥ মহারাজের উপযুক্ত বোঝা যোজনব্যাপী হওয়াই চাই।

হবু॥ তাই মনে হল। কিন্তু বোঝাটা যে কি—আমি বুঝলাম না। অন্ধকার রাতে মাথায় নিয়ে আমি রাজা—চোরের মতো চলেছি। বোঝাটা থেকে কেবল আওয়াজ বেরুচ্ছে—ছলাৎ—ছলাৎ—ছলাৎ।

চ্যাং॥ বুঝেছ য়্যাং?

য়্যাং॥ বুঝেছি।

চ্যাং॥ বুঝেছ ব্যাং?

ব্যাং॥ বুঝেছি।

হবু॥ কি বুঝলেন?

ব্যাং॥ বলছি। এই বেড়ালটার কথাই মহারাজ দিনরাত ভাবতেন।

গবু॥ ভেবে ভেবে মহারাজের চেহারাই খারাপ হয়ে গেছে।

[রাজভৃত্যের মুমূর্ষু বেড়াল সহ প্রবেশ]

গবু॥ এই সেই বেড়াল মহারাজ।

হবু॥ (বেড়ালটিকে দেখিয়া) এযে নড়ে না।

য়্যাং॥ ওর অস্থিবেষ্টে উপক্ষত হয়েছে তাই।

হবু॥ এযে ডাকে না।

ব্যাং ॥ ওর গতিজনন স্নায়ুতে অভিঘাতিক আক্ষেপ হয়েছে কিনা

হবু ॥ এযে তাকায় না।

চ্যাং ॥ ওর চক্ষুর বিধানতন্ত্রতে বিসর্প হয়েছে যে।

হবু ॥ আরে এটা যে মরে গেছে।

ম্যাং ॥ মৃত্যুই জীবের স্বাভাবিক পরিণতি মহারাজ।

ব্যাং ॥ নিয়তিও বটে।

চ্যাং ॥ নিয়তি কেন বাধ্যতে মহারাজ!

হবু ॥ হুঁ। আরে হতভাগা বেড়াল, রাজ-গৃহাধ্যক্ষের হাতে তোর অবস্থা হ'ল কাহিল। তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হওয়ার পর তোর অবস্থা হল জটিল। পরিদর্শক নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা হল গুরুতর। আর তদন্ত পরিষদ নিযুক্ত হতেই পেয়ে গেলি অক্কা। অথচ তোর জন্য দৈনিক বরাদ্দ ছিল এক মণ দুধ।

লক্ষপতি ॥ (সাভিমানে) উপরিওয়ালার সংখ্যা যত বাড়ল বেড়ালের অবস্থা ততই কাহিল হতে লাগল মহারাজ। দেখাশোনা'র ভারটা প্রথম যেমন আমার হাতেই দিয়েছিলেন—শেষ পর্যন্ত যদি তাই রাখতেন মহারাজ—তবে দুধটা যদিও একটু আধটু নয় ছয় হতো, তবু এটা জোর গলাতেই বলব যে—ওর দুধভাতের বরাদ্দটা এমন করে একেবারে উপে যেতনা মহারাজ। বেচারী বেড়ালটা এমন অকালে অক্কা পেতনা মহারাজ।

হবু ॥ (তদন্তপরিষদের প্রতি) এর কথাই কি ঠিক। পড় তোমাদের রায়। ওরে বাবা, এযে মহাভারত।

ম্যাং ॥ হ্যাঁ মহারাজ। আট শত একান্ন পৃষ্ঠা। তবেই বুঝুন কি নিদারুণ পরিশ্রমে আমরা তদন্ত করেছি। উপক্রমণিকা। মার্জার দেখিতে যদিও নিরীহ গৃহ পালিত প্রাণী কিন্তু প্রাণীবিজ্ঞান মতে মার্জার মাংসাশী স্তন্যপায়ী প্রাণী গোষ্ঠীর অন্যতম। যে প্রাণীগোষ্ঠীর প্রধান হইলেন সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি মহাহিংস্র জন্তু। ইতিহাসে দেখা যায়—দুই হাজার বৎসর পূর্বে এই মার্জার মিশরে সসম্মানে পুজিত হইত। অদ্যাবধি তাহাদের 'মমি' মিশরের ভূগর্ভে পরিদৃষ্ট হয় - মার্জার সামান্য প্রাণী নয় চুরি বিদ্যায় অতীব দক্ষ···।

হবু ॥ (বাধা দিয়া) দাঁড়াও—মানুষের চেয়েও ?

[পণ্ডিতত্রয় কি বলিবেন ভাবিতেছিলেন ।]

হবু ॥ (সপদদাপে) বল পণ্ডিতরা—

ব্যাং ॥ ভয়ে বলব—না নির্ভয়ে বলব মহারাজ ?

হবু ॥ নির্ভয়ে বল—

য়্যাং ॥ মনুষ্যজাতি যে সব বিদ্যায় বিভূষিত হয়ে সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম বলে পরিগণিত হয়েছে, চুরি বিদ্যা তন্মধ্যে অন্যতম ।

ব্যাং ॥ বস্তুতঃ চুরিবিদ্যায় মনুষ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ ।

চ্যাং ॥ শাস্ত্রে চৌর্যবৃত্তি সম্পর্কে উক্ত হয়েছে :—'চুরি বিদ্যাং বড় বিদ্যাং যদি না পড়ে ধরাং ।'

হবু ॥ কিন্তু তোমরা ধরাং পড়েছ । এত দুধ চুরিং করেছ যে আমার বেড়ালটা এক ছটাকং দুধং না পেয়ে মারাং গেছে । গবু, এদের তিন জনকেই শূলেং দাও ।

[পণ্ডিতত্রয় আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন ।]

য়্যাং ॥ মহারাজ, আমরা শূলে চড়লে আপনার স্বপ্নের অর্থটা কে বলবে !

হবু ॥ ও, তাওতো বটে । কি বল গবু ?

গবু ॥ হ্যাঁ মহারাজ । সামান্য দুধ চুরির জন্য শূলে দেওয়া আর মশা মেরে হাত কাল করা—একই কথা । ছেড়ে দিন । বরং স্বপ্নের অর্থটা শোনা যাক । বলুন ।

ব্যাং ॥ চৌর্যবৃত্তি জীবের স্বাভাবিক বৃত্তি । মনের গোপন গহনবনে প্রতি জীব—চোর । মহারাজ, আপনি যে আপনি—এতবড় দেশের রাজা—স্বয়ং আপনিও ।

হবু ॥ (বিস্মিত হইয়া) আমিও ?

চ্যাং ॥ আজ্ঞে, হ্যাঁ মহারাজ । যখন দেখলেন রাজ্যে সবাই চুরি করছে —তখন আপনি ভাবলেন, "আমিইবা—ঠকবো কেন ?" মনে মনে আপনিও চুরি করতে বেরুলেন । স্বপ্নে ।

হবু ॥ (চিন্তিতভাবে) আ—মি !

চ্যাং ॥ হ্যাঁ, মহারাজ।

হবু ॥ দেশের রাজা আমি—আমি কী চুরি করতে পারি ?

চ্যাং ॥ পুকুর। আপনার মহারাজ—পুকুর চুরি ছাড়া আর কিছু শোভা পায় না। তাই যোজনব্যাপী এক পুকুরের বোঝা মাথায় নিয়ে আপনি অন্ধকারে একা কাউকে না জানিয়ে চলছিলেন। পুকুরের জল ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করছিল। মনে মনে আপনিও চোর—আপনার স্বপ্নই তার প্রমাণ।

হবু ॥ বটে !

পণ্ডিতত্রয় ॥ হ্যাঁ মহারাজ, কথাটা ভেবে দেখুন। আমরা যদি দোষী, আপনিও তবে বাদ যান না।

গবু ॥ পণ্ডিত হয়েও দেখছি আপনারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এ নীতি জানেন না যে—রাজা কখনো দোষ করতে পারেন না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ। আচ্ছা, আমরা তবে আসি !

[পণ্ডিতত্রয় সহ গবুর প্রস্থান]

হবু ॥ (আপন মনে) পুকুর চুরি ! দেশের রাজা আমি করেছি পুকুর চুরি ! হ্রদ নয়—নদী নয়—সামান্য পুকুর। অসম্ভব—অসম্ভব।

[এমন সময় কিষণচাঁদকে লইয়া জয়ন্তীর প্রবেশ। সঙ্গে দুই সখী চম্পা ও রম্ভা।]

জয়ন্তী ॥ (মহারাজের প্রতি) আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুমি এখানে ?

হবু ॥ মহাসমস্যা মা।

জয়ন্তী ॥ তুমি তো শুধু বেড়াল বেড়াল করেই অস্থির। এদিকে পাগলা হাতির জ্বালায় যে আমাদের প্রাণান্ত।

হবু ॥ পাগলা হাতী ? বেড়ালের পর আবার হাতী ? তোমাদের পাল্কীর নীচে চাপা পড়েছে নাকি ?

জয়ন্তী ॥ কি মুস্কিল। তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না হাতীই পাল্কী চাপা দিতে আসে। হাতীই আমাদের আক্রমণ করে।

হবু ॥ কী সাংঘাতিক! তারপর?

জয়ন্তী ॥ পাল্কী ফেলে সবাই পালাল। রাজকুমারীকে রক্ষা করতে কেউ এগিয়ে এল না। এল শুধু এই বাহক। (কিষণচাঁদকে) এসো, সামনে—এসো—এই বাহকই পাথর ছুঁড়ে পাগলা হাতীটা জখম করে আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে বাবা।

হবু ॥ তুমি শুধু ওকে বাঁচাওনি—সেই সঙ্গে আমাকেও। কি পুরস্কার—তোমায় দেব ভেবে পাচ্ছি না।

জয়ন্তী ॥ আজ থেকে ওই হবে আমার দেহরক্ষী। তুমি অনুমতি দাও বাবা!

পারিষদ ॥ দেহরক্ষী! এত সব সেপাই-সান্ত্রী থাকতেও রাজ কুমারীর দেহ বিপন্ন!

হবু ॥ কি মুস্কিল! সেপাই-সান্ত্রীরা যদি রাজকন্যার দেহই রক্ষা করবে—তবে লড়াই করবে কে? না, না—রাজকন্যার একজন দেহরক্ষী দরকার—অন্ততঃ যদ্দিন বিয়ে না হয়। বিয়েটা হয়ে গেলে—তারপর আর আমার ভাববার কিছু নেই। হ্যাঁ মা, আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম—ওহে হাতীমার আজ থেকে তুমি আমার জয়ন্তী মার দেহরক্ষী হলে।

[কিষণচাঁদ রাজাকে অভিবাদন করিল।]

হবু ॥ (কিষণচাঁদকে) আর এই রত্নহার তোমাকে পুরস্কার দিচ্ছি। (কিষণচাঁদ সশ্রদ্ধভাবে রত্নহার গ্রহণ করিল।) দেখ বাবা, সেই দুষমণ কিষণচাঁদকে বড় ভয়। চাইছে আলো, আর ব্যাটা লুকিয়ে আছে অন্ধকারে। ঝোপ বুঝে কখন কোপ মারবে—বলা যায় না। রাস্তা-ঘাটে রাজকন্যা যখন বেরুবেন—চারিদিকে চোখ রেখ। বুঝলে বাবা—হ্যাঁ—তোমার নাম?

কিষণচাঁদ ॥ আজ্ঞে—সূর্যলাল।

হবু ॥ একে সূর্য—তায় আবার লাল। বেশ—বেশ। ওরে ব্যাটা কিষণ-চাঁদ—কত আলো চাস্ আয়—পিঠে বস্তা বেঁধে আয়। হা-হা-হা।

[সহাস্যে অন্যান্য পারিষদ ও রক্ষীগণ সহ হবুচন্দ্রের প্রস্থান।]

জয়ন্তী ॥ (কিষণচাঁদকে) বাবা তোমার ওপর খুব খুশী হয়েছেন দেখছি।

কিষণচাঁদ ॥ মহারাজের অনুগ্রহ।

জয়ন্তী ॥ না, না, অনুগ্রহ নয়। এ তোমার সাহসের পুরস্কার।…না, আজ বড় ক্লান্ত। এস, এখানেই বসি। একি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আঃ—বসো। বসোনা ঐ আসনে। কেন তোমার এত সংকোচ বল তো? (কোন উত্তর না পাইয়া) চম্পা, আমার চাবুক।

চম্পা ॥ চাবুক? এই অসময়ে!

জয়ন্তী ॥ চাবুকের আবার সময় অসময় কি? এ রাজ্যে সময় অসময় জানই বা কার আছে। নইলে দিনের বেলায় সূর্যের যখন প্রচণ্ড আলো তখনও তো দেখি লোক চেঁচামেচি করে আলো চাই, আরো আলো। যাও—

[চম্পার প্রস্থান। কিষণচাঁদ তখনও বসে নাই দেখিয়া জয়ন্তী চটিয়া গেলেন। কড়া আদেশ দিলেন—]

জয়ন্তী ॥ বসো।

[আদেশের সঙ্গে সঙ্গে কিষণচাঁদ বসিয়া পড়িল। জয়ন্তী ইহাতে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।]

জয়ন্তী ॥ একটা বুনো হাতীকে তুমি ভয় পাওনা—অথচ আমাকে তুমি ভয় পেলে।

কিষণচাঁদ ॥ তাইতো দেখছি।

জয়ন্তী ॥ কেন, আমি বাঘ, না ভালুক?

কিষণচাঁদ ॥ বাঘ ভালুক হলে ভয় পেতাম না রাজকন্যা। তাদের সঙ্গে লড়াই করা চলে। কিন্তু আপনার সঙ্গে লড়াই করা চলবে না বলেই ভয়।

[চাবুক হস্তে চম্পার প্রবেশ। জয়ন্তীকে অর্পণ।]

জয়ন্তী ॥ আমার সঙ্গে লড়াই নয়—আমার হয়ে লড়াই করতে হবে

তোমাকে। বিদ্রোহী ঐ কিষণচাঁদকে শায়েস্তা করতে হবে। (শূন্যে চাবুক আস্ফালন করিয়া) পারবে তুমি?

কিষণচাঁদ॥ আমি তো কাউকে কোনদিন চাবুক মারিনি রাজকুমারী।

জয়ন্তী॥ পাথর ছুঁড়ে হাতীকে জখম করার চেয়ে মানুষের পিঠে চাবুক মারা ঢের সোজা, সূর্যলাল। চলো তুমি আমি বেরিয়ে পড়ি—এই রাতের অন্ধকারে।

কিষণচাঁদ॥ কেন? কোথায়?

জয়ন্তী॥ অন্ধকারের আড়াল থেকে লোকটা ক্রমাগত চেঁচাচ্ছে—'আলো চাই—আরো আলো।' দেশের লোককে ক্ষেপিয়ে তুলছে। অন্ধকারের বুক চিরে তাকে খুঁজে বার করব। তার মুখোমুখি সোজা হয়ে দাঁড়াব। একটি বার শুধু জিজ্ঞেস করব, "আলো কি এখনো চাই? আরো আলো?"

কিষণচাঁদ॥ সে হয়ত বলবে—'রূপের আলোই একমাত্র আলো নয় সুন্দরী। জ্ঞানের আলোও—আলো। সেই আলোই আমরা চাই।' তখন?

জয়ন্তী॥ জ্ঞানের আলো!

কিষণচাঁদ॥ হ্যাঁ, জ্ঞানের আলো। কিষণচাঁদ সেই কথাই বলেছে—সেই আলোই চেয়েছে।

জয়ন্তী॥ সেই আলোই চেয়েছে? তুমি কি করে জানলে?

কিষণচাঁদ॥ লোকের মুখে শুনেছি।

জয়ন্তী॥ তুমি তাকে দেখনি?

কিষণচাঁদ॥ হয়তো দেখেছি। হ্যাঁ—আপনিও তাকে দেখে থাকবেন রাজকুমারী।

জয়ন্তী॥ আমি?

কিষণচাঁদ॥ তা বলা যায়না। শুনেছি লোকটা ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায় কখনও কৃষক হয়ে, কখনও সৈনিক সেজে—কখনও পণ্ডিতরূপে, কখনও মূর্খের বেশে—তাই দেখলেও আপনি তাকে চিনতে পারেননি রাজকুমারী।

জয়ন্তী ॥ তা হবে। (কি ভাবিলেন হঠাৎ) পাল্কী বাহকের বেশেও কি সে আসে?

কিষণচাঁদ ॥ (চমকিয়া উঠিল। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্য। তখনই আত্মস্থ হইয়া) না—তবে আমি ধরে ফেলতাম।

জয়ন্তী ॥ বিশ্বাস হচ্ছেনা। ভয়ে তোমার মুখের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। তুমি না একটা হাতী জখম করে এসেছ?

কিষণচাঁদ ॥ বার বার হাতীর কথাটা বলে আমায় লজ্জা দেবেন না রাজকুমারী। হাতীটা এমন কিছু বড় কথা নয়—হাতীর যতবড় দেহ আর যতখানি শক্তি—ততখানি বুদ্ধি থাকলে সামান্য একটা লোক তার পিঠে মাহুত হয়ে বসতে পারত না। বরং ভয় করি আপনাকে। আমার পিঠে দু'ঘা চাবুক মারতে গিয়ে ভাগ্যিস থেমে গেছেন তাই রক্ষা।

জয়ন্তী ॥ (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) তুমি চমৎকার বল। বুদ্ধিও দেখছি খুব। (পুনরায় মুহূর্তকাল তাহার দিকে তাকাইয়া) আমার একটা ধাঁধাঁর জবাব দেবে?

কিষণচাঁদ ॥ রাজকুমারী দেখছি একসঙ্গে চাবুকও চালান—ধাঁধাঁও লেখেন।

জয়ন্তী ॥ হ্যাঁ—তা বলতে পার। কিন্তু দুঃখ এই—না পাচ্ছি চাবুক মারার সুযোগ—না পাচ্ছি ধাঁধাঁর জবাব দেবার লোক!

কিষণচাঁদ ॥ কিন্তু সে জন্যে যে লোক খুঁজছেন—সে লোক আমি নই রাজকুমারী।

জয়ন্তী ॥ সেটা আমাকে পরখ করে দেখতে হবে। আমার সখীরা নাচ গানের ভেতর দিয়ে আমার ধাঁধাঁ বলবে। জবাব দিতে হবে তোমাকে।

কিষণচাঁদ ॥ সে কি রাজকুমারী?

জয়ন্তী ॥ হ্যাঁ, জবাব দিতে পারলে, তোমার কোন কামনা আমি অপূর্ণ রাখবনা সূর্যলাল। আর যদি জবাব দিতে না পার—(চাবুক আন্দোলন করিয়া) এই দেখছ?

কিষণচাঁদ ॥ ওরে বাবা। আমি হলাম দেহরক্ষী, আমাকে নিয়ে এসব পরীক্ষা কেন রাজকুমারী ?

জয়ন্তী ॥ দেহরক্ষী হতে হলে—আমার মন রক্ষাও তোমাকে করতে হবে সূর্যলাল। হ্যাঁ, এ তারই পরীক্ষা। আমার প্রথম ধাঁধাঁ—

রাতের অন্ধকারে
যে মায়া জাগালো মদির স্বপন
আকুল করিল আমার ভুবন।
দিবসের জাগরণে
নিঠুর আঘাতে সে
মরীচিকা আমার
ভেঙ্গে যায়—হায়
মুছে যায় বারে বারে।

[কবিতা আবৃত্তি করার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তী নৃত্যরতা হইল। চম্পা, রম্ভা ও অন্যান্য সখীগণ রাজকুমারীর সঙ্গে নাচতে লাগিল।]

কিষণচাঁদ ॥ (সোচ্ছ্বাসে) আমি জানি—আমি জানি রাজকুমারী—কি সে মায়া—কি সে মরীচিকা যা রাতে মানুষের মনকে উতলা করে দেয়—আর দিনের আলোতে শূন্যে মিলিয়ে যায়।

জয়ন্তী ॥ বল—বল সূর্যলাল।

কিষণচাঁদ ॥ আশা—আশা, রাজকুমারী মনের আশা।

জয়ন্তী ॥ সূর্যলাল—সূর্যলাল, আমার হেঁয়ালি রচনা সার্থক। তুমি শুধু বীর নও, দেখছি তুমি পণ্ডিতও।

কিষণচাঁদ ॥ না রাজকুমারী, পাণ্ডিত্যের অভিমান আমার নেই। তবে ধাঁধাঁ মেলানো আমার একটা নেশা।

জয়ন্তী ॥ দু'জনের একই নেশা! আশ্চর্য! (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিষণচাঁদের প্রতি তাকাইয়া) সত্য বল—কে তুমি ?

কিষণচাঁদ ॥ আমি শিবিকাবাহক এ কথা মিথ্যা নয় রাজকুমারী।

জয়ন্তী ॥ কিন্তু তুমি পণ্ডিত—এ কথাও মিথ্যা নয়।

কিষণচাঁদ ॥ তবে শুনুন রাজকুমারী। পুরাকালে জড়ভরত নামে এক মুনি ছিলেন। পথের পাশে বসে ধ্যান করতেন। রাজার শিবিকা বাহকের জন্য লোক কম পড়ায়—তাঁকে শিবিকা বহনের জন্য টেনে নেওয়া হয়। জড় ভরত মুনি তাতে আপত্তি করলেন না। রাজা শিবিকায় বসে বসে কি শ্লোক আওড়াচ্ছিলেন, জড়ভরত তাতে ভুল পেয়ে রাজার ভুল সংশোধন করে দিলেন। অতটা বিদ্যা আমার অবশ্য নেই, কিন্তু, আজ চৈত্ সংক্রান্তির মেলাতে আমারও হয়েছে সেই দশা। আমি অবশ্য মুনি নই—পণ্ডিত কিনা—তাও জানি না। পরমা সুন্দরী রাজকন্যার শিবিকা বহন করতে পেরেছি—এ যেন বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে।

জয়ন্তী ॥ কৌতুহলের পর কৌতুহল জাগছে—আমার মনে—তোমার জন্য। না জানি তুমি কত বড় পণ্ডিত। আমি তোমাকে জানতে চাই, আমি তোমাকে বুঝতে চাই। স্পষ্ট করে না বল, ধাঁধাঁয় বল—কে তুমি? কি তুমি চাও?

কিষণচাঁদ ॥ একটা ধাঁধাঁ—একটা ধাঁধাঁর কথাই আজ বিশেষ করে মনে পড়ছে আমার। পৃথিবীতে কি সে জিনিস—যা দেহে আনে উত্তাপ—কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে যায়?

জয়ন্তী। খুব শক্ত মনে হচ্ছে তোমার ধাঁধাঁ। উত্তর দেবার মত বিদ্যা-বুদ্ধি তো খুঁজে পাচ্ছি না সূর্যলাল।

কিষণচাঁদ ॥ বিদ্যা বুদ্ধিতে জীবনের সব হেঁয়ালির অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়না রাজকুমারী। তার সমাধান খুঁজতে হয় নিজের মনে।

জয়ন্তী ॥ (চমকিত হইয়া—কতকটা আপন মনে) নিজের মনে! মনের দিকে কি তাকিয়েছি কোনদিন! সবাই আমরা ব্যস্ত রাজ্য নিয়ে, ক্ষমতা নিয়ে, ক্ষমতার দম্ভ নিয়ে। মনের খবর রাখিনি—রাখবার সময় পাইনি। আজ প্রথম বুঝছি—আমার দেহে এসেছে উত্তাপ। প্রথম অনুভব করছি—আমার শিরায়—ধমনীতে—আমার প্রতি অঙ্গে উষ্ণ রক্তস্রোত বইছে। উত্তর আমি

পেয়েছি সূর্যলাল। তোমার ধাঁধাঁর উত্তর 'রক্ত'—হ্যাঁ, রক্ত—যা দেহে এনেছে উত্তাপ! কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে যাবে বরফের মত ঠাণ্ডা।

[এমন সময় ব্যস্ত ভাবে সপারিষদ রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ।]

হবু॥ সর্বনাশ হয়েছে মা—সর্বনাশ হয়েছে। বিদ্রোহী কিষণচাঁদ রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়েছে।

জয়ন্তী॥ কিষণচাঁদ!

গবু॥ হ্যাঁ, মা। গুপ্তচর সংবাদ এনেছে—কিষণচাঁদ নাকি ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছে। (হঠাৎ কিষণচাঁদের দিকে নজর পড়িতেই মহামন্ত্রী সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন—) এ লোকটি কে মা?

হবু॥ তুমি তো সেই হাতীমার হে—না?

গবু॥ হাতীমার!

জয়ন্তী॥ ও আপনি শোনেন নি! চৈত্ সংক্রান্তির মেলা থেকে ফেরবার সময় একটা বুনো হাতী আমাকে আক্রমণ করেছিল—

গবু॥ ও হ্যাঁ, শুনেছি। এ তবে তোমার সেই শিবিকা বাহক?

জয়ন্তী॥ হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গে আমি একে আমার দেহরক্ষী নিযুক্ত করেছি।

হবু॥ তাই কতকটা নিশ্চিন্ত আছি গবু। লোকটা বীর। (কিষণচাঁদকে) হাতীকে জখম করেছ। এবার ঐ শেয়ালটাকে ঘায়েল করো দেখি বাবা।

কিষণচাঁদ॥ আপনি মহারাজ—সেই কিষণচাঁদের কথা বলছেন তো?

হবু॥ হ্যাঁ বাবা—হ্যাঁ। কোথায় কোন গর্ত থেকে কেবলই হুক্কাহুয়া করছে। শেয়াল ছাড়া কী!

কিষণচাঁদ॥ তা যা বলেছেন—লোকটাকে চেনা যায় না। চায় বটে আলো—কিন্তু নিজে রয়েছে অন্ধকারে। কোথায় আছে—কে জানে!

হবু॥ কি বিপদ বল দেখি গবু। কে যে এখন কিষণচাঁদ নয়—ভাব।

গবু॥ আপনি বিচলিত হবেননা মহারাজ। যাতে প্রত্যেক লোকের দেহ তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করতে পারা যায়—সে জন্যে আমি প্রাসাদ অবরোধের আদেশ দিয়েছি মহারাজ।

হবু ॥ আদেশ দিয়েছ কাকে ?

গবু ॥ কেন ? রাজপ্রাসাদ অধ্যক্ষ লক্ষপতিকে।

হবু ॥ তবেই হয়েছে। এদ্দিন—ঘি-ভাত খাচ্ছিল—এখন তবে খাবে পোলাও কোর্মা আর কাবাব। আমি দেখেছি গবু—আইনের কড়াকড়ি যত বাড়ছে—ঐ সব লক্ষপতিদের তত সু বধে হচ্ছে।

গবু ॥ না, না—মহারাজ। আমি তা স্বীকার করিনা। লোকে ঐ ়বে রটনা করে বলেই মহারাজের মনে এ সন্দেহ ঢুকেছে! বেশ তো, আজ মহারাজই নির্বাচন করুন এমন একজন বিশ্বস্ত সৈনিক—যে রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার রক্ষা করবে। একটি প্রাণীকেও—বিনা তল্লাসীতে বাইরে যেতে দেবে না।

হবু ॥ (কিষণচাঁদকে দেখাইয়া) এই লোকটা। ও বাবা হাতীকেও ভয় করেনা। কি হে, তুমি পারবে ?

জয়ন্তী ॥ কেন পারবেনা। আজ তোমার মহাপরীক্ষা সূর্যলাল।

গবু ॥ (কিষণচাঁদকে) যাও রক্ষী—অবিলম্বে তুমি সিংহদ্বারের ভার গ্রহণ কর। মনে রেখো—কিষণচাঁদের মাথার দাম পাঁচ হাজার মোহর—সে যেন কোন মতেই প্রাসাদ থেকে পলায়ন করতে সক্ষম না হয়!

জয়ন্তী ॥ আজ একটা কথা বুঝছি সূর্যলাল। এ রাজ্য অন্ধকারে ভরে গেছে। এখানে আমরা কেউ কাউকে চিনিনা। আজ আমিও বলছি—'আলো চাই—আরো আলো।' কিষণচাঁদকে আজ চাই-ই চাই। যাও—

[সকলকে অভিবাদন করিয়া কিষণচাঁদের প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে দূরে ভেরী বাজিয়া উঠিল।]

গবু ॥ প্রাসাদ অবরোধের সঙ্কেত মহারাজ। দেখি কিষণচাঁদ এবার কি করে পালায়।

হবু ॥ নাঃ, খুব বুদ্ধি বের করেছ গবু। এবার কিছুদিন নাকে মুখে ছিপি এঁটে বসে থাক। আবার কিছু জমুক হে, আবার কিছু জমুক।

[যবনিকা নামিল।]

তৃতীয় অঙ্ক

রাজপ্রাসাদমধ্যস্থ পূর্ববর্ণিত চত্বর। কাল সন্ধ্যা। হবু ও জয়ন্তী আলাপরত।

হবু॥ কাউকে বিশ্বাস নেই মা—কাউকে বিশ্বাস নেই। রাজপুরীর সব লোকগুলোই—মনে হচ্ছে—ছুরি শানাচ্ছে। গবু এসে বলে গেল—সিংহদ্বার খোলা পেয়ে রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়েছে এক পাল নেকড়ে বাঘ।

জয়ন্তী॥ নেকড়ে বাঘ!

হবু॥ মানুষই তারা—তবে খেতে না পেয়ে পেয়ে হন্যে হয়ে উঠেছে। সামনে যা পাচ্ছে—তাই খাচ্ছে। নেকড়ে বাঘ ছাড়া আর কি বলব। খুব দেহরক্ষী তুই বেছে নিয়েছিলি! সিংহদ্বার বন্ধ করতে গিয়ে—সিংহদ্বার খুলে রেখে পালাল।

জয়ন্তী॥ পালিয়েছে বলেই তাকে আমি চিনতে পারছি—তাকে বুঝতে পারছি। কিন্তু পালাতে সে পারবেনা—কোন মতেই না। সে আশে-পাশেই আছে। হয়তো ঐ নেকড়ে বাঘদের মধ্যেই আছে! তাকে ধরবার জন্যেই ধাঁধার জাল ফেলেছি—বিয়ের ফাঁদ পেতেছি।

হবু॥ ধাঁধার জবাব দিতে পারলে তাকে বিয়ে করবি—না দিতে পারলে শূলে চড়াবি—বিয়ের এই ফাঁদে ধরা দিতে কোন আহম্মক আসবে বল দেখি? এদিকে তোর এইকাণ্ড। ওদিকে গবু কি ব্যবস্থা করে গেছে দেখ। আজ আমাদের ঘাস খেতে হবে।

জয়ন্তী॥ ঘাস খেতে হবে?

হবু॥ হ্যাঁ—গবুর সব চেয়ে বড় পরিকল্পনা। খাদ্যাভাব আর থাকবে না। সব পাকা ব্যবস্থা। রন্ধনশালাটা একবার দেখে এস। ভাত নয়, ঘাস রান্না হচ্ছে।

জয়ন্তী ॥ তুমি বলছ কি বাবা!

হবু ॥ না, না—গবুর এ পরিকল্পনা খুব জবর। যা বলছে—হক্ কথা। দামী কথা। আমি মত দিয়েছি। যাও তুমি দেখে এস। ঘাস না খেলে আজ আর আমাদের বাঁচবার পথ নেই। তুমি রন্ধনশালায় গিয়ে সব দেখে শুনে এলে তোমাকেও তা স্বীকার করতে হবে মা।

জয়ন্তী ॥ দেখছি।

[জয়ন্তীর প্রস্থান। অন্যদিক হইতে সঙ্গে সঙ্গে গবুর প্রবেশ।]

গবু ॥ রাজকুমারী চলে গেলেন, না? ওঁর কাছে যে আমার একটু দরকার ছিল।

হবু ॥ হ্যাঁ। রন্ধনশালায় গেল। ঘাস খাবার পরিকল্পনা কেমন এগিয়ে চলেছে দেখতে।

গবু ॥ বেশ তো, দেখে আসুন। প্রজা-প্রতিনিধিদের জন্যে আজ যে ভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছে—তার পরিবেশন ভারটা যদি উনি দয়া করে নেন, তবে প্রজারাও কৃতার্থ হত, দেখতেও ভাল হত।

হবু ॥ নাও, রাখো। খাওয়াবে তো ঘাস। রাজকুমারী পরিবেশন করলেও যা—ঘুঁটেকুড়োনী পরিবেশন করলেও তাই।

গবু ॥ না, না, দেখুন না আপনি। (নেপথ্যে তাকাইয়া) এই যে আসুন, আসুন—

[প্রজা-প্রতিনিধি ত্রিশূল, কৃপাণ ও গদাধর, য্যাং, ব্যাং ও চ্যাং পণ্ডিতত্রয় এবং রাজ অমাত্যগণ প্রবেশ করিলেন এবং মহারাজকে অভিবাদন জানাইলেন। গবু সকলকে আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। সকলে আসন গ্রহণ করিলে পর গবু বলিলেন—]

গবু ॥ রাজ্যের আজ পরম দুর্দিন। একদিকে দারুণ খাদ্যাভাব—আর একদিকে আলোর অভাবের ধুয়া ধরে অকারণ বিদ্রোহ। এই উভয় সংকটে এখন আমাদের কর্তব্য কি তার আলোচনার জন্য ত্রিশূল কৃপাণ আর গদাধর—এই তিনজন প্রজা-প্রতিনিধিকে এই ঘরোয়া বৈঠকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। (প্রতি-

নিধিদের প্রতি) ভেবে দেখুন, বিদ্রোহীদের 'আলো চাই—আরো আলো'—আপনারা জানেন এই দাবী নিতান্ত অসার। সূর্য, চন্দ্র, ঝাড়লণ্ঠন—এত সব আলো থাকতেও যারা আলোর অভাব বোধ করেন—তারা হয় উন্মাদ—না হয় শয়তান। কঠোরহস্তে আমরা তাদের দমন করতে কৃতসংকল্প।

ত্রিশূল ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমাদের সত্যিকার অভাব খাদ্যাভাব।

কৃপাণ ॥ দেশে খাদ্যাভাব কেন হচ্ছে—বিদ্রোহীরা সেই আলোই চায়।

গদাধর ॥ বিদ্রোহীদের ধারণা—অন্ধকারে রাজ্যের ভাগ্য নিয়ে ছিনি-মিনি খেলা হচ্ছে।

গবু ॥ ভগবান যে আলো দিয়েছেন—তার চেয়ে বেশী আলো দেবার শক্তি আমাদের নেই। সেই আলোতেই আমরা কাজ করছি—কাজ করব। খাদ্যাভাব আজ সারা দুনিয়ায়—আমরা বরং সমস্যাটির সমাধান করতে উঠে পড়ে লেগেছি।

কৃপাণ ॥ বিদ্রোহীরা বলছে—কয়েকটি লোকের অন্যায় লোভের জন্য চোরা কারবারের সৃষ্টি হয়েছে। খাদ্যাভাবটা তাতেই আরো গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গবু ॥ তা যদি হয়ে থাকে—প্রজাদের প্রশ্রয়েই তা হয়েছে। প্রজারা যদি সকলে একজোট হয়ে বলে—চোরাবাজারে কিনব না—এক নিমেষে চোরাবাজার উঠে যাবে।

হবু ॥ কেউ তা বলবে না। ও আমি দেখেছি। ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়।

গবু ॥ মহারাজ যথার্থই বলেছেন। কবে কোন শুভ মুহূর্তে মানুষের এই দুষ্প্রবৃত্তি দূর হবে—তার অপেক্ষা না করে—আত্মরক্ষার জন্য এখন আমরা কি করতে পারি—সেটাই হলো আজকের বিবেচ্য বিষয়। দুনিয়ার অন্যান্য দেশে এই সমস্যার সমাধানের জন্য কত গবেষণাই না হচ্ছে। আমাদের আজব দেশও পিছিয়ে নেই! আমরাও এই জন্য একটা তদন্ত পরিষদ গঠন করেছি। তার সদস্যত্রয় মাননীয় য়্যাং পণ্ডিত, ব্যাং পণ্ডিত এবং চ্যাং পণ্ডিত—এই ঘরোয়া বৈঠকে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করুন।

য়্যাং ॥ দুনিয়ার সর্বত্র আজ খাদ্যাভাব কেন—সে আলোচনা আমাদের

তদন্তের বিষয় ছিল না। এক্ষণে কি করণীয় সেই বিষয়েই আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছি। আমাদের সুচিন্তিত অভিমত—ঘাসই এ সমস্যার সমাধান।

প্রতিনিধিগণ ॥ (চমকিত হইয়া) ঘাস!

ব্যাং ॥ না, না—ঘাসকে আপনারা যত তুচ্ছ ভাবছেন—ঘাস তত তুচ্ছ নয়।

চ্যাং ॥ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গবেষণা করেই জানা গেছে—ঘাসের জীবনী শক্তি একটা মহীরুহের চেয়েও বেশী।

য়্যাং ॥ মরুভূমি বলুন, নীরস পাষাণগাত্র বলুন—এমন কি পৃথিবীর হিমাঞ্চলেও ঘাস আপন মহিমায় বিরাজিত।

ব্যাং ॥ যে গম, যে যব, যে ধান আজ মানুষ খাচ্ছে—তা ঘাসের বীজের ধারাবাহিক বিবর্তনের ফলেই জন্ম নিয়েছে।

প্রতিনিধিত্রয় ॥ তাই বলে ঘাস খেতে হবে?

য়্যাং ॥ ঘাসই তো খাচ্ছেন। বলেছি তো—গম, যব, ধান—এ সবই ঘাসের রূপান্তর।

ব্যাং ॥ ইতিহাস সাক্ষী আছে—ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসীরা ঘাসের আবাদ থেকেই তৈরী করেছিল গম।

চ্যাং ॥ ভারত-বাসীরা আর চীনারা ঐ ঘাসের আবাদ থেকেই তৈরী করেছে ধান।

য়্যাং ॥ ধান আর গম যখন পাওয়া যাচ্ছে না—তখন ঘাস খেতে দোষ কি?

ব্যাং ॥ না, না, ঘাসকে তুচ্ছ করবেন না। গৃহপালিত পশুরা এই ঘাস খায়। আর তাদের দেওয়া দুধ থেকে আমরা পাই দুধ আর মাখন।

চ্যাং ॥ সুতরাং দেখা যাচ্ছে—দুধ—মাখন—ঘি খেয়ে আমরা যে শক্তি অর্জন করছি—তা সেই ঘাস থেকেই আসছে।

য়্যাং ॥ পাথরের উপরকার দাগ দেখে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন—পৃথিবীতে ঘাস প্রায় দু'কোটি বৎসর ধরে বর্তমান।

ব্যাং ॥ বিজ্ঞানীরা বলেন—আধ সের ঘাস যে পরিমাণ তাপ দিতে পারে—তাতে একজন মানুষ দেড় মাইল পথ চলতে পারে, দু'মিনিট ধরে সিঁড়িতে

ক্রমাগত ওঠানামা করতে পারে, আধঘণ্টা কাঠ চেলাই করতে পারে। আর চাই কি ?

চ্যাং ॥ তুচ্ছ ঘাসের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত থাকে তা পরিমাপ করে বিজ্ঞানীরা বলেছেন—দু'হাজার একশ বিঘা জমির ঘাস সূর্যকিরণ থেকে যে শক্তি আহরণ করে তার পরিমাণ একটা আণবিক বোমার সমান। আর চাই কি ?

য়্যাং ॥ তাই আমরা সুপারিশ করেছি—খাদ্য সঙ্কট মোচনের জন্য ঘাস খাওয়া উচিৎ। ইহা সহজ, সুলভ অথচ পুষ্টিকর।

গবু ॥ আজ তাই আসুন—আমরা দেশে আওয়াজ তুলি—"ঘাস ফলাও—আরো ঘাস ফলাও। ঘাস খাও—আরো ঘাস খাও।"

পণ্ডিতত্রয় ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়।

য়্যাং ॥ ঘাসের বড়া, ঘাসের চপ, ঘাসের চাপাটি, ঘাসের ঝোল, ঘাসের সুক্তো, ঘাস সেদ্ধ, ঘাসের অম্বল—ঘাস নানারূপে আমাদের দেহের পুষ্টিবর্ধন করতে সর্বদাই প্রস্তুত।

গবু ॥ এই খাদ্যসঙ্কটকালে রাজপ্রাসাদে এইসব খাদ্য চালু হয়েছে। আসুন আপনারা—একবার পরীক্ষা করে দেখুন।

হবু ॥ আসুন—আসুন আপনারা, ঘাস খেয়ে যদি আমরা বাঁচবার পথ পাই—তবে আর ভাবনা কি ? এখানে ওখানে এন্তার পড়ে রয়েছে—যত ইচ্ছা খাও—যত খুশি বিলোও। পেটের জন্যই যত মারামারি—যত হানাহানি। তা পেটের ভাবনাই যদি না থাকে—খাও দাও—নৃত্য কর—এস—খাবে এস—

[সকলের ঘাস খাইতে প্রস্থান। প্রাসাদের অপরাংশ হইতে জয়ন্তী আসিয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চাতে ছুটিয়া আসিল তাহার দুই সখী—চম্পা ও রম্ভা।]

চম্পা ॥ একি সখী ! ভোজনশালা থেকে তুমি পালিয়ে এলে যে ?

জয়ন্তী ॥ আমি এখনও এতটা গরু হইনি যে—ঘাস খেতে রাজী হব।

রম্ভা ॥ তাও বটে—আর রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থীদের সমাগম সময়ও হয়েছে, তাও বটে। মিথ্যা বলেছি ?

জয়ন্তী॥ না—মিথ্যা নয়। নির্দিষ্ট সময় এলেই—কি আশায় এখানে ছুটে আসি জানি না।

চম্পা॥ সখী একটা কথা শুনেছি। ভয়ে বলব—কি নির্ভয়ে বলব।

জয়ন্তী॥ আমার কাছে তোর ভয় কি। কি শুনেছিস বল।

চম্পা॥ লোকেরা বলাবলি করছে—তুমি নাকি মানবী নও—মায়াবিনী এক রাক্ষসী।

জয়ন্তী॥ রাক্ষসী!

চম্পা॥ হ্যাঁ, রাক্ষসী। রূপের আগুন জ্বেলে বসে আছ—ধাঁধাঁর উত্তর দিতে পারলেই তার গলায় বরমাল্য দেবে এই ফাঁদ পেতে—মানুষ ধরছ আর খাচ্ছ।

জয়ন্তী॥ যে উত্তর দিতে পারবে না সে কেন আসে? উত্তর দিতে না পারলে যে মৃত্যুদণ্ড—সে তো সকলেরই জানা আছে। কে কাকে আসতে বলেছে। কেউ না এলেই পারে।

চম্পা॥ পতঙ্গের কথা ভাব সখী। জানে আগুনে পুড়ে মরবে তবু আগুন দেখলেই ছুটে গিয়ে সেই আগুনে ঝাঁপ দেয়। তোমার যে সেই রূপের আগুন সখী। লোকে তাই বলে—তুমি মায়াবিনী—রাক্ষসী। সখী এ খেলা এখন বন্ধ কর। যার জন্য তোমার এত আয়োজন, সে হয় তো এদেশে নেই। যদি থাকত—সে কি এতদিনে আসত না? ধাঁধাঁর উত্তর তাঁর জানা আছে, মৃত্যুভয় তাঁর নেই। তবু যখন সে আসছেনা, বুঝতে হবে হয় সে এদেশে নেই, নতুবা—

জয়ন্তী॥ নতুবা—

চম্পা॥ সে তোমার বরমাল্য চায় না।

জয়ন্তী॥ তাই কি!

[এমন সময় সামনের ঘণ্টাটি বাজিয়া উঠিল।]

জয়ন্তী॥ না, না, ঐ তো কে এসেছে।

চম্পা॥ এসেছে—রোজই তো কেউ না কেউ আসছে। কিন্তু সে কি এসেছে?

[জয়ন্তীর সখী শিপ্রা বাহির হইতে ছুটিয়া আসিল।]

শিপ্রা॥ সখী, যে লোকটা ঘণ্টা বাজিয়ে আসছে—চালচলন দেখে মনে হলো—খুব বীর—রাজকুমার টুমার হবে।

জয়ন্তী॥ তাঁকে আর কখনও দেখেছিস?

শিপ্রা॥ না সখী।

জয়ন্তী॥ কি নাম বললেন—কোন দেশ থেকে আসছেন?

শিপ্রা॥ এই দেশেরই অধিবাসী। নাম বললেন ঘণ্টেশ্বর গুপ্ত।

জয়ন্তী॥ ঘণ্টেশ্বর গুপ্ত! হয়তো ছদ্মনাম। দেখতে কেমন? বলিষ্ঠ? সুদর্শন?

রম্ভা॥ সে কথা সখী শিপ্রাকে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। পুরুষ হলেই ওর চোখে বলিষ্ঠ—ওর চোখে সুদর্শন।

জয়ন্তী॥ আমার ধাঁধাঁর উত্তর দিতে না পেরে এত লোকের প্রাণদণ্ড হয়েছে—তা জেনে শুনেও যখন এসেছে—তবে হয়তো, তবে হয়তো—যা তাকে নিয়ে আয়।

[শিপ্রার দ্রুত প্রস্থান। জয়ন্তী সিংহাসনে বসিলেন। চম্পা এবং রম্ভা পাণি-প্রার্থীর অভ্যর্থনার জন্য তাম্বূলকরঙ্কবাহিনীরূপে প্রস্তুত রহিল। ঘণ্টেশ্বর গুপ্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাদ্য বাজিয়া উঠিল। শিপ্রা ঘণ্টেশ্বরকে তাহার নির্দিষ্ট আসনে বসাইল এবং সখীগণ নৃত্যছন্দে তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইল। অভ্যর্থনা শেষ হইল।]

ঘণ্টেশ্বর॥ আ—হা, রাজকুমারীর দেখা পেয়ে জীবন আমার ধন্য হলো। (রাজকুমারীর দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া।) আজ আমার কি সৌভাগ্য—রাজকুমারীর সামনে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছি। আমি যতই দেখছি—ততোই হাঁ হয়ে যাচ্ছি। কি অপরূপ শ্রী—কি উজ্জ্বল রূপলাবণ্য। আ—হ একি স্বপ্ন! একি মায়া! একি মরীচিকা!

জয়ন্তী ॥ চম্পা, আগন্তুককে বল—ধাঁধাঁর জবাব দেবার সময় সমাগত। তিনি যেন বাজে কথায় সময় নষ্ট না করেন।

চম্পা ॥ রাজকুমারীর আদেশ শুনলেন তো মাননীয় ঘণ্টেশ্বর গুপ্ত ?

ঘণ্টেশ্বর ॥ আমার অপরাধ ক্ষমা করুন রাজকুমারী জয়ন্তী। আপনার পাণিস্পর্শে আমার জীবনে নেমে আসবে দুর্লভ স্বর্গ। সেই অশান্ত কামনা নিয়েই আমি ছুটে এসেছি রাজকুমারী—উল্কার মতো।

জয়ন্তী ॥ এ নিয়ে ক'জন হলো শিপ্রা ?

শিপ্রা ॥ এর আগে নয় শত হতভাগ্য—ঘাতকের শাণিত খড়্গে প্রাণ হারিয়েছে, রাজকুমারী।

ঘণ্টেশ্বর ॥ জানি রাজকুমারী, আপনার হেঁয়ালীর জবাব দিতে না পারলে মুহূর্ত মধ্যে এই শির ধূলায় লুটিয়ে পড়বে—তবু—কিন্তু তবু—

চম্পা ॥ (বাধা দিয়া) তবে শুনুন—মাননীয় ঘণ্টেশ্বর গুপ্ত রাজকুমারীর প্রথম ধাঁধাঁ—

"রাতের অন্ধকারে
যে মায়া জাগালো মদির স্বপন
আকুল করিল আমার ভুবন
দিবসের জাগরণে—
নিঠুর আঘাতে সে মরীচিকা আমার
ভেঙ্গে যায়—হায়—
মুছে যায় বারে বারে।"

ঘণ্টেশ্বর ॥ দাঁড়ান—আমি বলছি।

শিপ্রা ॥ আঃ, আগে ধাধাঁগুলো সব শুনুন।

চম্পা ॥ দ্বিতীয় ধাঁধাঁ হলো—"এই পৃথিবীতে কি সে জিনিষ—যা দেহে আনে উত্তাপ—কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে যায় ?"

ঘণ্টেশ্বর ॥ ধীরে, ধীরে দেবী, ধীরে। আমিই কেমন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছি। 'রাতের অন্ধকারে—যে মায়া জাগালো মদির স্বপন, আকুল করিল আমার

ভুবন…' মদির স্বপন নিশ্চয়। আকুলও হয়েছি সাংঘাতিক। কিন্তু কি সে মায়া দেবী ?

চম্পা ॥ সে প্রশ্নের জবাবই তো আপনি দিতে এসেছেন।

ঘণ্টেশ্বর ॥ এসেছিলাম নাকি ! মনে পড়ছে না।

জয়ন্তী ॥ চম্পা, প্রশ্নোত্তরের সময় উত্তীর্ণপ্রায়।

ঘণ্টেশ্বর ॥ দয়া করুন—কৃপা করুন রাজকুমারী। আমি বড় আশা করে এসেছি। এত তাড়া দিলে আমি কেঁদে ফেলব। আমায় দয়া করে ভাবতে দিন—ভাবতে দিন।

জয়ন্তী ॥ ঘাতক—

ঘণ্টেশ্বর ॥ তবে কি জবাব দেবার আগেই আমাকে খতম করে দিতে চান রাজকুমারী ?

জয়ন্তী ॥ আপনি ধাঁধাঁর জবাব দিতে পারেন নি—এবার আপনাকে তার অনিবার্য ফল ভোগ করতেই হবে। ঘাতক—

ঘণ্টেশ্বর ॥ এ্যা ! ঘাতক ! ঘ্যাচাং ! আমায় মারবেননা দেবী—পোষা কুকুরের মতো আমায় আপনার পায়ে পড়ে থাকতে দিন—আ—

[ঘাতকের প্রবেশ। সে কালো আবরণে ঘণ্টেশ্বরের মুখ অতর্কিতে ঢাকিয়া দিল। ঘণ্টেশ্বর আর্তনাদ করিয়া উঠিল।]

চম্পা প্রভৃতি সখীগণ ॥ উঃ !

[সখীগণও অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিল। ঘাতক ঘণ্টেশ্বরকে টানিতে টানিতে লইয়া গেল।]

জয়ন্তী ॥ সকলের আর্তনাদই আমি শুনছি। কিন্তু আমার আর্তনাদ কি কেউ শুনতে পাচ্ছে ? কেউ না—কেউ না।

[জয়ন্তীর প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে সখীদেরও প্রস্থান। প্রাসাদের অপরাংশ হইতে সপারিষদ রাজা, পণ্ডিতত্রয় এবং প্রজা-প্রতিনিধিদের উদ্গার তুলিতে তুলিতে প্রবেশ]

গবু ॥ এখন আপনারা বলুন—ঘাস আমাদের খাদ্যসমস্যা সমাধান করতে পারে কিনা।

কৃপাণ ॥ না—তা—হ্যাঁ…

ত্রিশূল ॥ আঃ—ঘাসের চাপাটিগুলো এখনো মুখে লেগে আছে মহারাজ।

[অন্য সকলে উদ্গার তুলিয়া গবুর উক্তি সমর্থন করিল।]

গদাধর ॥ কেন—ঐ ঘাসের বড়া ? কখনো কেউ খেয়েছ এমন ?

য়্যাং, ব্যাং, চ্যাং ॥ আমরা বলিনি !

য়্যাং ॥ একবার যে খাবে, সে আর জীবনে ভুলতে পারবে না।

অন্যান্য সকলে ॥ তা বটে। তা বটে।

হবু ॥ না গবু, তোমার বুদ্ধি আছে। আমার কেবল ভয় হয় কি জান—বুদ্ধিটা বড় বেশী খরচ করছ। বলি—নাকে মুখে ছিপি এঁটে যতটা পার ধরে রাখ—বুদ্ধির বাজে খরচগুলো কমাও—তা সে কথা শুনছে কে ? খাদ্য সমস্যাটা তা না হয় মেটালে—কিন্তু এর পরেও তো আরো সমস্যা রয়েছে। কি বলেন আপনারা ? এই ধরুন যেমন বস্ত্র সমস্যা। এও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। লোকসংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে—কাপড়ে আর কুলোচ্ছে না। ঠ্যালা সামলাও।

গবু ॥ বস্ত্র-সমস্যার সমাধানও মহারাজ, হয়ে গেছে। আজই মহারাজের সামনে তার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। এটা খুবই সৌভাগ্যের কথা যে—মাননীয় প্রজা-প্রতিনিধিরা, মাননীয় পণ্ডিতরা আজ এখানে উপস্থিত আছেন। প্রতিহারী,—আদমজী। (প্রতিহারীর প্রস্থান।) এই আদমজী, মিশরের একজন বিখ্যাত বস্ত্র ব্যবসায়ী। মহারাজের যশোগৌরব সুদূর মিশর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। তাই আদমজী সুদূর মিশর থেকে এই আজবদেশে এসেছেন—মিশরের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার 'অদৃশ্য-বস্ত্র' উপঢৌকন নিয়ে।

হবু ॥ অদৃশ্য-বস্ত্র ! সেটা আবার কি ?

গবু ॥ মহারাজ বোধহয় ঢাকাই মস্‌লিনের কথা শুনে থাকবেন।

হবু ॥ তা—হ্যাঁ—শুনেছি।

গবু ॥ মসলিন কাপড় এত সূক্ষ্ম ছিল যে—একদা এক বাদশাজাদী সেই

মস্‌লিনের তৈরী শাড়ী পরে যখন তার পিতার সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন—তখন তিনি কন্যার নগ্নতা দেখে লজ্জায় অধোবদন হয়ে তাকে ভৎর্সনা করেন। বাদশাজাদী তখন—তার পিতার ভুল ভেঙ্গে দেন। দেখিয়ে দেন—তিনি মস্‌লিন পরিহিতা—বিবসনা নন। আদমজীর এই অদৃশ্য বস্ত্র সেই মসলিনকেও হার মানিয়েছে। হ্যাঁ, আমি দেখেছি বলেই বলছি। এইবার আপনারা দেখুন। (আদমজীর প্রবেশ!) আসুন—আসুন আদমজী।

আদমজী ॥ (অভিবাদন করিয়া) মহারাজের জয় হোক।

হবু ॥ আমি ভেবেছিলাম লোকটা বুঝি ন্যাংটো। দেখছি তা নয়। বল গবু—আমার হয়ে কিছু বল।

গবু ॥ আপনার মত বিখ্যাত ব্যবসায়ীর দেখা পেয়ে মহারাজ অতীব প্রীত হয়েছেন। আদমজী, আপনার অদ্ভুত আবিষ্কার অদৃশ্য বস্ত্রের কথা শুনে মহারাজ ততোধিক বিস্মিত হয়েছেন।

আদমজী ॥ মহারাজের সৌজন্যে আমি মুগ্ধ। কিন্তু অদৃশ্য বস্ত্র আমার আবিষ্কার নয়। মিশরের 'মমি'র মতই অদৃশ্য বস্ত্র আমাদের পূর্ব পুরুষদের শিল্প-চাতুর্যের এক অত্যাশ্চর্য নিদর্শন। আজ থেকে দু' হাজার বৎসর পূর্বে সারা প্রাচ্যভূখণ্ডে বিলাসী ধনীদের ঘরে ঘরে এই অদৃশ্য বস্ত্রের প্রচলন ছিল।

য়্যাং ॥ তা বটে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে একথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে মহারাজ। আমি পড়েছি।

ব্যাং ॥ এখন মনে পড়ছে—বিশ্ব-শিল্পকোষে একথাও লিপিবদ্ধ আছে যে—এমন একদিন ছিল যখন অদৃশ্য বস্ত্রে বিভূষিত না হলে সুন্দরীদের অঙ্গসজ্জা সম্পূর্ণ হতো না।

চ্যাং ॥ না, হোতনা। রোমে, গ্রীসে, ফরাসীদেশে, প্রাচ্যপাশ্চাত্যের সৌখীন সমাজের সর্বত্র এই অপূর্ব বস্ত্রের অসম্ভব সমাদর ছিল মহারাজ।

গবু ॥ আমাদের গুণগ্রাহী রাজা এমন আশ্চর্য জিনিষের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনতে চান, আদমজী।

আদমজী ॥ জানি। মণিমুক্তার আদর যেমন জহুরীর কাছে, এই লুপ্তপ্রায়

অপূর্ব কারুকার্যের নিদর্শন 'অদৃশ্য-বস্ত্র'ও আপনার কাছে তার যোগ্য মর্যাদাই পাবে মহারাজ।

গবু॥ আপনার অদৃশ্য বস্ত্রপেটিকার আবরণ উন্মোচন করুন আদমজী।

আদমজী॥ সত্যিকার গুণী না হলে এমন অত্যাশ্চর্য বস্ত্রের মর্ম কেউ বুঝতে পারে না। অদৃশ্য বস্ত্র আসলে বস্ত্রই মহারাজ—তবে তা এত সূক্ষ্ম যে চোখে দেখা যায় না—এত মসৃণ যে পরিধান করলে তার স্পর্শ পর্যন্ত অনুভব করা যায়না। (পেটিকা খুলিয়া বস্ত্র বাহির করিবার ভঙ্গী করিয়া) এই যে মহারাজ, এই সেই অত্যাশ্চর্য—অপূর্ব অদৃশ্য বস্ত্র।

[আদমজী বস্ত্রপেটিকা উন্মোচিত করিলেন এবং নানা ভঙ্গীতে কাপড় বিস্তারের ভান করিলেন। মহারাজ কাপড় দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না।]

আদমজী॥ মহারাজ দেখছেন তো ?

হবু॥ ঠিক দেখতে পাচ্ছি না—তা নয়—তবে—তবে—কাপড়টা—ঠিক কোথায়······

কৃপাণ॥ কাপড়টা ঠিক কোথায় তুমি দেখতে পাচ্ছ—ত্রিশূল ?

ত্রিশূল॥ না—তা—হ্যাঁ—তুমি গদাধর—দেখছ তো ?

গদাধর॥ কাপড় ? হ্যাঁ—তা—না—হ্যাঁ—

আদমজী॥ আপনারা ব্যস্ত হবেন না। ভাল করে লক্ষ্য করুন। এই যে মহারাজ—এই যে—এই দেখুন—অগ্নিপাটের শাড়ী···(রাজা উহা স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিবামাত্র) না—না স্পর্শ করবেন না, মহারাজ। একবার যদি এর সূক্ষ্ম বোনার ঢেউ খেলানো আঁচলের পাট ভেঙে যায়—তবে মহারাজ এত পরিশ্রম, এত কলা-কৌশল—সব গেল। আপনি গুণগ্রাহী—আপনি নিশ্চয়ই তা বুঝছেন মহারাজ।

গবু॥ তা বটেই তো! তা বটেই তো!

আদমজী॥ এই দেখুন মহারাজ, এই অভিনব শাড়ীর পাড়ে ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বৈচিত্র। পৃথিবীর কোন তন্তুবায় কাপড়ের ওপর এমন বর্ণসুষমা সৃষ্টি

করতে সক্ষম হয়নি। মহারাজ কি দেখতে পাচ্ছেন না? আর একটু এগিয়ে এসে—মাথা নীচু করে দেখুন মহারাজ। আপনারাও দেখছেন তো?

ত্রিশূল ॥ চমৎকার—চমৎকার।

গবু ॥ অপূর্ব, অপূর্ব। ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। আর মানুষের চরম সৃষ্টি এই অদৃশ্য বস্ত্র—একথা আমাদের মানতেই হবে মহারাজ।

হবু ॥ (প্রজা-প্রতিনিধিদিগকে) আপনারা কি বলেন?

কৃপাণ ॥ মহামন্ত্রী সত্যই বলেছেন এই আশ্চর্য আবিষ্কারের অদ্ভুত নৈপুণ্য আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

গদাধর ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়।

হবু ॥ আমি সাদা চোখে অদৃশ্য বস্ত্র ঠিক দেখতে না পেলেও—আমি অনুভব করছি আদমজী—বয়ন-শিল্পের এ চরম নিদর্শন। এই যেমন নিরাকার ব্রহ্ম, অথবা ধর ভূত, দেখিনি—কিন্তু মানি।

আদমজী ॥ এই যে মহারাজ অগ্নিপাট শাড়ীর ইন্দ্রধনু পাড়ের মাঝে মহামূল্য জরির কাজ—যেন নক্ষত্র খচিত আকাশের বুক থেকে ঠিকরে পড়ছে আলোর জ্যোতি। প্রকৃত গুণীর চোখে ধরা না পড়ে পারে না মহারাজ।

হবু ॥ ঠিক—ঠিক। আমি এবার ঠিক দেখতে পাচ্ছি। অপূর্ব! অপূর্ব! আপনারাও দেখছেন নিশ্চয়।

সকলে ॥ তা—হ্যাঁ…

আদমজী ॥ ধন্য আমি। আজ আমার শ্রম সার্থক হল মহারাজ।

গবু ॥ অদৃশ্য বস্ত্রের জন্য কত মূল্য পেলে আপনি খুশি হবেন আদমজী?

আদমজী ॥ এক একটি শাড়ীর দাম সহস্র মোহর। কিন্তু আমি মহারাজের মনোরঞ্জন করতে পেরেছি—এই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

গবু ॥ মহারাজ, রাজ্যে বস্ত্রসঙ্কট দিনদিনই তীব্রতর হচ্ছে। এই জরুরী পরিস্থিতিতে অদৃশ্য বস্ত্র প্রস্তুতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করে বস্ত্রসমস্যা সমাধানের ভার আদমজীর উপরই অর্পণ করুন। তিনিও তাঁর প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাবেন—দেশের লোকেরও বস্ত্রাভাব ঘুচবে।

হবু॥ মারহাব্বা! খুব ভাল প্রস্তাব। কিন্তু দামটা একটু বেশী নয় কি গবু? সকলে কি কিনতে পারবে?

আদমজী॥ মহারাজের অর্থানুকূল্যে কারখানা প্রতিষ্ঠিত হলে—খুব সস্তায় আমরা অদৃশ্য বস্ত্র সরবরাহ করতে পারব মহারাজ।

হবু॥ বলেন কি আদমজী?

আদমজী॥ হ্যাঁ মহারাজ। চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খুবই সস্তায় কাপড় জোগান দেওয়া সম্ভবপর হবে।

হবু॥ আপনি দেখছি দেবদূত—আমাকে মহাবিপদ থেকে বাঁচালেন আদমজী। দেশের লোক কাপড়ের অভাবে ন্যাংটো হতে চাইছে—অথচ ব্যবসায়ীরা বেশী লাভের আশায় বাজারে কাপড় একদম ছাড়তে চাইছে না। এ সময় আপনার কারখানাটাই দেখছি আমাদের বস্ত্রাভাব থেকে বাঁচাবে।

গবু॥ অদৃশ্য বস্ত্র চালু করাই তীব্র বস্ত্র দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় মহারাজ।

হবু॥ (গবুকে) তা নয় তো কি। তুমি কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য রাজকোষ থেকে এক কোটী মোহর দেবার ব্যবস্থা কর গবু।

আদমজী॥ মহারাজের জয় হোক।

হবু॥ যাক—তাহলে দেশে খাদ্যবস্ত্রের অভাব আর থাকবেনা—কি বল গবু। বাঁচা গেল। এখন তবে প্রজারা সুখে থাকবে, খেয়ে দেয়ে নেত্য করবে। আর চাই কি?

সকলে॥ জয় মহারাজ হবুচন্দ্রের জয়।

[কিন্তু সেই মুহূর্তে এই জয়ধ্বনিকে ছাপাইয়া নেপথ্যে আওয়াজ উঠিল "আলো চাই—আরো আলো।"]

হবু॥ নাও, হ'লতো। না, দেখছি—এরা আর শান্তিতে থাকতে দেবে না। খাওয়া পরার এত বড় একটা ব্যবস্থা হচ্ছে—তাতেও খুশী নয়। বলেকিনা—"আলো চাই—আরো আলো।"

গবু॥ বুঝছেন না মহারাজ, ওরা আগুণ জালতে চায়—বিদ্রোহের আগুণ। এ আলো চাওয়ার মানে বিদ্রোহের আগুণ জালো।

হবু॥ ঠিক, ঠিক বলেছ গবু।

গবু॥ আজব দেশে রাজদ্রোহীর একমাত্র শাস্তি—প্রাণদণ্ড। ঐ বিদ্রোহীদের নেতা কিষণচাঁদ। মহারাজ, আপনি এখনি তার প্রাণদণ্ড ঘোষণা করুন।

হবু॥ তথাস্তু। তথাস্তু। শয়তানটাকে ধরে শূলে চড়াও। একদিনে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

গবু॥ জয়—মহারাজ হবুচন্দ্রের জয়।

সকলে॥ জয়—মহারাজ হবুচন্দ্রের জয়।

[সকলের প্রস্থান। ইহার পরেই এখানকার ঘণ্টাটি আবার বাজিতে লাগিল। সখী পরিবৃতা রাজকুমারী জয়ন্তী ছুটিয়া আসিলেন।]

জয়ন্তী॥ দেখতো রম্ভা, এমন অসময়ে কোন হতভাগা জীবন দিতে এলো আবার?

[রম্ভার প্রস্থান।]

চম্পা॥ মানুষের জীবন নিয়ে তোমার এই খেলা শেষ করো, শেষ করো সখী।

জয়ন্তী॥ এ খেলা শেষ করতে পারে—শুধু সে। আমি নই—আমি নই।

[পাণিপ্রার্থী ছদ্মবেশধারী কিষণচাঁদকে লইয়া রম্ভার প্রবেশ।]

জয়ন্তী॥ কে ইনি? (কিষণচাঁদ জয়ন্তীর সম্মুখে আসিয়া মুখাবরণ উন্মোচন করিল।) একি! তুমি! তুমি!

[যবনিকা দ্রুত নামিল।]

চতুর্থ অঙ্ক

রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ পূর্ববর্ণিত চত্বর। পারিষদসহ রাজা সিংহাসনে সমাসীন। সখীগণসহ জয়ন্তী এবং পাণিপ্রার্থী ছদ্মবেশী কিষণচাঁদ। পাণিপ্রার্থী সাফল্যের সঙ্গে দুইটি ধাঁধাঁর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। যবনিকা উত্তোলনের পূর্বে মুহুর্মুহু করতালি ধ্বনি তাহা সূচনা করিতেছে। সমাগত সভাসদবৃন্দের হর্ষধ্বনির মধ্যে যবনিকা উঠিতেছে।

সভাসদবৃন্দ ॥ সাধু, সাধু।

হবু ॥ না—না—আপনারা থামুন। ব্যাপারটা তো সোজা নয়। একটা উত্তরের ওপর লোকটার মাথা থাকা না থাকা নির্ভর করছে। উঃ, কী ভয়ানক পরীক্ষা। কিন্তু বাহাদুর ছেলে বটে।

য্যাং ॥ বাহাদুর বলতে বাহাদুর! কেমন চটপট দু দুটো ধাঁধাঁর উত্তর দিয়ে দিল।

ব্যাং ॥ না—লোকটার মুরোদ আছে বটে। অমন সব জবড়জং ধাঁধাঁ —শুনলেই মাথা ঘোরে। কিন্তু লোকটার উত্তর দেওয়া দেখে—আমার মনে হচ্ছিল—ও যেন টপাটপ রসগোল্লা গিলছে।

হবু ॥ জয় বাবা বুড়োশিব। মেয়েটার বিয়ের জন্য ছিল আমার ভাবনা। এবার তুমি তার একটা গতি কর বাবা। নাও মা জয়ন্তী—তোমার তৃতীয় ধাঁধাঁটা ওকে জিজ্ঞেস কর। আমার আর তর সইছে না।

জয়ন্তী ॥ আমি জানতাম বাবা—কেউ না কেউ—আমার প্রথম আর দ্বিতীয় ধাঁধাঁর জবাব দিতে পারবে। কারণ এদু'টি ধাঁধাঁ—মানুষের বুদ্ধির বাইরে নয়। কিন্তু এইবার আমি আমার শেষ ধাঁধাঁটি জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ—আমার শেষ ও চরম ধাঁধাঁ—

হবু॥ ও বাবা! তবে না জানি—সে কি! দোহাই বাবা বুড়োশিব, একটু দেখ বাবা।

জয়ন্তী॥ (কপট গাম্ভীর্যের সহিত) দুঃসাহসী পাণিপ্রার্থী, আপনার আকাশচুম্বী উচ্চাভিলাষকে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু বলতে পারেন আপনি, "পৃথিবীতে এমন কোনো হিমশীতল প্রস্তরখণ্ডের সন্ধান কেউ জানে কি—যার স্পর্শে মুহূর্তে জ্বলে ওঠে আগুণ?"

[সভায় গভীর নিস্তব্ধতা।]

হবু॥ ঠাণ্ডা পাথর থেকে জ্বলবে আগুণ। এ আবার কি রকম ধাঁধারে বাবা! দোহাই বাবা বুড়োশিব—দোহাই বাবা বুড়োশিব।

চম্পা॥ উত্তর দিন মাননীয় পরীক্ষার্থী। সময় উত্তীর্ণপ্রায়।

কিষণচাঁদ॥ (আবেগ জড়িতকণ্ঠে) রাজকুমারী জয়ন্তী। (হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গীতে রাজকুমারীর সন্নিহিত হইয়া) আপনি—আপনি রাজকুমারী, আপনি সেই হিমশীতল পাথর—যার স্পর্শে আমার মত কঠোর মানুষের মনেও জ্বলে উঠেছে প্রেমের আগুণ।

[জয়ন্তী লজ্জায় নীরব রহিল।]

হবু॥ এ আবার কি উত্তর হলরে বাবা!

ম্যাং॥ না—বেচারীর দেখছি তীরে এসে তরি ডুবলো।

ব্যাং॥ এই বুঝি ঘাতকের ডাক পড়লো।

চ্যাং॥ এইবার তবে ঘ্যাচাং—

হবু॥ কি মা—তুমি চুপ করে আছ যে?

জয়ন্তী॥ (কিষণচাঁদকে) আপনি জয়লাভ করেছেন।

[জয়ন্তী তাহার বরমাল্যটি কিষণচাঁদের গলায় পরাইয়া দিল। সকলে হর্ষধ্বনি, করতালি এবং সাধুবাদ করিতে লাগিল।]

হবু॥ মারহাব্বা। জয় বাবা বুড়োশিব—তোমারই দয়ায় মনস্কামনা আমার পূর্ণ হলো। মেয়ের বরলাভ হলো। হবুরাজার বংশ নির্বংশ হতে চলছিল। আজ আবার তা রক্ষা পাবার উপায় হলো। মাননীয় সভাসদগণ—ধাঁধার

পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ প্রার্থির গলায় বরমাল্য দিয়ে রাজকুমারী আজ তাঁর পণরক্ষা করেছেন। রাজ্যের আজ পরম শুভ দিন—আজ আমার বড় আনন্দের দিন। ওরে কোথায় তোরা—শাঁখ বাজা—উলুধ্বনি কর। ওরে কে আছিস—তোরা কেউ গিয়ে আমার গবুকে এ খবর দে।

[সঙ্গে সঙ্গে মাঙ্গলিক ধ্বনি ও নৃত্যপর সখীদের আগমন। নাচগানের উজ্জ্বল দৃশ্য। নাচ শেষে সখীদের জয়ন্তী ও কিষণচাঁদসহ প্রস্থান। অপরদিক হইতে গবুর প্রবেশ।]

হবু॥ এই যে মহামন্ত্রী, মারহাব্বা! শুনেছ তো? এবার বিয়ের আয়োজন কর। ওরে—তোরা মেয়ে জামাইকে ডেকে দেখা।

গবু॥ মহারাজ! আমি সব খবরই পেয়েছি। কিন্তু সুপ্রাচীন এই রাজবংশের প্রথানুযায়ী এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, মহারাজ। অজ্ঞাতকুলশীল এক যুবক—যার কোন বংশ পরিচয় জানা নেই—তাকে রাজকুমারী স্বামীরূপে গ্রহণ করতে পারেন না—যদি করেন—প্রজাবৃন্দ এ বিবাহে যোগদান করবে না—এমন কি এ বিবাহে বাধা দিতেও পরাঙ্মুখ হবে না।

হবু॥ নাও ঠ্যালা। ভাবি এক—হয় আর। মেয়ের বাপ হওয়া যে কি ঝামেলা—এবার আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।

[ছদ্মবেশী কিষণচাঁদের প্রবেশ।]

কিষণচাঁদ॥ মহারাজ কি আমায় স্মরণ করেছেন?

হবু॥ তুমি তো বাবা আমার মেয়ের সব ধাঁধাঁগুলোর টপাটপ জবাব দিয়েই খালাস। এখন নাও—গবুচন্দ্রের ধাঁধাঁর উত্তর দাও।

গবু॥ রাজপরিবারের বিবাহে কতকগুলো প্রথা এবং আচরণ অবশ্য পালনীয়। মহামন্ত্রী হিসেবে নয়—রাজ্যের দীনতম প্রজারও যা জানবার অধিকার আছে—সেই দাবীতেই আমি জিজ্ঞেস করছি—কি আপনার পিতৃকুল পরিচয়—কি আপনার বংশমর্যাদা?

কিষণচাঁদ॥ (হাসিয়া) আমি এই অভিশপ্ত রাজ্যেরই এক অতি সাধারণ প্রজা। আমি সেই বংশেই জন্মেছি—যারা সবার পিছনে থেকে, সবার নীচে

দাঁড়িয়ে—কুশিক্ষা, দারিদ্র আর অর্ধাশনে তিল তিল করে মরণের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে—যাদের শোষণ করে রাজ্যের মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীরা ক্রমশঃ ফেঁপে উঠেছে। আমি এই দেশেরই সেই নিপীড়িত প্রজাদের একজন মহারাজ। চাটুকার আর চক্রান্তবাজদের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে যাদের অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনী মহারাজের কাছে পৌঁছতে পারে না—আমি সেই শোষিত প্রজাকুলেরই একজন মহারাজ।

হবু॥ কথাগুলো বেশ। কিন্তু বোঝাতো গেল না গবু।

[সেনানায়ক বিক্রমজিতের প্রবেশ ও রাজা এবং মন্ত্রীকে অভিবাদন।]

হবু॥ কি সংবাদ বিক্রমজিৎ? বিদ্রোহী কিষণচাঁদ বন্দী?

বিক্রমজিৎ॥ গুপ্তচর সংবাদ দিচ্ছে কিষণচাঁদ ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছে।

হবু॥ একেবারে রাজপ্রাসাদে বিদ্রোহী কিষণচাঁদ! আর তুমি সেনানায়ক হয়ে এখনও এখানে দাঁড়িয়ে বিক্রমজিৎ! যাও—তাকে বন্দী কর। (বিক্রমজিৎ প্রস্থানোদ্যত) দাঁড়াও, আমার জামাতাকে অভিবাদন করে যাও।

[বিক্রমজিৎ ছদ্মবেশী কিষণচাঁদকে তীব্রভাবে অবলোকন করিয়া—]

বিক্রমজিৎ॥ মহারাজ, আমার একটা নিবেদন আছে।

হবু॥ বল।

বিক্রমজিৎ॥ নির্ভয়ে বলব মহারাজ?

হবু॥ তা নয় তো কি!

বিক্রম॥ এই সেই বিদ্রোহী কিষণচাঁদ—ছদ্মবেশে আপনাদের এতক্ষণ প্রতারিত করেছে।

[বিক্রমজিৎ সজোরে কিষণচাঁদের উষ্ণীষ আকর্ষণ করিল।]

হবু॥ এ্যাঁ—তুমি কিষণচাঁদ?

গবু॥ কিষণচাঁদ! রাজবিদ্রোহী কিষণচাঁদ!

কিষণচাঁদ॥ আমি সগৌরবে সে পরিচয় স্বীকার করছি মহারাজ।

গবু॥ (উচ্চকণ্ঠে) মহারাজ—বিদ্রোহীর শাস্তি ঘোষিত হয়েছে—প্রাণদণ্ড।

হবু॥ তাতো হয়েছেই।

গবু॥ তুমি প্রাসাদদ্বার রক্ষা কর বিক্রমজিৎ—যাতে ক্ষুব্ধ জনতা তাদের নেতার প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে সাহস না পায়। (অভিবাদন করিয়া বিক্রমজিতের প্রস্থান।) আপনি স্বয়ং বিদ্রোহী কিষণচাঁদের প্রাণদণ্ড বিধান করে ঘোষণা প্রচার করেছিলেন মহারাজ। এখন কর্তব্যে অবহেলা করলে রাজার ন্যায়বিচারে প্রজাদের বিশ্বাস স্খলিত হবে।

হবু॥ তাতো বটেই—তাতো বটেই। (কিষণচাঁদকে) চারদিকে এত আলো—তাতেও তোমার মন উঠছিল না। আলো চাই—আলো চাই বলে চেঁচাচ্ছিলে। এখন যে চিরতরে চোখ বুজে অন্ধকারে খাবি খেতে হবে বাপধন আমি কি করি বল? আরে বাপু তুমি তো চোখ বুজেই খালাস। কিন্তু আমার মেয়েটা? কিছু যে করব—তারও তো উপায় নেই। রাজা আমি—কিন্তু নামেই রাজা। হাত-পা যে আমার আইনের বেড়াজালে বাঁধা।

গবু॥ মহারাজের জয় হোক। রক্ষীগণ—(রক্ষীগণ অগ্রসর হইল।) বন্দীকর। কাল প্রভাতে এর প্রাণদণ্ড।

[জয়ন্তীর প্রবেশ।]

জয়ন্তী॥ বাবা।

হবু॥ এই যে মা—জয়ন্তী। আরে এ লোকটা বিদ্রোহী কিষণচাঁদ। ফাঁসির আসামী। তুই যে মড়ার গলায় মালা দিয়েছিস্ মা—মড়ার গলায় মালা দিয়েছিস্।

গবু॥ আমরা আশা করব—রাজকুমারী তাঁর সদ্যলব্ধ স্বামীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে রাজার কর্তব্য পালনে বাধা দেবেন না।

জয়ন্তী॥ মহামন্ত্রী, রাজদ্রোহীকে শাস্তিদান সম্পর্কে আমার আগ্রহ আপনাদের কারো চেয়ে কম নয়। কিন্তু আজ আমি পরাজিতা। যিনি আমাকে জয় করেছেন—তাঁর আদর্শই আজ থেকে আমার আদর্শ।

গবু॥ আপনি দণ্ডাজ্ঞা কার্যে পরিণত করবার আদেশ দিন মহারাজ।

জয়ন্তী॥ মানুষ যখন সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাস করে, তখন সে নিজেকেই

সব চেয়ে শক্তিমান আর বুদ্ধিমান বলে মনে করে। কুসংস্কার আর অজ্ঞতাকেই সে সব চেয়ে বড় সত্য বলে মেনে নেয়। কিন্তু অন্ধকার পুরীর অর্গল মুক্ত করে—আজ যিনি আলোর মশাল হাতে নিয়ে প্রবেশ করেছেন—তাঁকে অকুণ্ঠিত চিত্তে বরণ করে নেওয়াই আমাদের একমাত্র কর্তব্য পিতা।

কিষণচাঁদ ॥ মৃত্যুকে আর আমি ভয় করিনা মহারাজ। আমার মশাল জয়ন্তী হাতে তুলে নিয়েছে। কিন্তু মরবার আগে আমার একটা অভিযোগ আছে মহারাজ।

গবু ॥ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি আইনের চোখে মৃত। তার কোন বক্তব্য শুনতে আমরা বাধ্য নই মহারাজ।

কিষণচাঁদ ॥ কিন্তু আজবদেশেও এমন একদিন আসে যখন মৃতের কণ্ঠেও কথা ফোটে। আজ আমাদের সেইদিন মহারাজ।

গবু ॥ (প্রতিবাদে) মহারাজ।

হবু ॥ না, না তুমি বল কিষণচাঁদ। ফাঁসির আগে ফাঁসির আসামী কী খেতে চায়, কি বলতে চায় আজবদেশে এসব শোনার রীতি আছে। তুমি কি বলবে বল কিষণচাঁদ।

কিষণচাঁদ ॥ মহারাজের জয় হোক। 'আলো চাই—আরো আলো'—এই ছিল আমাদের দাবী। একে বলা হয়েছে বিদ্রোহ—কিন্তু ভেবে দেখুন মহারাজ—দেশে আজ কি নিদারুণ অন্ধকার। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, আর কুসংস্কার—এ তিন অন্ধকারে দেশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে কে? তারা—যারা জনসাধারণকে শোষণ করতে চায়—অবাধে, নির্বিবাদে। দেশে মূঢ়, ম্লান, মূক লোকের সংখ্যা যত বেশী থাকে—ততই তাদের শোষণের সুবিধা হয়। ভূতের মুখে রাম নামের মত তারাও বলেন—শিক্ষা চাই। কত সব পরিকল্পনার কথা আমরা শুনি। কিন্তু কি দেখি? যারা শেখাবে তাদের পেটে ভাত নেই। ভিটেমাটি বিক্রী করে যারাও যা কিছু শিখল—তাদের সে শিক্ষা কাজে লাগাবার সেরকম কোন ব্যবস্থা নেই। দেশের আজ এই যে অবস্থা এতে সুবিধা হয়েছে কার? ঐ

গবুচন্দ্র দাসের। শুধু গবুচন্দ্র দাস নয়—গবুচন্দ্র-গোষ্ঠীর। শুধু তাদেরও নয়—তাদের যারা স্বজন তাদেরও।

গবু॥ মহারাজ, বিদ্রোহীর এই প্রলাপ অসহ্য।

হবু॥ মরবার আগেই লোক প্রলাপ বকে—তুমিও একদিন বকবে গবু। না, না, তুমি বল কিষণচাঁদ। মনে হচ্ছে নতুন কথা শুনছি। শুনতে বেশ লাগছে।

কিষণচাঁদ॥ দেশে আজ আলো নেই বলেই—যেমন তেমন চাকরিতে ঘি-ভাত হয়। রুগ্ন বেড়ালের জন্য দৈনিক একমণ দুধ বরাদ্দ হলেও সে এক ফোঁটা দুধ খেতে না পেয়ে অক্কা পায়।

গবু॥ স্তব্ধ হও যুবক। মহারাজ, এই সব প্রলাপোক্তি আপনিই সহ্য করতে পারেন—কিন্তু আমরা পারব না।

কিষণচাঁদ॥ আমি তা জানি। কিন্তু আমি তাতে ভয় পাব না। মরার বাড়া গাল নেই। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বলেই আজ আমার দুর্জয় সাহস। মহারাজ, এদের সর্বশেষ কীর্তি অদৃশ্য বস্ত্র। মিশরীয় তন্তুবায়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রাজকোষ লুণ্ঠনের এ এক অভিনব ফন্দী মহারাজ। গোটা দেশকে বিবস্ত্র করে অর্থ সঞ্চয় করতেও এই পাপিষ্ঠ মন্ত্রীর বিবেকে বাধেনি।

গবু॥ স্তব্ধ হও অর্বাচীন যুবক। মহারাজ, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার করতে হয় পরে করবেন। আগে রাজদ্রোহীর ঘোষিত দণ্ড বিধান করুন। আমি সমগ্র দেশের পক্ষ থেকে মহারাজের কাছে এই দাবী পেশ করছি।

হবু॥ তাই তো গবু, রাজা হওয়া কী ঝকমারী···একি ঝামেলা।

কিষণচাঁদ॥ মহারাজ, সানন্দে আমি আপনার ঘোষিত দণ্ড বরণ করছি। (জয়ন্তীকে) জয়ন্তী তুমি জানবে—এ আমার দণ্ড নয়—মৃত্যু নয়—এ আমার নবজন্ম। আমি বেঁচে থাকব—তোমার মধ্যে। কোথায় ঘাতক, আমায় নিয়ে চল।

[গবু বিক্রমজিতকে ইঙ্গিত করিবামাত্র বিক্রমজিতের প্রস্থান।]

হবু॥ তাই তো—সব গোলমাল হয়ে গেল। একি—জয়ন্তী—তুই কাঁদছিস? আমি রাজা—আমি রাজা···

[কতিপয় সেনানীসহ বিক্রমজিৎ প্রবেশ করিয়া কিষণচাঁদকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল।]

হবু॥ দাঁড়াও—ওকে ফিরিয়ে আন। রাজাজ্ঞায়—আমার আজ্ঞায় ওর প্রাণদণ্ড হচ্ছে। কিন্তু যদি আমি রাজদণ্ড ত্যাগ করি? আমার আজ্ঞা আর রাজাজ্ঞা নয়। ওর দণ্ড—প্রাণদণ্ড নয়। মহামন্ত্রী, সভাসদবৃন্দ,—আজ থেকে ইনি রাজা—(কিষণচাঁদের মাথায় রাজমুকুট পরাইয়া দিয়া) আর (জয়ন্তীকে দেখাইয়া) ইনি রাণী, আমি এদের দীনতম প্রজা।

সকলে॥ জয়—মহারাজ কিষণচাঁদের জয়।

[সকলের অজ্ঞাতে গবুচন্দ্রের প্রস্থান]

জয়ন্তী॥ (কিষণচাঁদকে) আজবদেশে এলে তুমি আলোর রাজা। আলো দাও, আলো দাও—আরো আলো। অন্ধকার থেকে আমাদের আলোতে নিয়ে যাও।

সকলে॥ জয় মহারাজ কিষণচাঁদের জয়।

জয়ন্তী॥ মহামন্ত্রীকে তো দেখতে পাচ্ছিনা। তিনি কি নতুন রাজার কাছে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবেন না?

[প্রতিহারির প্রবেশ।]

প্রতিহারী॥ মহামন্ত্রী মিশরীয় তন্তুবায়কে সঙ্গে নিয়ে এইমাত্র অশ্বারোহণে পলায়ন করলেন।

হবু॥ অদৃশ্য বস্ত্রের মত মহামন্ত্রীও কি অদৃশ্য হলেন?

জয়ন্তী॥ (হাসিয়া) তাকে যেতেই হবে বাবা—অদৃশ্য হতেই হবে। আলো এলে অন্ধকার আর থাকে না। শুধু আজব দেশে নয়—কোন দেশেই না। তাই আলো চাই—আরো আলো।

সকলে॥ আলো চাই—আরো আলো।

॥ যবনিকা ॥

এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'ধর্মঘট' নাটক সম্পর্কে একটি অভিমত

"বেশ কিছুদিন আগের কথা। হঠাৎ বঙ্গশ্রী মাসিক পত্রে এক সংখ্যায় লক্ষ্য করলাম মন্মথ রায়ের 'ধর্মঘট' নামে একটি নাটক প্রকাশিত হ'তে সুরু করেছে। প্রায় বারো-চৌদ্দ বছরের নীরবতার পরে 'কারাগার' ও 'মীর কাশিমে'র নাট্যকারের লেখনী-প্রসূত নাটক স্বভাবতই মনে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছিল।...

তারপর বছর ঘুরে গেছে। হঠাৎ সেদিন আমন্ত্রণ এল ট্রাম শ্রমিকদের কাছ থেকে তাঁদের নতুন নাট্যাভিনয় দেখবার জন্যে। নাটক: মন্মথ রায়ের 'ধর্মঘট'। প্রযোজনা: কলিকাতা ট্রাম শ্রমিক প্রগতি সংঘ। পরিচালনা: অমর গাঙ্গুলী। শিল্পনির্দেশ: শম্ভু মিত্র।

মনে সংশয় ছিল। কারণ বাংলার বয়োজ্যেষ্ঠ নাট্যকাররা বিদেশীরাজের আমলে সক্রিয়ভাবে তাঁদের রচনায় দেশাত্মবোধ জাগ্রত করলেও জাতীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এবং ভাবী সমাজ গঠনে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব কেউ মেনে নিতে পারেননি। তাই বহু গণ-আন্দোলন তাঁদের ব্যক্তিগত সহানুভূতি লাভ করলেও রচনা তাঁদের একান্ত নিঃসঙ্গতার বেড়াজাল নির্মাণ করে রয়েছে। ভারতের শ্রমিক শ্রেণী তাঁদের রচনায় স্থান পায়নি। তাই সেই বয়োজ্যেষ্ঠদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণীর এই আগুয়ান পদক্ষেপ একাধারে আনন্দ ও সংশয় জাগিয়েছিল।

কিন্তু অভিনয় সমাপ্তিতে সব সংশয় দূরীভূত হ'ল। শুধু প্রশস্তি উচ্চারণ করা ছাড়া আর কিছু বলার রইল না।

হিন্দু-মুসলমান শ্রমিকের রক্তে ফেঁপে ওঠা ছাতার কারখানার মালিক দীনবন্ধু চৌধুরীর নানা অছিলায় শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ধর্মঘট কি ভাবে মালিকের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে ভেঙ্গে যেতে বসেছিল তারই কাহিনী নাটকটির বিষয়বস্তু। শ্রমিক-

শ্রেণী সেই চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে ধর্মঘটে অবতীর্ণ হল—নাটকের এই হল পরিসমাপ্তি।

চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকারের কোথাও দ্বিধা নেই। মালিক দীনবন্ধু, শ্রমিক জনার্দন-ইব্রাহিম, দালাল হারাণ—প্রতিটি চরিত্র তাদের শ্রেণীবৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কন্যা মায়া যে নিজে ইচ্ছে করলে তার আবাল্য সঙ্গী লাল মিঞাকে বিয়ে করতে পারে, কারণ সে সাবালিকা—জনার্দনের এই শ্রমিক-জনোচিত ঘোষণা বাংলা সাহিত্যে নতুন। পরিশেষে ইব্রাহিম-পুত্র লাল মিঞার সঙ্গে জনার্দনের কন্যা মায়ার মিলনের একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতও নাটকে রয়েছে। ইতিপূর্বে জনার্দন নিজেই বলেছিল, শ্রমিকের কোন জাত নেই। এই স্পষ্ট ঘোষণা ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে নাট্য সাহিত্যের মোড় ফিরিয়ে দেবে।

শ্রমিক সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্র আঁকতে গিয়ে মহুয়া গীতি নাট্যের সংযোজনা নাটকের এক অপূর্ব মাধুর্য এনে দিয়েছে। মহুয়া, বেহুলা, রাজনর্তকীর নাট্যকার মন্মথ রায় এখানে যেন নিমেষের মাঝে মুখর হয়ে উঠেছেন।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে ট্রাম শ্রমিকরা যৌথ অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।…

আজ এঁদের অভিনয় দক্ষতা নবনাট্য আন্দোলনের যে কোন সহযাত্রীর ঈর্ষার বস্তু। তাঁদের প্রচেষ্টা সার্থক হ'ক।

নাট্যকার মন্মথ রায়ের কাছে আবেদন, 'ধর্মঘট' নাটকে তিনি যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করলেন, তা যেন স্তব্ধ হয়ে না যায়। অগ্রজদের ওপর দেশবাসীর অনেক ভরসা।"

স্বাধীনতা

২৫-৫-৫৫

মন্মথ রায় রচিত

নবযুগের নাট্যসাহিত্য

কারাগার—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন থিয়েটারে এবং পরে নাট্য-নিকেতনে অভিনীত হইয়া "জাতির মর্ম স্পর্শ করিয়াছে। "বার্ণাডশ'র 'সেন্ট জোয়ান'-এর সহিত একাসনে স্থান পাইয়াছে।"—বিজলী

পরাধীন ভারতে এই নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ ছিল।

মুক্তির ডাক—একাঙ্ক নাটক। ষ্টার থিয়েটার। 'মেটারলিঙ্কের 'মনাভনা'র সহিত তুলনা হইতে পারে।'—প্রবর্ত্তক

মহুয়া—পঞ্চাঙ্ক নাটক। ষ্টার থিয়েটার। "ও দেশের জগৎ-প্রসিদ্ধ 'কারমেন' এর সহিত তুলনা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হয় না।" —নবশক্তিতে 'চন্দ্রশেখর'। (কারাগার, মুক্তির ডাক, মহুয়া একত্রে একখণ্ডে : সাড়ে তিন টাকা)

দেবাসুর—পঞ্চাঙ্ক নাটক। ষ্টার থিয়েটার। জাতির মুক্তিযজ্ঞে দধীচির আত্মাহুতি। "ফ্লোরা এনাইন ষ্টীল এর কৃতিত্বের সহিত লেখকের কৃতিত্ব একাসনে স্থান পাইয়াছে"—ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। (নব সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

চাঁদ সদাগর—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন ও ষ্টার থিয়েটার। শত শত রাত্রি অভিনীত হইয়াও পুরাতন হয় নাই। "কি ভাষার দিক দিয়া, কি চরিত্রাঙ্কণে প্রকৃত শিল্পীর রসবোধের পরিচয় তিনি দিয়াছেন। বাঙলার প্রাণের বেদনা-করুণা-অশ্রুমাখা অতীত স্মৃতি এই 'চাঁদসদাগর' দর্শককে অভিভূত করিবে সন্দেহ নাই।"—আনন্দবাজার পত্রিকা। (দুই টাকা)

শ্রীবৎস—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন থিয়েটার। "এমনি নাটকের অভিনয়েই রঙ্গমঞ্চের লোকশিক্ষক নাম সার্থক"—নবশক্তিতে 'চন্দ্রশেখর'। (নব সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

সতী—পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাট্যনিকেতন। দক্ষযজ্ঞের পুরাতন কাহিনীর অভিনব রূপ। "হাসি এবং অশ্রুতে সমুজ্জ্বল।"—আনন্দবাজার (পাঁচ সিকা)

বিদ্যুৎপর্ণা—চারিটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ একাঙ্কিকা। C-A-P, ফার্স্ট এম্পায়ার। সাধনা বসু ও অহীন্দ্র চৌধুরীর নাট্য-নৈপুণ্যের কীর্তি-স্তম্ভ। "গ্রন্থকারের অপূর্ব সৃষ্টি। নাটকীয় ঘটনা সংস্থাপনায়, সংলাপ ও কল্পনার মনোহারিত্বে অভিনব।" —যুগান্তর। (বারো আনা)

রাজনটী—এই নাটিকাখানি 'রাজনর্তকী' নামে বাংলা ও হিন্দিতে এবং 'Court Dancer' নামে ভারতে প্রস্তুত প্রথম ইংরাজী সবাক চিত্ররূপে চিত্রজগতে বিখ্যাত হইয়াছে। "এই নাটকের মধ্যে তিনি যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার প্রতিভার যশোগান করিতেছি।"—আনন্দবাজার। (বারো আনা)

রূপকথা—চারিটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ নৃত্যগীতবহুল নাটিকা। "এরূপ একখানি অভিনব ও সুলিখিত নাটকের জন্য আমরা শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়কে অভিনন্দিত করিতেছি।"—আনন্দবাজার পত্রিকা। (বারো আনা)

কৃষাণ—হাসি-অশ্রু-সমুজ্জ্বল চিত্র-নাট্যোপন্যাস। "ঘটনায় মর্মস্পর্শী, আবেদনে করুণ, চরিত্রচিত্রণে উজ্জ্বল।"—আনন্দবাজার। (দুই টাকা)

সাবিত্রী—পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাট্যনিকেতন। "সাবিত্রীর পুরাতন পরিচিত কাহিনীর মর্মগত সত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নাট্যকার উহাকে এমন এক চিত্তহারী মধুর রূপ দিয়াছেন যাহার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য প্রত্যেক দৃশ্যে কৌতূহল ও কারুণ্যের মধ্য দিয়া আড়ম্বরে স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া এক আনন্দাশ্রু পরিপ্লুত তৃপ্তিময় পরিণতি লাভ করিয়াছে। ইহা পুরাতনকে নূতন করিয়াছে, আধুনিককে সনাতন সত্যের অচলপ্রতিষ্ঠ বেদী দেখাইয়াছে।"—আনন্দবাজার। (দুই টাকা)

অশোক—পঞ্চাঙ্ক নাটক। রঙমহল। "নাট্যকারের মুন্সিয়ানা দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। অশোকের জীবনে যে দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তির সঙ্ঘর্ষ চলেছে এবং পশুশক্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে পরিশেষে যে ভাবে অশোকের মগ্নচৈতন্যের আত্মবিকাশ ঘটেছে, তা সম্পূর্ণ ভাবে উচ্চাঙ্গের 'ড্রামা'র বিষয়বস্তু। নাট্যকার যে ভাবে কুণালের প্রতি তিষ্যরক্ষিতার প্রেমের পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন তা একমাত্র প্রথম শ্রেণীর 'আর্টিষ্ট'-এর তুলির কাজের সঙ্গে তুলনীয়। নাট্যকারের ভাষানৈপুণ্যে এবং প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে নাটকের গল্পটি দর্শকসাধারণেরও চিত্তাকর্ষক হবে।"—দীপালীতে 'চন্দ্রশেখর'। (দুই টাকা)

খনা—পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাট্যনিকেতন। "নাট্য-কৃতিত্বের চরম উৎকর্ষ।" —আনন্দবাজার। "বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে এই নাটক যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।" —দেশ। (দুই টাকা)

কাজলরেখা—প্রসিদ্ধ রূপকথার একাঙ্ক নাটক—ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনয়োপযোগী। (বারো আনা) (প্রাপ্তিস্থান: আশুতোষ লাইব্রেরী, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা)

জীবনটাই নাটক—মিনার্ভা থিয়েটার। (আড়াই টাকা)

"বাঙলা রঙ্গমঞ্চে প্রায় শতাব্দীব্যাপী অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে—এটা হলো নবীনতম। আমার তো মনে হয়, এই নাটক থেকে মঞ্চের নতুন চেহারা ফুটাইবার সম্ভাবনা হল।" শ্রীমনোজ বসু

"আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি আধুনিক কালে এ নাটকের তুলনা নেই, এ অভিনয়ের উদাহরণ নেই।" শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল

মমতাময়ী হাসপাতাল—"বাংলায় কৌতুক-নাট্যসাহিত্যের অভাব পূরণ করবে সন্দেহ নাই।" প্রবাসী।

রঘু ডাকাত—"দুর্দ্ধর্ষ রঘুডাকাত কি করে কৃষ্ণভক্তে রূপান্তরিত হ'ল—সেই চিত্তাকর্ষক কাহিনী। এ ধরণের নাটক রচনায় মন্মথ বাবুর জুড়ি নেই।" প্রবাসী।

একাঙ্কিকা

মনোরম প্রচ্ছদে একুশটি নাট্যগুচ্ছে বর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য পাঁচ টাকা।

"বাঙ্গলাসাহিত্যে এর তুলনা খুব কম আছে"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

"যথার্থ সাহিত্যিক অনুপ্রেরণা থেকেই এ গুলির রচনা, তাই এত হৃদয়স্পর্শী, এত অভিনব। বাংলা সাহিত্যের একটা দিকের অভাব গ্রন্থকার যে ভাবে পূর্ণ করে রেখেছেন, তার জন্য তাঁকে অকুণ্ঠচিত্তে অভিনন্দন জানাই।" দেশ

ছোটদের একাঙ্কিকা

স্কুলে, প্রাইজে, উৎসবে, পূজামণ্ডপে ছোটদের অভিনয়ের জন্য বাংলা একাঙ্কিকা নাটক প্রবর্তক মন্মথ রায়ের শ্রেষ্ঠ বারোটি নাটক—সচিত্র—সুদৃশ্য—২৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত।